মাসুদ রানা

অ্যামবুশ

কাজী আনোয়ার হোসেন



দুইখণ্ড একত্রে

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

অ্যামবুশ

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

বিশাল এক ব্রিটিশ প্লেন ক্র্যাশ করল
গ্রীনল্যাণ্ডের পুব উপকূলের কাছে বরফে ঢাকা
এক জনবসতিহীন বিরান অঞ্চলে।
সবচেয়ে কাছের জনপদ তিনশো মাইল দূরে।
প্লেনের ভেতর দশ-বারোজন নারী-পুরুষ এখনও বেঁচে,
কিন্তু শীঘ্রি সাহায্য না পেলে মারা পড়বে সবাই।
এই বিপদের সময়ে
ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা।
তখন জানত না,
প্লেন ক্র্যাশে মারা যায়নি পাইলট—
মরেছে কলজে বরাবর পিস্তলের গুলি খেয়ে।
ঘাড় ভেঙে মারা যায়নি পেছনের সীটে বসা লোকটা—
বুকে গুলি করে তারপর ভাঙা হয়েছে ঘাড়।
কারা করল এ কাজ? কেন?
কী চায় তারা?

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

অ্যামবুশ

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন



সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7113-1

আটষট্টি টাকা

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৩

রচনা: বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশি ছবি অবলম্বনে
আলিম আজিজ

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail. alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
AMBUSH
[PART I &II]
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

অ্যামবুশ-১ ৫—৯৯
অ্যামবুশ-২ ১০০—১৮৪

মাসুদ রানার ভলিউম

১-২-৩	ধ্বংস পাহাড়+ভারতনাট্যম+স্বর্ণমৃগ	৬৪/-
৪-৫-৬	দুঃসাহসিক+মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা+দুর্গম দুর্গ	৬৭/-
৭-৩৭২	শত্রু ভয়ঙ্কর+অরক্ষিত জলসীমা	৫৯/-
৮-৯	সাগর সঙ্গম-১,২ (একত্রে)	৩১/-
১০-১১	রানা! সাবধান!!+বিস্মরণ	৫৯/-
১২-৫৫	রত্নদ্বীপ+কুউউ	৪৯/-
১৩-১৪	নীল আতঙ্ক-১,২ (একত্রে)	৫৩/-
১৫-১৬	কায়রো+মৃত্যু প্রহর	৫৮/-
১৭-১৮	গুপ্তচক্র+মূল্য এক কোটি টাকা মাত্র	৩৭/-
১৯-২০	রাত্রি অন্ধকার+জাল	৪৬/-
২১-২২	অটল সিংহাসন+মৃত্যুর ঠিকানা	৩৪/-
২৩-২৪	ক্ষ্যাপা নর্তক+শয়তানের দূত	৬৬/-
২৫-২৬	এখনও ষড়যন্ত্র+প্রমাণ কই	৫১/-
২৭-২৮	বিপদজনক-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
২৯-৩০	রক্তের রঙ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৩১-৩২	অদৃশ্য শত্রু+পিশাচ দ্বীপ (একত্রে)	৫৯/-
৩৩-৩৪	বিদেশী গুপ্তচর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
৩৫-৩৬	ব্ল্যাক স্পাইডার-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৩৭-৩৮	গুপ্তহত্যা+তিনশত্রু	৬৫/-
৩৯-৪০	অকস্মাৎ সীমান্ত-১,২ (একত্রে)	৫১/-
৪১-৪৬	সতর্ক শয়তান+পাগল বৈজ্ঞানিক	৪৬/-
৪২-৪৩	নীল ছবি-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৪৪-৪৫	প্রবেশ নিষেধ-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৪৭-৪৮	এসপিওনাজ-১,২ (একত্রে)	৪৯/-
৪৯-৫০	লাল পাহাড়+হৃৎকম্পন	৫২/-
৫১-৫২	প্রতিহিংসা-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৫৩-৫৪	হংকং সম্রাট-১,২ (একত্রে)	৪৮/-
৫৬-৫৭-৫৮	বিদায়, রানা-১,২,৩ (একত্রে)	৮২/-
৫৯-৬০	প্রতিদ্বন্দ্বী-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
৬১-৬২	আক্রমণ ১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৬৩-৬৪	গ্রাস-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
৬৫-৬৬	স্বর্ণতরী-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৬৭-১৬১	পপি+বুমেরাং	৬০/-
৬৮-৬৯	জিপসী-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
৭০-৭১	আমিই রানা-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭২-৭৩	সেই উ সেন-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৭৪-৭৫	হ্যালো, সোহানা ১,২ (একত্রে)	৭৮/-
৭৬-৭৭	হাইজ্যাক-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৭৮-৭৯-৮০	আই লাভ ইউ, ম্যান (তিনখণ্ড একত্রে)	১০৮/-
৮১-৮২	সাগর কন্যা-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
৮৩-৮৪	পালাবে কোথায়-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
৮৫-৮৬	টার্গেট নাইন-১,২ (একত্রে)	৪৬/-
৮৭-৮৮	বিষ নিঃশ্বাস-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৮৯-৯০	প্রেতাত্মা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
৯১-৯২	বন্দী গগল+জিম্মি	৪২/-
৯৩-৯৪	তুষার যাত্রা-১,২ (একত্রে)	৪১/-
৯৫-৯৬	স্বর্ণ সংকট-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
৯৭-৯৮	সন্ন্যাসিনী+পাশের কামরা	৭৬/-
৯৯-১০০	নিরাপদ কারাগার-১,২ (একত্রে)	৩২/-
১০১-১০২	স্বর্গরাজ্য-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১০৩-১০৪	উদ্ধার-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১০৫-১০৬	হামলা-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
১০৭-১০৮	প্রতিশোধ-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১০৯-১১০	মেজর রাহাত-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১১১-১১২	লেনিনগ্রাদ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
১১৩-১১৪	অ্যামবুশ-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১১৫-১১৬	আরেক বারমুডা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১১৭-১১৮	বেনামী বন্দর-১,২ (একত্রে)	৫১/-
১১৯-১২০	নকল রানা-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১২১-১২২	রিপোর্টার-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১২৩-১২৪	মরুযাত্রা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
১২৫-১৩১	বন্ধু+চ্যালেঞ্জ	৮২/-
১২৬-১২৭-১২৮	সংকেত-১,২,৩ (একত্রে)	৮৮/-
১২৯-১৩০	স্পর্ধা-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩২-১৫৩	শত্রুপক্ষ+ছদ্মবেশী	৯০/-
১৩৩-১৩৪	চারিদিকে শত্রু-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৩৫-১৩৬	অগ্নিপুরুষ-১,২ (একত্রে)	৮০/-
১৩৭-১৩৮	অন্ধকারে চিতা-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
১৩৯-১৪০	মরণকামড়-১,২ (একত্রে)	৬৩/-
১৪১-১৪২	মরণখেলা-১,২ (একত্রে)	৪০/-
১৪৩-১৪৪	অপহরণ-১,২ (একত্রে)	৭৩/-
১৪৫-১৪৬	আবার সেই দুঃস্বপ্ন-১,২ (একত্রে)	৩৩/-
১৪৭-১৪৮	বিপর্যয়-১,২ (একত্রে)	৮৪/-
১৪৯-১৫০	শান্তিদূত-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৫১-১৫২	শ্বেত সন্ত্রাস-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
১৫৪-১৫৫	কালপ্রিট-১,২ (একত্রে)	৭৮/-
১৫৬-১৫৭	মৃত্যু আলিঙ্গন-১,২ (একত্রে)	৫২/-
১৫৮-১৬২	সময়সীমা মধ্যরাত+মাফিয়া	৫৯/-
১৫৯-১৬০	আবার উ সেন-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
১৬২-১৬৫	কে কেন কিভাবে+কুচক্র	৭৯/-
১৬৩-১৬৪	মুক্ত বিহঙ্গ-১,২ (একত্রে)	৯০/-
১৬৬-১৬৭	চাই সাম্রাজ্য-১,২ (একত্রে)	৮৫/-
১৬৮-১৬৯	অনুপ্রবেশ-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭০-১৭১	যাত্রা অশুভ-১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭২-১৭৩	জুয়াড়ী ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
১৭৪-১৭৫	কালো টাকা ১,২ (একত্রে)	৪৩/-
১৭৬-১৭৭	কোকেন সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৭৮-১৭৯	বিষকন্যা ১,২ (একত্রে)	৭০/-
১৮০-১৮১	সত্যবাবা-১,২ (একত্রে)	৬১/-
১৮২-১৮৩	যাত্রীরা হুঁশিয়ার+অপারেশন চিতা	৪৩/-

১৮৪-১৮৫ আক্রমণ '৮৯-১,২ (একত্রে)	৭২/-
১৮৬-১৮৭ অশান্ত সাগর-১,২ (একত্রে)	৪২/-
১৮৮-১৮৯-১৯০ শ্বাপদ সংকুল-১,২,৩ (একত্রে)	৬৫/-
১৯১-১৯২ দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৭/-
১৯৩-১৯৪ প্রলয়সঙ্কেত-১,২ (একত্রে)	৬৫/-
৯৫-১৯৬ ব্ল্যাক ম্যাজিক-১,২ (একত্রে)	৪৫/-
১৯৭-১৯৮ তিক্ত অবকাশ-১,২ (একত্রে)	৩৭/-
১৯৯-২০০ ডাবল এজেন্ট-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২০১-২০২ আমি সোহানা-১,২ (একত্রে)	৮০/-
২০৩-২০৪ অগ্নিশপথ-১,২ (একত্রে)	৫৯/-
২০৫-২০৬-২০৭ জাপানী ফ্যানাটিক-১,২,৩ (একত্রে)	৭৫/-
২০৮-২০৯ সাক্ষাৎ শয়তান-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২১০-২১১ গুপ্তঘাতক-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২১২-২১৩-২১৪ নরপিশাচ-১,২,৩ (একত্রে)	৬৭/-
২১৫-২১৬ শত্রু বিভীষণ-১,২ (একত্রে)	৭৬/-
২১৭-২১৮ অন্ধশিকারী-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২১৯-২২০ দুই নম্বর-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২২১-২২২ কৃষ্ণপক্ষ-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২২৩-২২৪ কালোছায়া-১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২২৫-২২৬ নকল বিজ্ঞানী-১,২ (একত্রে)	৩৪/-
২২৭-২২৮ বড় ক্ষুধা-১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২২৯-২৩০ স্বর্ণদ্বীপ-১,২ (একত্রে)	৭০/-
২৩১-২৩২-২৩৩ রক্তপিপাসা-১,২,৩ (একত্রে)	৬০/-
২৩৪-২৩৫ অপচ্ছায়া-১,২ (একত্রে)	৫৮/-
২৩৬-২৩৭ ব্যর্থ মিশন-১,২ (একত্রে)	৫১/-
২৩৮-২৩৯ নীল দংশন-১,২ (একত্রে)	৬৬/-
২৪০-২৪১ সাউদিয়া ১০৩-১,২ (একত্রে)	৩৬/-
২৪২-২৪৩-২৪৪ কালপুরুষ-১,২,৩ (একত্রে)	৫৫/-
২৪৫-২৪৬ নীল বজ্র ১,২ (একত্রে)	৩২/-
২৪৯-২৫০-২৫১ কালকূট-১,২,৩ (একত্রে)	৫০/-
২৫৪-২৫৫ সবাই চলে গেছে ১,২ (একত্রে)	৩৮/-
২৫৬-২৫৭ অনন্ত যাত্রা ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
২৬৩-২৬৪ হীরক সম্রাট ১,২ (একত্রে)	৪২/-
২৫৮-২৬৫ রক্তচোষা+সাত রাজার ধন	৭৩/-
২৫৯-২৬০-২৬১ কালো ফাইল ১,২,৩ (একত্রে)	৬৩/-
২৬৬-২৬৭-২৬৮ শেষ চাল ১,২,৩ (একত্রে)	৯৮/-
২৬৯-২৮৫ বিগব্যাঙ+মাদকচক্র	৪৩/-
২৭০-২৭১ অপারেশন বসনিয়া+টার্গেট বাংলাদেশ	৩৮/-
২৭২-২৭৩ মহাপ্রলয়+যুদ্ধবাজ	৮০/-
২৭৪-২৭৫ প্রিন্সেস হিয়া ১,২ (একত্রে)	৫২/-
২৭৬-২৯১ মৃত্যু ফাঁদ+সীমালঙ্ঘন	৪৫/-
২৭৭-২৮১ শয়তানের ঘাঁটি+আক্রান্ত দূতাবাস	৮২/-
২৭৯-২৮২ মায়ান ট্রেজার+জন্মভূমি	৫১/-
২৮০-২৮৯ ঝড়ের পূর্বাভাস+কালসাপ	৬৫/-
২৮৩-২৮৮ দুর্গম গিরি+তুরুপের তাস	৭৪/-
২৮৪-৩১২ মরণযাত্রা+সিক্রেট এজেন্ট	৪২/-
২৮৬-২৮৭ শকুনের ছায়া ১,২ (একত্রে)	৪১/-
২৯০-২৯৩ গুডবাই, রানা+কান্তার মরু	৭২/-
২৯২-২৯৮ রুদ্রঝড়+অগ্নিবাণ	৬৪/-
২৯৪-৩০৪ কর্কটের বিষ+সার্বিয়া চক্রান্ত	৭২/-
২৯৫-২৯৭ বোস্টন জ্বলছে+নরকের ঠিকানা	৩৩/-
২৯৬-৩০৬ শয়তানের দোসর+কিলার কোবরা	৭৪/-
২৯৯-২৭৮ কুহেলি রাত+ধ্বংসের নকশা	৪৩/-
৩০০-৩০২ বিষাক্ত থাবা+মৃত্যুর হাতছানি	৪০/-
৩০১-৩৪৪ জনশত্রু+ক্রাইম বস	৪১/-
৩০৩-৩১৩ সেই পাগল বৈজ্ঞানিক+ভাইরাস X-99	৬৪/-
৩০৫-৩০৭ দুরভিসন্ধি+মৃত্যুপথের যাত্রী	৪৭/-
৩০৮-৩৪২ পালাও, রানা+অন্তপ্রেম	৬৯/-
৩০৯-৩১০ দেশপ্রেম+রক্তলালসা	
৩১১-৩১৪ বাঘের খাঁচা+মুক্তিপণ	৪৭/-
৩১৫-৩১৬ চীনে সঙ্কট+গোপন শত্রু	৪৯/-
৩১৭-৩১৯ মোসাদ চক্রান্ত+বিপদসীমা	৪০/-
৩১৮-৩৪৭ চন্দ্রদ্বীপ+ইশকাপনের টেক্কা	৫০/-
৩২০-৩২১ মৃত্যুবীজ+জাতগোক্ষুর	৫৫/-
৩২২-৩৩৬ আবার ষড়যন্ত্র+অপারেশন কাঞ্চনজঙ্ঘা	৫৪/-
৩২৩-৩৫২ অন্ধ আক্রোশ+মরুকন্যা	৬২/-
৩২৪-৩২৮ অশুভ প্রহর+অপারেশন ইজরাইল	৭৬/-
৩২৫-৩৫১ কনকতরী+দুর্গে অন্তরীণ	৪৪/-
৩২৬-৩২৭ স্বর্ণখনি ১,২ (একত্রে)	৭৬/-
৩২৯-৩৩০ শয়তানের উপাসক+হারানো মিগ	৪৬/-
৩৩১-৩৪১ ব্লাইন্ড মিশন+আরেক গডফাদার	৬১/-
৩৩২-৩৩৩ টপ সিক্রেট ১,২ (একত্রে)	৩৯/-
৩৩৪-৩৩৫ মহাবিপদ সঙ্কেত+সবুজ সঙ্কেত	৫০/-
৩৩৭-৩৩৮ গহীন অরণ্য+প্রজেক্ট X-15	৫৯/-
৩৩৯-৩৫৩ অন্ধকারের বন্ধু+রেড ড্রাগন	৫৪/-
৩৪০-৩৪৩ আবার সোহানা+মিশন তেল আবিব	৪৮/-
৩৪৫-৩৪৬ সুমেরুর ডাক-১,২ (একত্রে)	৫৫/-
৩৪৮-৩৪৯ কালো নকশা+কালনাগিনী	৬৬/-
৩৫০-৩৫৬ বেঈমান+মাফিয়া ডন	৪৮/-
৩৫৪-৩৫৯ বিষচক্র+মৃত্যুবাণ	৭৩/-
৩৫৫-৩৩১ শয়তানের দ্বীপ+বেদুঈন কন্যা	৭১/-
৩৫৭-৩৫৮ হারানো আটলান্টিস-১,২ (একত্রে)	৬২/-
৩৬০-৩৬৭ কমান্ডো মিশন+সহযোদ্ধা	৬৬/-
৩৬১-৩৬২ শেষ হাসি-১,২ (একত্রে)	৭৪/-
৩৬৩-৩৬৪ স্মাগলার+বন্দি রানা	৫৯/-
৩৬৫-৩৬৬ নাটের গুরু+আসছে সাইক্লোন	৫৪/-
৩৬৮-৩৬৯ গুপ্ত সংকেত-১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৭০-৩৭৬ ক্রিমিনাল+অমানুষ	৭৯/-
৩৭৩-৩৭৪ দুরন্ত ঈগল-১,২ (একত্রে)	৫৪/-
৩৭৫-৩৭৭ সর্পলতা+অখণ্ড অবসর	১০০/-
৩৭৮-৩৭৯ স্নাইপার ১,২ (একত্রে)	৬৮/-
৩৮০-৩৮১ ক্যাসিনো আন্দামান+জলরাক্ষস	৮৯/-
৩৮৪-৩৮৮ স্বপ্নের ভালবাসা+নিখোঁজ	৮১/-
৩৮৫-৩৮৬ হ্যাকার ১,২ (একত্রে)	৮৬/-
৩৮৭-৩৮৯ খুনে মাফিয়া+বুশ পাইলট	৬৭/-
৩৯০-৩৯১ অচেনা বন্দর ১,২ (একত্রে)	৮৪/-
৩৯২-৩৯৯ ব্ল্যাকমেইলার+বিপদে সোহানা	৬৪/-
৩৯৩-৩৯৪ অন্তর্ধান ১,২ (একত্রে)	৭০/-
৩৯৫-৩৯৬ ড্রাগ লর্ড+দ্বীপান্তর	৬৮/-
৩৯৭-৩৯৮ গুপ্ত আততায়ী ১,২ (একত্রে	৮৪/-
৪০০-৪০১ চাই ঐশ্বর্য ১,২ (একত্রে)	৯৪/-
৪০২-৪০৩ স্বর্ণ বিপর্যয় ১,২ (একত্রে)	৭১/-
৪০৪-৪০৫ কিল-মাস্টার+মৃত্যুর টিকেট	৭৪/-
৪০৬-৪০৭ কুরুক্ষেত্র ১,২ (একত্রে)	৮৭/-

অ্যামবুশ-১

প্রথম প্রকাশ: জুন. ১৯৮৩

এক

'নাহ্, আমি দেখলাম না,' অন্ধকারে টেলিস্কোপটা রানার হাতে তুলে দিয়ে বলল লেফটেন্যান্ট ইউরি রুস্তভ। 'তুমি দেখো তো, মেজর।'

টেলিস্কোপ তুলে উত্তর দিগন্ত তন্ন তন্ন করে খুঁজল রানা। সে-ও দেখল না ওটাকে। চোখ থেকে টেলিস্কোপ নামিয়ে মাথা নাড়াল এদিক ওদিক।

'দিন তো দেখি,' হাত বাড়ালেন কমান্ডার লিউ রাইকভ। রানার হাত থেকে টেলিস্কোপটা নিলেন।

অতি-আধুনিক টেলিস্কোপের ইনফ্রা-রেড লেন্সের সামনে থেকে দূর হয়ে গেল ঘন কালো অন্ধকার। লাফ দিয়ে কাছে চলে এল দিগন্ত রেখা।

না, ধূসর দিগন্তের কোথাও নেই ওটা। ছোট-বড় বরফের চাঁই ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ছে না।

'আরও কাছে না এলে দেখা যাবে না,' চোখ থেকে টেলিস্কোপ নামাতে নামাতে বললেন রাইকভ।

আকাশের অবস্থা খারাপ। ইতোমধ্যেই গতি অনেক বেড়ে গেছে বাতাসের—গর্জন ঠিক নয়, কেমন যেন করুণ একটা বিলাপধ্বনি। ঝড়ো বাতাসে ঠাণ্ডার তীব্রতা আরও বেড়ে গেছে। লেনিনগ্রাদের সেইলে উঠে দাঁড়িয়ে আছে ওরা তিনজন। ফারের মোটা পোশাকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে ঠাণ্ডার সুচগুলো, হি হি কাঁপুনি উঠে গেছে কয়েক মিনিটেই।

চুপচাপ ভেসে আছে রাশান অ্যাটমিক সাবমেরিন লেনিনগ্রাদ। পশ্চিম পাশে পাঁচশো গজ দূরে আবছা মত দেখা যাচ্ছে গ্রীনল্যান্ড। কেমন যেন ভৌতিক। মেরু সাগর আর ব্যাফিন উপসাগরের মাঝখানে বিশাল এক দ্বীপ এই গ্রীনল্যান্ড, আয়তন আট লক্ষ চল্লিশ হাজার বর্গমাইল। উত্তর মেরুর মতই চিরবরফের রাজ্য এটাও, কিন্তু মানুষের বসবাস আছে এখানে। আর্কটিক আর গ্রীনল্যান্ডের পরিবেশেও পার্থক্য রয়েছে। দ্বীপের পাশে খোলা সাগর, ছোট-বড় বরফের চাঁই ভাসে পানিতে। খরস্রোতা নদীর যেমন তীর ধসে পড়ে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে ধস নামে গ্রীনল্যান্ডের ধার থেকেও। এই ধস বরফের। পড়েই পানিতে আলোড়ন তুলে ডুবে যায় চাঁইগুলো, কয়েক মুহূর্ত পরেই ভুস করে মাথা তোলে আবার। আবার ডোবে, আবার ভাসে, এদিকে কাত হয়, ওদিকে কাত হয়, ধীরে ধীরে স্থির হয়ে আসে এক সময়। তারপর বরফের যা ধর্ম—নিজের আয়তনের নয় ভাগের আট ভাগ পানির তলায় ডুবিয়ে ভেসে থাকে।

আইস স্টেশন নভেলির আহতদের উদ্ধার করে ভিন্ন রুটে গদানস্ক বন্দরে ফিরে চলেছে লেনিনগ্রাদ। নির্দিষ্ট জায়গায় শীথিং নেই, একটানা বেশিক্ষণ চললেই গরম হয়ে উঠছে ইঞ্জিন। তাই কয়েকশো মাইল পর পরই ইঞ্জিন বন্ধ করে দিতে বাধ্য হচ্ছেন কমান্ডার। সাবমেরিনের ভেতরে প্রয়োজন মত পরিষ্কার বাতাস তৈরি করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা রয়েছে, তাই বাতাসের জন্যে ভেসে ওঠার দরকার হয় না লেনিনগ্রাদের। গ্রীনল্যান্ডের পাশে, এই এখানে ভেসে ওঠার অন্য কারণ আছে। পেছনে অনুসরণ করে আসছে একটা ডেস্ট্রয়ার। লেনিনগ্রাদের রাডারে ধরা পড়েছে ব্যাপারটা। কোন্ দেশী ডেস্ট্রয়ার চেহারা কিংবা ফ্ল্যাগ না দেখে বোঝার উপায় নেই, তাই সেইলে উঠে এসেছেন রাইকভ। সঙ্গে এসেছে লেফটেন্যান্ট রুস্তভ আর রানা। রানার বিশ্বাস, এটা সেই ডেস্ট্রয়ার, যাকে ডোনাল্ড ডাক আর এমনি সব কার্টুন ছবির ফিল্ম দিন কয়েক আগে 'উপহার' দিয়ে এসেছে সে। নিশ্চয়ই খেপে গেছে ডেস্ট্রয়ারের ক্যাপ্টেন জালিয়াতি টের পেয়ে, পণ করেছে, যে করেই হোক ছিনিয়ে নেবে আসল ফিল্মগুলো।

'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন, ডেস্ট্রয়ারটা কতদূরে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাডার বলছে, মাইল বিশেক।'

'তার মানে আরও ঘণ্টাখানেক জিরিয়ে নিতে পারবে লেনিনগ্রাদ?'

'হ্যাঁ, তা পারবে।'

'কিন্তু ততক্ষণে তো অনেক কাছে এসে যাবে ডেস্ট্রয়ার।'

'এক ঘণ্টাই যে ভেসে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। বিপদ দেখলেই টুপ করে তলিয়ে যাব আমরা।'

ঝির ঝির করে তুষার পড়া শুরু হলো এই সময়।

'নাহ্, আর এখানে থাকার কোন মানে হয় না,' বললেন রাইকভ। 'তুষার পড়ছে। একেবারে কাছে না এলে এখন আর দেখা যাবে না ওটাকে। চলুন, নিচে যাই। রাডারেই দেখব, কতটা কাছে এল।'

'হ্যাঁ, চলুন,' যাবার জন্যে পা বাড়াল রানা। ঠিক এই সময় কানে এল শব্দটা।

না, বাতাসের শব্দ নয়, সে বিলাপধ্বনিকে ছাপিয়ে উঠেছে আরেকটা আওয়াজ। ইঞ্জিনের।

'হেলিকপ্টার না তো! ডেস্ট্রয়ার থেকে?' ফিসফিসিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রুস্তভ।

কেউ কোন জবাব দিল না।

এলোমেলো বাতাসে কাঁপা কাঁপা শব্দের রেশ কানে ভেসে আসছে। যেদিক থেকে বাতাস বইছে, আওয়াজটা আসছে সেদিক থেকেই। কান পেতে শব্দ শুনছে রানা, চোখ তুলে তাকাল। তুষারে ঢাকা আবছা অন্ধকারে চোখে কিছুই পড়ল না। ঝড়ো বাতাসের গতি বাড়ছে ক্রমেই। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসের দিকে মুখ করে তাকাল রানা। আইস মাস্ক পরেনি। নাকের খোলা অংশে একসঙ্গে এসে ফুটল যেন অসংখ্য সুচ। কেমন এক ধরনের জ্বালা অনুভব করল সে ওখানটায়।

কান পেতে রানার মতই ইঞ্জিনের শব্দ শুনছেন রাইকভ, চোখ তুলে খুঁজছেন

ওটাকে। রুস্তভের চোখও আকাশের দিকে।

হঠাৎই দেখা গেল ওটাকে। হেলিকপ্টার নয়, একটা প্লেন। সারি সারি জানালায় আলো জ্বলছে। পাক খেয়ে তীব্র গতিতে দক্ষিণে উড়ে গেল ওটা।

'এত নিচুতে কেন?' রানার পাশ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে রুস্তভ। 'কাছে পিঠে এয়ারপোর্ট আছে নাকি?'

'মনে হয় না,' বলল রানা। 'গ্রীনল্যান্ডের এদিকটায় এমন কিছু নেই যে এয়ারপোর্টের দরকার পড়বে।'

'তাহলে...'

রুস্তভের কথা শেষ হলো না, আবার ফিরে আসছে প্লেনটা। মাথার ওপর দিয়ে ছুটে চলে গেল উত্তরে, আধ পাক খেয়ে পশ্চিমে ঘুরল, উড়ে গেল দ্বীপের ওপর। তিরিশ সেকেন্ড পরেই ফিরে এল আবার।

প্লেনটার গতিবিধি মোটেই ভাল মনে হচ্ছে না। সাধারণ এস এ সি বোমারু নয় ওটা, থিউলের ওয়েদার প্লেনও নয়। দেখে শুনে যা মনে হচ্ছে, ট্রান্স-অ্যাটলান্টিক কিংবা ট্রান্সপোলার কোন লাইনার ওটা। কিন্তু এতবড় বিমান এত নিচে কেন? হাজার হাজার ফুট ওপর দিয়ে যাবার কথা ওটার। তাছাড়া এখানে এভাবে ঘুরছেই বা কিসের জন্যে?

'কোনরকম বিপদে পড়েনি তো?' প্লেনটা যেদিকে উড়ে গেল সেদিকে তাকিয়ে আছেন রাইকভ।

'সে-রকমই মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

আবার ফিরে আসছে প্লেনটা। ছুটে গেল মাথার ওপর দিয়ে। আরও নিচে নেমে এসেছে। গতিবেগও কমে গেছে অনেক। রানা অনুমান করল, একশো বিশ-তিরিশের বেশি হবে না এখন। জেট নয়, প্রপেলারওয়ালা বিমান। কিন্তু তাহলেও বিমানটার বিশালতার তুলনায় গতিবেগ নিতান্তই কম।

আরও তিরিশ সেকেন্ড পরে আবার ফিরে এল বিমানটা। নাক নিচু হয়ে গেছে। তীব্র সার্চলাইট জ্বলে উঠেছে। আর দেরি নেই, বুঝতে পারল রানা। নামতে যাচ্ছে এবার ওটা। এবড়োখেবড়ো বরফে ক্র্যাশল্যান্ড করবে? কেন? শঙ্কিত হয়ে উঠল সে।

'পড়বে ওটা এবার...' ইঞ্জিনের গর্জনে অস্পষ্ট শোনাল রুস্তভের কথা।

তীব্র গর্জন করে প্রায় সেইল ছুঁয়ে ছুটে গেল বিমানটা। বরফের ওপর দিয়ে ছুটে হারিয়ে গেল পশ্চিমে। ধীরে ধীরে কমে এল ইঞ্জিনের শব্দ। আধ মিনিট পরেই আবার বাড়তে লাগল। আরও আধ মিনিট পরে শোনা গেল আওয়াজটা। বরফে কঠিন কিছু ঘষা খাওয়ার ভোঁতা কেমন এক ধরনের আওয়াজ। এর পরেই আরেকটা শব্দ হলো, একটু অন্য রকমের। কঠিন কিছু ঠোকা খেয়েছে বরফে। তারপরই সব চুপ।

আরও কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন রাইকভ। কান খাড়া রাখলেন, কিন্তু আর কিছু শোনা গেল না। শুধু বাতাসের গর্জন। রুস্তভের দিকে ফিরে আদেশ দিলেন, 'ইউরি, জলদি যাও। ইঞ্জিন স্টার্ট দিতে বলো। তীরে ভেড়াতে হবে।'

দ্বিরুক্তি না করে ছুটল রুস্তভ।

ইঞ্জিন স্টার্ট হলো। ধীরে ধীরে নাক ঘুরতে লাগল সাবমেরিনের। মাত্র পাঁচশো গজ, যেতে আর কতক্ষণই বা লাগবে।

খবর পেয়ে সেইলে উঠে এল এই সময় গ্যাকো। 'কোথায় পড়ল?' পাশে দাঁড়িয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল সে।

আঙুল তুলে একটা দিক দেখিয়ে দিল রানা। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বাতাসের গতি বাড়ছে কমছে। আরও ভারী হয়ে পড়ছে এখন তুষার। ফলে ঠাণ্ডার তীব্রতা বেড়ে গেছে আরও। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনায় ঠাণ্ডার কথা ওরা ভুলে গেছে এখন।

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বরফের চাঁইয়ের জন্যে জোরাল বাতাসেও ফুলেফেঁপে উঠতে পারছে না সাগর, তবে ঢেউ আছে। ঢেউ বড় হলে বরফের কঠিন দেয়াল ঘেঁষে কিছুতেই সাবমেরিন রাখা যেত না, লেনিনগ্রাদের খোলসের ক্ষতি হত তাহলে। কিন্তু এখন যে ঢেউ আছে, তাতে বিশাল সাবমেরিনের কিছুই হবে না। একেবারে দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করেই জাহাজ ভিড়াল নেভিগেটর। বরফের পাড় এখানটায় নিচু। সেইল কিনার থেকে ফুটখানেক নিচুই হবে দেয়ালের কার্নিস। সেইলের ধার আর কার্নিসের দূরত্ব পাঁচ ছ'ফুট। একটা ভারী তক্তা পেতে দিলে সহজেই হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যাবে ওপারে।

গ্যাকোকে নিচে যাবার নির্দেশ দিলেন কমান্ডার। তক্তা আনতে হবে।

গ্যাকো রওনা দিতেই ডেকে বলল রানা, 'একটা টর্চও এনো, গ্যাকো।'

সহজেই তক্তা পেরিয়ে এসে বরফে পা রাখল রানা। তার পর পরই পেরিয়ে এল গ্যাকো। সে-ও যাবে সঙ্গে।

ফারের ভারী পোশাক পরে পিচ্ছিল তুষার মাড়িয়ে যতটা জোরে সম্ভব ছুটছে রানা। গ্যাকো ছুটছে তার পিছু পিছু। পেছনে জ্বলছে লেনিনগ্রাদের সার্চলাইট। তুষারে বাধা পাচ্ছে তীব্র আলো। তবে ওই আলোয় পথ দেখে চলতে কোন অসুবিধে হচ্ছে না দু'জনের।

বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে না। কতটা ক্ষতি হয়েছে ওটার জানে না রানা। জানে না, ওটাতে কত যাত্রী আছে। ওদের কি অবস্থা তা-ও জানা নেই। তবে অনুমান করেছে, মোটামুটি নিরাপদেই নেমেছে বিমানটা। কোনরকম বিস্ফোরণের শব্দ হয়নি, আগুন দেখা যাচ্ছে না, শুধুমাত্র ঘষা আর ধাক্কা খাবার ভোঁতা শব্দ শুনেছে। যাত্রীদের এখন সব চেয়ে বড় বিপদ যেটা অনুমান করছে রানা, তা হলো ঠাণ্ডা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। এয়ারকন্ডিশনড কেবিনে ৭০ ডিগ্রী ফারেনহাইট উষ্ণ উত্তাপে রয়েছে তারা। সাধারণত এই উত্তাপই রাখা হয় বিমানের ভেতরে। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে কাজ করবে না বিমানের এয়ার কন্ডিশনার। দ্রুত নেমে যাবে কেবিনের উত্তাপ, শূন্যের বিশ-তিরিশ ডিগ্রী নিচে। ঠাণ্ডায় জমে যাবে যাত্রীরা। আর যদি কেবিনের কোথাও ফেটে বা ভেঙে গিয়ে থাকে, তাহলে তো আরও বিপদ। হু হু করে হিম-শীতল বাতাস ঢুকে পড়বে ভেতরে। আরও তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে লোকগুলো। যাত্রীদের এখন সব চেয়ে বেশি দরকার গরম কাপড়-চোপড়ের।

এতবড় একটা বিমান ক্র্যাশল্যান্ড করেছে, কেউই আহত কিংবা নিহত হয়নি, এটা আশা করা যায় না। সুতরাং জরুরী ওষুধেরও দরকার আছে। এসব কথা আগেই ভেবেছে রানা, কমান্ডারকে জানিয়েছে। প্রয়োজনীয় সব কিছু সহ রুস্তভকে পাঠিয়ে দেবেন তিনি, দেরি হবে না।

কোথায় কোন্ দিকে পড়েছে বিমানটা, শব্দ শুনেই অনুমান করে রেখেছে রানা। ওটাকে খুঁজে পেতে খুব একটা অসুবিধে হলো না। তীর থেকে শ'তিনেক গজ দূরে দেখা মিলল ওটার। নিথর হয়ে পড়ার আগের মুহূর্তে প্রায় নব্বই ডিগ্রী ঘুরে গেছে। ল্যান্ড করার সময় গভীর দাগ ফেলেছে বরফে, ওই দাগকে আড়াআড়িভাবে পেটের নিচে রেখে চুপচাপ বসে রয়েছে এখন। তুষার-মেশানো ঝড়ো বাতাসের ঝাপটা খাচ্ছে পড়ে পড়ে।

বিমানটার বাঁ পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রানা, তার পাশে গ্যাকো।

বিমানের গায়ে আলো ফেলল রানা। দক্ষিণ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে আধ পাক ঘুরিয়ে আনল টর্চের রশ্মি। বিমানটার আসল রঙ এখন আর বোঝার উপায় নেই। ইতোমধ্যেই তুষারের হালকা প্রলেপ পড়েছে গায়ে। আয়নার মত আলো প্রতিফলিত করছে সেই তুষার। অক্ষতই রয়েছে বিমানের লেজ। ফিউজিলাজের পেছনের অর্ধেকটাও মোটামুটি ঠিকই আছে। কিন্তু সামনের দিকের অংশটুকু দুমড়ে মুচড়ে গেছে। দু'জনের মাথার ওপরে রয়েছে ওই জায়গাটা। কাত হয়ে পাঁচ ডিগ্রী উঠে গেছে বাঁ-ডানা। ডানার সামান্য পেছনে একটু ওপরের দিকে আলো ফেলল রানা। স্থির হয়ে গেল টর্চ ধরা হাতটা।

তুষারের প্রলেপ রয়েছে, কিন্তু উজ্জ্বল রঙে বড় বড় করে লেখা নিচের অক্ষরগুলো পড়া যাচ্ছে: বি ও এ সি। পৃথিবীর এই প্রান্তে ব্রিটিশ প্লেন!—অবাক না হয়ে পারল না রানা। কোপেনহেগেন কিংবা আমস্টার্ডাম থেকে সন্ড্রে স্ট্রমফিয়র্ড হয়ে উইনিপেগ, লস এঞ্জেলেস আর ভ্যানকুভার যায় এস এ এস কিংবা কে এল এম বিমান। প্যান আমেরিকান এবং ট্রান্স-ওয়র্ল্ড বিমানেরও রেসিপ্রোক্যাল সার্ভিস রয়েছে ওই রুটে। রুটটা গিয়েছে গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূল ধরে দক্ষিণ-পশ্চিমে মেরুবৃত্ত ঘুরে। ওই রুটে চলাচলকারী কোন বিমানের খারাপ আবহাওয়া কিংবা অন্য কোন কারণে পথ হারিয়ে এখানে এসে পড়াটাও ঠিক মানা যায় না, কারণ এখান থেকে স্ট্রমফিয়র্ড বিমানে দেড় ঘণ্টার পথ। আর বি ও এস সি? যেটার কোন রুটই নেই এদিকে, সেই বিমান কি করে চলে এল এখানে?

রানার হাত ধরে টান দিল গ্যাকো। আঙুল তুলে মস্ত একটা ডিম্বাকৃতি দরজা দেখিয়ে বলল, 'রানা, দরজা তো বন্ধ। ভেতরে ঢুকবে কি করে?'

'হুঁ,' চিন্তিতভাবে দরজাটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা, 'দরজা ভাঙার কথা ভাবছ নাকি?'

'তো আর কি করব? ইস্, ভুলই হয়ে গেছে। আগেই ভাবা উচিত ছিল। শাবল-টাবল কিছু একটা নিয়ে আসতে পারতাম।'

'কি লাভ হত তাহলে? হাজার হাজার পাউন্ড চাপ সইবার ক্ষমতা রয়েছে ওই দরজার, ওভাবেই তৈরি হয় ওগুলো, জানো না? ভেতর থেকে লক করা থাকলে

শাবল দিয়ে গুঁতিয়েও ভাঙতে পারবে না।'

'ফাঁক-ফোকরে শাবলের মাথা ঢুকিয়ে চাড় মেরে...'

'কিচ্ছু লাভ হবে না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা, 'এক চুল নড়াতে পারবে কিনা সন্দেহ আছে। ওসব চিন্তা বাদ দাও। দেখি, ঢোকার অন্য ব্যবস্থা করা যায় কিনা।'

টর্চের আলো ফেলে দেখে দেখে বিমানের পেটের তলা দিয়ে ডান ডানার কাছে চলে এল রানা। জমাট বরফে গেঁথে গেছে ডানার ডগা; দুমড়ে বেঁকে গেছে প্রপেলারের ব্লেড।

বিশ ফুট চওড়া বরফের বিশাল এক পাঁচিল খাড়া উঠে গেছে পনেরো ফুট উঁচুতে। বরফে নেমে ছুটে এসে এটাতেই ধাক্কা খেয়ে থেমে গেছে বিমানটা। পুব-পশ্চিমে বিস্তৃত পাঁচিলটা লম্বায় পঁয়তিরিশ ফুট। পশ্চিম থেকে এসে নাকের ডান পাশ দিয়ে পাঁচিলের পুব প্রান্তে গুঁতো মেরেছে বিমান। ঝটকা খেয়ে নাকটা নব্বই ডিগ্রী দক্ষিণে ঘুরে গেছে। ডান পাখার সামনের ধারটা ঠেকেছে দেয়ালে, কাত হয়ে ডগাটা গেঁথেছে গিয়ে বরফে। দুমড়ে মুচড়ে বেঁকে রয়েছে প্রপেলার। চুর চুর হয়ে ভেঙে গেছে একটা উইন্ডব্রেকার। কন্ট্রোল কেবিনের নিচে ধাতব দেয়ালের ছ'-সাত ফুট মত জায়গা ফেটে দুমড়ে ভেতরের দিকে বসে গেছে। পাইলটের কি হয়েছে, অনুমান করতে কষ্ট হলো না রানার।

উইন্ডব্রেকারের কাঁচ-শূন্য ফোকরের দিকে আলো ফেলল রানা। বিমানের ভেতরে ঢোকার পথ পেয়ে গেছে। মনে মনে উচ্চতা মেপে নিল সে। নয় ফুটের কম হবে না।

রানার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে গ্যাকো, তার হাতেও টর্চ। নিজের টর্চটা পকেটে ভরল রানা। গ্যাকোকে জানালায় আলো ফেলতে বলল। তারপর লাফ দিল। ভাঙা আঙুল, প্রায় অকেজোই হয়ে আছে একটা হাত। অন্য হাতের আঙুল বাঁকিয়ে জানালার ফ্রেমের তলার ধারটা ধরে ফেলল, কিন্তু এক হাতে ভর রাখতে পারছে না শরীরের। তার ওপর বাদ সাধছে পিচ্ছিল তুষার কণা আর ভাঙা কাঁচ। জানালার ফ্রেমে কাঁচের ভাঙা টুকরো আটকে রয়েছে। কোনমতে চামড়ার ভারী দস্তানা কাটতে পারলেই আঙুল ফালা ফালা করে দেবে।

কিছুতেই ধরে রাখতে পারছে না রানা, পিছলে যাচ্ছে আঙুল। পড়েই যেত, শেষ মুহূর্তে তলায় এসে দাঁড়াল গ্যাকো। রানার দুই পা নিজের দুই কাঁধে ঠেকাল। গ্যাকোর কাঁধে ভর রেখে নিজের পতন ঠেকাল রানা।

'ধন্যবাদ, গ্যাকো,' নিচের দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

'কাজ সারো আগে। ধন্যবাদটাদ পরে দিলেও চলবে,' বলল গ্যাকো।

গ্যাকোর কাঁধে দাঁড়িয়ে ভাঙা জানালার ফ্রেমের ধারগুলো পরীক্ষা করে দেখল রানা। ধারাল ছুরির চেয়েও মারাত্মক কাঁচের ভাঙা চোখা ফলা আটকে আছে ধারগুলোতে। ওগুলো ভেঙে সরাতে হলে শক্ত কিছুর দরকার।

নিচের দিকে তাকাল রানা। বলল, 'হাতুড়ি টাতুড়ি কিছু একটা হলে ভাল হত। ফ্রেমে ভাঙাচোরা কাঁচ আটকে আছে। জাহাজে গিয়ে আনতে তো অনেক

দেরি হয়ে যাবে। দেখি, টর্চের পেছন দিয়ে টোকা মেরে যদি কিছু…'

'দাঁড়াও, দাঁড়াও,' রানাকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে বলল গ্যাকো। নিজের ট্রাউজারের পকেটে হাত ভরল। যন্ত্রপাতি আর লোহালক্কড় নিয়ে কারবার তার। পকেট থেকে বের করে আনল একটা আট ইঞ্চি লম্বা রেঞ্চ। বাড়িয়ে ধরে বলল, 'দেখো, এটা দিয়ে সারতে পারো কিনা।'

নিচে হাত বাড়িয়ে রেঞ্চটা নিল রানা। হাসল। 'কাজের লোক হে তুমি, টর্পেডো। দরকারের সময় ঠিক জিনিসটাই পাওয়া যায় তোমার কাছে।'

'হয়েছে, জলদি কাজ সারো এখন। কাঁধ ব্যথা হয়ে যাচ্ছে আমার।'

হেসে, রেঞ্চের পেছনটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে জানালার ফ্রেমের তলার দিকে আর দুই পাশে আটকে থাকা ভাঙা কাঁচগুলো পরিষ্কার করে ফেলল রানা। তারপর রেঞ্চটা আবার গ্যাকোকে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এখানেই থাকো। রুস্তভ এলে ওকে নিয়ে ভেতরে ঢুকো।'

গ্যাকোর কাঁধে ভর রেখে কাঁধ পর্যন্ত জানালার ফোকরে ঢুকিয়ে দিল রানা। ফারের পুরু পোশাক গায়ে এক হাতের ভাঙা আঙুল নিয়ে জানালা গলে ভেতরে ঢুকতে বেশ অনেক কসরৎ করতে হলো তাকে।

কন্ট্রোল কেবিনটা অন্ধকার। একটা মানুষের ওপর নামল রানা। পরক্ষণেই সরে গেল। মানুষটা নড়াচড়া করল না, কোনরকম প্রতিবাদ জানাল না। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল রানা। কাঁধের ব্যাজ দেখেই বুঝতে পারল, লোকটা কো-পাইলট ছিল। নিজের সীট আর ড্যাশবোর্ডের মাঝে চাপা পড়ে চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে গেছে। কন্ট্রোল কলামটা ঢুকে গেছে বুকের ভেতরে। বীভৎস দৃশ্য।

এই সময় নিচে কথাবার্তা শুনে জানালা দিয়ে মুখ বের করল রানা। এসে গেছে রুস্তভ। সঙ্গে আরেকজন লোক, একজন নাবিক। কাঁধে কম্বলের বোঝা।

ডেকে বলল রানা, 'গ্যাকো, আগে কিছু কম্বল ছুঁড়ে দাও। মরফিয়া আর সিরিঞ্জ নিয়ে পরে উঠবে।'

নিচ থেকে একটা একটা করে কম্বল ছুঁড়ে দিল গ্যাকো, লুফে নিল রানা। কেবিনে জমা করল। তারপর গ্যাকোকে লাফ দিতে বলে জানালার কাছ থেকে সরে এল।

জানালায় আর ভাঙা কাঁচ নেই এখন। কাজেই উঠতে খুব একটা অসুবিধে হলো না গ্যাকোর। তাছাড়া ভেতর থেকে সাহায্য করল রানা। সহজেই কন্ট্রোল কেবিনে এসে ঢুকল গ্যাকো।

গ্যাকোকে টর্চ ধরতে বলল রানা। থেঁতলানো দেহটার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল গ্যাকো। কি যেন ভাবল রানা। একটা কম্বল তুলে নিয়ে ভাঁজ খুলে ঢেকে দিল সহকারী পাইলটের লাশটা।

কেবিনের বাঁ-দিকে আলো ফেলল গ্যাকো। অক্ষতই আছে ওপাশটা। নিজের আসনে বসে আছে পাইলট। হেলে পড়েছে, মাথার বাঁ-পাশটা ঠেকে আছে পাশের জানালার কাঁচে। এগিয়ে গেল রানা। ডান হাতের দস্তানা খুলে লোকটার কপাল ছুঁয়ে দেখল। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় দস্তানার ভেতরেও রীতিমত হিম শীতল হয়ে আছে রানার

হাত। কিন্তু পাইলটের কপাল আরও বেশি ঠাণ্ডা, একেবারে বরফের মত, ঠাণ্ডা হাতেও অনুভব করল রানা। দৃশ্যটা বীভৎস নয়, কাজেই আরেকটা মূল্যবান কম্বল নষ্ট করল না সে।

কন্ট্রোল কম্পার্টমেন্টের কয়েক ফুট পেছনে নিজের কেবিনেই রেডিওম্যানকে পেল রানা। সামনের বাল্কহেডের ওপর আধ-বসা আধ-শোয়া হয়ে আছে লোকটা। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়েছে হয়তো ওখানে। রেডিও সেটের ফ্রন্ট প্যানেল থেকে খসে আসা হাতলটা ডান হাতে শক্ত করে ধরে আছে এখনও। সেইটার অবস্থা দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, শেষ হয়ে গেছে ট্রান্সমিটার।

রেডিওম্যানের মাথার পেছনে বাল্কহেডে রক্ত দেখল রানা। দ্বিতীয়বার দস্তানা খুলে লোকটার নাকের কাছে হাত রাখল। মাথার পেছনটাও টিপেটুপে দেখল। আশা নেই। লন্ডন কিংবা জার্মানীর আধুনিকতম হাসপাতালে ব্রেন অপারেশন করা গেলে হয়তো বাঁচানো সম্ভব হতে পারে, কিন্তু দুটো জায়গাই এখান থেকে অনেক দূর। সাবমেরিনে করে গদানস্কে পৌঁছে সেখান থেকে প্লেনে···আপন মনেই এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। হবে না। তবু গ্যাকোর কাছ থেকে মরফিয়ার ভায়াল আর সিরিঞ্জ নিল সে। শরীরে ওষুধ পুশ করে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল রেডিওম্যানকে।

রেডিওরুমের পেছনের ঘরটা বিমানের ক্রু এবং অফিসারদের রেস্ট রুম। এখানে, মেঝেতে হাত-পা-ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন। কি ঘটতে যাচ্ছে, সামান্যতম ধারণা ছিল না লোকটার মরার আগের মুহূর্তেও। তার মুখের ভাব আর পড়ে থাকার ভঙ্গি দেখে সেটা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। চেয়ারে বসে বসে রেস্ট নিচ্ছিল বোধ হয় লোকটা, আচমকা ছিটকে পড়েছে মেঝেতে, ভাবল রানা।

প্যান্ট্রিতে পাওয়া গেল স্টুয়ার্ডেসকে। মেঝেতে বাঁ পাশে কাত হয়ে পড়ে আছে। ঘন কালো রাশি রাশি চুলে ঢেকে আছে মুখ। বসে পড়ে মেয়েটার এক হাত তুলে নাড়ি দেখল রানা।

'কেমন?' জানতে চাইল গ্যাকো।

'জ্ঞান ফিরবে শিগ্‌গিরই,' মেয়েটার হাত নামিয়ে রেখে বলল রানা। 'আপাতত এখানেই থাক। একটা কম্বল দাও।'

মেইন প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্টে ঢোকার দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। চেপে বন্ধ হয়ে আছে পাল্লা। এমন তো হবার কথা নয়, ভাবল রানা। প্রচণ্ড ঝাঁকুনিতে ফ্রেমের সঙ্গে পাল্লা সেঁটে বসে গেল? প্রথমে হাতের চাপে পরীক্ষা করল রানা, খুলল না। কাঁধ দিয়ে জোরে ধাক্কা মারতেই ইঞ্চি চারেক ফাঁক হয়ে গেল পাল্লা। ব্যথায় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল ওপাশে কেউ।

'দরজার কাছ থেকে সরে যান,' ডেকে বলল রানা। 'ভেতরে আসব আমরা।'

বিড় বিড় করে কিছু বলল ওপাশের লোকটা। খস খস আওয়াজ হলো। নিজেকে টেনে পায়ের ওপর খাড়া করছে যেন। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকল রানা আর গ্যাকো।

বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডার তুলনায় ভেতরের উষ্ণ আবহাওয়া আগুনের মত গরম

মনে হলো রানার কাছে। চোখে মুখে ঝাপটা মারল যেন বৈশাখের রোদ। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকতে শুরু করেছে, পেছনে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিল রানা। তাপ নিরোধক করেই তৈরি হয়েছে বিমানের ধাতব দেহ, কিন্তু মোটর বন্ধ। বাইরের ঠাণ্ডার সঙ্গে যুঝে বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না কেবিনের উষ্ণতা। তবে যতক্ষণ থাকতে পারে, থাকুক।

টলে পড়েই যাচ্ছিল, একটা সীটের হাতল ধরে নিজেকে সামলাল লোকটা। একটু আগে ও-ই দরজার কাছ থেকে উঠে গেছে। বাদামী আঙুলে রক্তাক্ত কপালের ওপর থেকে এক গোছা ঘন কালো চুল সরাল লোকটা। কপাল থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত এসে পড়েছে লাল টাই আর নীল শার্টের বুকের কাছটায়।

'স্টুয়ার্ডেস আর রেডিওম্যানকে এখানে নিয়ে এসো, গ্যাকো,' লোকটার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বলল রানা। 'ওখানে ঠাণ্ডায় পড়ে থেকে থেকে জমে যাবে ওরা। এ ঘরটা অনেক ভাল।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিয়ে কম্বলের বোঝা নামিয়ে রেখে চলে গেল গ্যাকো।

লোকটার দিকে তাকাল আবার রানা। তার দিকেই তাকিয়ে আছে সে।

'কে আপনি?' জানতে চাইল লোকটা। 'প্লেনের কি হয়েছে?'

'আমি কে, বললেও চিনতে পারবেন না। আর, প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।'

'কি…কি করেছে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করেছে। কেন, জানেন না কিছু?'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়াল লোকটা। 'শুধু একটা প্রচণ্ড ধাক্কা…'

'তারপরেই দরজার ওপর ছিটকে পড়েন আপনি,' পাল্লায় রক্ত লেগেছে, ভিড়িয়ে দেবার সময়ই লক্ষ করেছে রানা। 'সে যাকগে। বসে খানিক বিশ্রাম করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

প্যাসেঞ্জার কেবিন। আরও লোক আছে নিশ্চয়। টর্চের আলো ফেলে পুরো ঘরটা দেখল রানা। নিস্তব্ধ ঘরটাকে প্রথমে শূন্যই মনে হলো। কিন্তু না, আছে ওরা। আরও নয়জন।

দু'জন পড়ে আছে দুই সারি সীটের মাঝের প্যাসেজ ওয়েতে। একজনের মাথায় কোঁকড়ানো কালো চুল, বিশাল চওড়া কাঁধ। কনুইয়ের ওপর ভর রেখে টর্চের আলোর দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে।

দ্বিতীয়জনও চোখ তুলে তাকিয়েছে। বয়স্ক, ছোটখাট লোকটি। মাথার পেছনে ঘাড়ের ঠিক ওপরে আধখানা চাঁদের আকারে খুলির চামড়া কামড়ে ধরে ঝুলে আছে কিছু কালো চুল। গায়ে বিচিত্র স্ট্রাইপের ঢলঢলে কোট, নেকটাইটাও বিচিত্র। বাঁ-সারির সীটে বসেছিল নিশ্চয় ওরা। প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে এসে পড়েছে মেঝেতে।

বাঁয়ের একটা সীটে কেবিনের চতুর্থ লোকটাকে দেখতে গেল রানা। চুপচাপ বসে আছে। ছিটকে পড়েনি, কিংবা পড়ে থাকলেও সামলে নিয়ে আবার ফিরে গেছে নিজের জায়গায়। জানালা ঘেঁষে বসে আছে লোকটা, পা দুটো ছড়িয়ে দিয়েছে মেঝেতে। তার সামনের সীটের পেছনে আটকানো টেবিলের ধার খামচে

ধরে রেখেছে দুই হাতে। শিরাগুলো দড়ির মত, সাদা হাতের চামড়া ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। আলো উঁচু করে লোকটার মুখে ফেলল রানা। পাদ্রীদের আলখেল্লা পরা, গলার কাছটা গলাবন্ধ দিয়ে আঁটা। টর্চের আলো পড়ায় চোখ মিট মিট করছে রেভারেন্ড।

'বিপদ কেটে গেছে, রেভারেন্ড,' বলল রানা। 'ভাববেন না।'

পাদ্রী আশ্বস্ত হলো কি হলো না, বোঝা গেল না। রিমলেস চশমার কাঁচের ভেতর দিয়ে চেয়ে আছে নিচের দিকে, আলো সইতে পারছে না যেন। কিন্তু সে যে পুরোপুরি অক্ষত, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার।

ডান পাশে সামনের দিকের চারটে চেয়ারে বসে আছে আরও চারজন। দু'জন পুরুষ দু'জন মহিলা। মহিলাদের একজনের বয়স অনুমান করা কঠিন। অতিরিক্ত প্রসাধন করে কমিয়ে আনতে চেয়েছে বয়স। চুলে ঘন করে কলপ লাগানো। চেহারাই ঘোষণা করছে, টাকা আছে। চেহারাটা কেমন যেন চেনা চেনা লাগল, কিন্তু কোথায় দেখেছে মনে করতে পারল না রানা। মহিলার আধবোজা চোখে বিমূঢ় দৃষ্টি।

পাশের মহিলাটির চেহারা আর বেশভূষায় প্রাচুর্যের লক্ষণ আরও বেশি। বুক চেরা দামী মিংককোটের তলা থেকে উঁকি মারছে সবুজ জার্সি। এই দুটো পোশাকেই প্রচুর টাকা বেরিয়ে গেছে। পঁচিশের কাছাকাছি বয়স। অপূর্ব সুন্দর ধূসর দুটো চোখ। বাদামী কোঁকড়ানো চুলের ঢল নেমেছে দুই কানের ওপর। মুখটা গোমড়া আর একটু বেশি ভরাট না হলে সত্যিই অতুলনীয় সুন্দরী বলা যেত ওকে। তবে গভীর ঘুম থেকে জেগে উঠলে মুখ এমন ভরাট আর গোমড়া মনে হয় অনেক সময়। কেমন এক আবেশের মধ্যে রয়েছে যেন মেয়েটা।

লোক দু'জন এখনও ঘুমোচ্ছে। টকটকে লাল চামড়ার রঙ, বয়স পঞ্চান্নর কাছাকাছি, মোটাসোটা, মাঝারি উচ্চতার লোকটিকে দেখলেই দাম্ভিক কিছু রাজনীতিকের কথা মনে পড়ে যায়। অনেক লোকের ভিড়েও চোখে পড়বেই। পেকে সাদা হয়ে গেছে গোঁফ-চুল। তার পাশের লোকটার চেহারা আর পরিচ্ছদ ঠিক উল্টো। বৃদ্ধ, হালকা-পাতলা শরীর। মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ি দেখলেই ফিলিস্তিনীদের কথা মনে পড়ে যায়, কিংবা নিজের সম্পর্কে অসচেতন কোন বিজ্ঞানী।

দরজার ওপর ছিটকে পড়া লোকটা ছাড়া এদের সবাই অক্ষত রয়েছে। এর জন্যে অবশ্য পুরু গদিমোড়া সীটগুলোকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত তাদের।

কেবিনের পেছনে মুখোমুখি বসানো দুই সারি সীটের মাঝের পরিসরে একপাশে কাত হয়ে পড়ে আছে একটা মেয়ে। বিমানের লেজের দিকে মুখ করে বসানো পাশাপাশি দুটো সোফার একটাতে বসেছিল সে। অন্যটাতে বসেছে একজন পুরুষ, বসে আছে এখনও।

এগিয়ে গেল রানা।

মেয়েটার বয়স আঠারো কি উনিশ। বাদামী চুল। আকর্ষণীয় চেহারা, তবে নিখুঁত নয়। গায়ে একটা রেনকোট, কোমরের বেল্ট কষে লাগানো। মেয়েটার

বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে থাকা দেখেই অনুমান করে নিল রানা, আহত। তাকে ধরে তুলল সে, একটা সীটে বসিয়ে দিল।

'বাঁ কাঁধ,' গুঙিয়ে উঠে বলল মেয়েটা, 'ব্যথা করছে।'

মেয়েটার বর্ষাতির গলার কাছটা একটু ফাঁক করল রানা। ভেতরের জামার কলার সরিয়ে বাঁ দিকটা পরীক্ষা করল। বলল, 'করবেই। ক্ল্যাভিকল, মানে, কলার বোনটা···গেছে। যা হয়েছে হয়েছে, এখন চুপ করে বসে থাকুন। ডান হাতে বাঁ হাতের ভার রাখুন···হ্যাঁ হ্যাঁ, এভাবেই। পরে বেঁধে দেয়া যাবে। ঘাবড়াবেন না, ঠিক হয়ে যাবে সব।'

কালো দুই চোখের তারায় অস্বস্তি মেয়েটার। আশঙ্কা, ভীতি। কিন্তু তবু হাসল, ম্লান হাসি। তাতে কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া স্পষ্ট। পরক্ষণেই কি মনে করে পাশের লোকটার দিকে তাকাল। রানার দৃষ্টিও ফিরল সেদিকে।

এখনও একই ভঙ্গিতে বসে আছে লোকটা। এক চুল নড়েনি। বেকায়দা ভাবে বুকের ওপর হেলে রয়েছে মাথাটা। ঘাড়ের পেছনে সামান্য ফুলে উঠেছে। যা বোঝার বুঝে নিল রানা। ওকে পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আর কেউ নেই কেবিনে। ঘুরে প্যাসেজ ধরে সামনের দিকে আবার এগিয়ে আসতে লাগল রানা।

এই সময় দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকল গ্যাকো। বলল, 'মেজর, মেয়েটার জ্ঞান ফিরেছে। কিন্তু আসতে চাইছে না কিছুতেই। রেডিওম্যানের কাছে গিয়ে বসে আছে।'

'আছে কেমন?'

'আমার অনুমান, তার পিঠ ব্যথা করছে। কিন্তু বলেনি কিছু।'

যাত্রীদের ভালমন্দের দিকে নজর রাখার দায়িত্ব স্টুয়ার্ডেসের। ওয়্যারলেস অপারেটরের দিকে তার এত মনোযোগ কেন?—ব্যাপারটার কোথায় যেন একটু বৈশিষ্ট্য আছে, ঠিক বুঝতে পারল না রানা। আরেকটা অদ্ভুত অসামঞ্জস্য অনুভব করছে সে বিমানের ভেতরের পরিবেশে। একটা বিমান দুর্ঘটনায় পড়ল, অথচ যাত্রীদের ভাবসাব দেখে বোঝা যায় না ঘটনাটা সম্পর্কে কিছু জানে ওরা। কেবিনের দশজন যাত্রীর কেউই সীট বেল্ট বাঁধেনি। কেন? দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, জানা ছিল না তাদের?···এই সময় জোর ঠক ঠক আওয়াজ উঠল বিমানের পেটে। নিচ থেকে বাড়ি মারছে কেউ। কি ব্যাপার? চোখ তুলে গ্যাকোর দিকে তাকাল রানা।

বুঝল গ্যাকো। চলে গেল। ফিরে এল শিগ্‌গিরই। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। 'জলদি চলো, রানা। কমান্ডার ডাকছেন। এখুনি।'

'কি ব্যাপার?'

'ডেস্ট্রয়ার। এসে পড়েছে···চলো, জলদি চলো। কুইক।' ঘুরেই রওনা হয়ে গেল গ্যাকো।

পিছু পিছু এগোল রানা। রেডিওরুমের কাছ দিয়ে যাবার সময় দেখল, সত্যিই ওয়্যারলেস অপারেটরের কাছে বসে আছে স্টুয়ার্ডেস। কিছু জিজ্ঞেস করার সময়

নেই। দ্রুত চলে এল কন্ট্রোল কেবিনে। ততক্ষণে জানালার বাইরে অর্ধেক শরীর বের করে ফেলেছে গ্যাকো।

তুষারের ওপর নিরাপদেই নামল ওরা। পাশে দাঁড়ানো একজন নাবিককে দেখিয়ে বলে উঠল রুস্তভ, 'এই যে, একে পাঠিয়েছেন, কমান্ডার। খুবই কাছে এসে পড়েছে নাকি ডেস্ট্রয়ার।'

'কিন্তু এদিকে প্লেনের লোকগুলো? এদের কি হবে? মারাত্মক আহত···'

'আমি কিছু বলতে পারছি না, রানা। চলো, শুনি, কমান্ডার কি বলেন। পরিস্থিতি খুব খারাপ না হলে লোক পাঠাতেন না তিনি। চলো, চলো।'

সার্চলাইটের আলো বরাবর দ্রুত এগিয়ে চলেছে ওরা। বাতাসের গতি আরও বেড়েছে। বিলাপধ্বনি রূপ নিয়েছে গর্জনে। প্রচণ্ড ঝাপটা মারছে তুষার-মেশানো ঝড়ো বাতাস। আইস মাস্ক পরেনি, নাকমুখের চামড়ার সর্বনাশ হতে চলেছে, বুঝল রানা।

তক্তা পেরিয়ে দ্রুত সাবমেরিনে উঠে এল ওরা। সেইলে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন রাইকভ। ঘন ঘন তাকাচ্ছেন উত্তর দিকে। কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কয়েক হাত দূরের জিনিসও দেখা যায় না। রানা সেইলে উঠে আসতেই বলে উঠলেন, 'নিচে চলুন, মেজর। এখুনি ডুব দিতে হবে আমাদের।'

'কি বলছেন আপনি, ক্যাপ্টেন?' উৎকণ্ঠিত রানা। 'আর ওরা? প্লেনের অসহায়, আহত···ওদেরকে না নিয়েই···'

'আমি দুঃখিত, মেজর,' রাইকভ গম্ভীর।

'দুঃখিত! কি বলতে চাইছেন?' বোকার মত প্রশ্ন করল রানা। কেমন যেন থতমত খেয়ে গেছে।

'এটা একটা যুদ্ধজাহাজ, মেজর, রেসকিউ বোট নয়। বাইরের কাউকে নিতে পারব না আমি লেনিনগ্রাদে। কড়া নির্দেশ রয়েছে, আপনি জানেন। ডেস্ট্রয়ারটা পিছু ধাওয়া না করলে হয়তো ওরা উদ্ধার না পাওয়া পর্যন্ত এখানে থেকে গিয়ে ওদের সব রকম সাহায্য করা যেত···'

'কিন্তু তাই বলে দশ-বারোজন মানুষ···'

'আমি দুঃখিত, মেজর। হাত-পা বাঁধা আমার। আমি ওয়্যারলেসে অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। এই দেখুন উত্তর।' হাত বাড়িয়ে একটা কাগজ ধরিয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন রানার হাতে।

স্তব্ধ হয়ে গেল রানা। পরিষ্কার লেখা রয়েছে ওতে: নাক গলিয়ো না। ফিরে এসো। জলদি।

'বেশ,' আটকে রাখা শ্বাসটুকু শব্দ করে ছাড়ল রানা। 'বেশ, তাহলে যান আপনারা।'

'আপনারা?' এতক্ষণ রানার দিকে পাশ ফিরে কথা বলছিলেন কমান্ডার। ঘুরলেন। মুখোমুখি দাঁড়ালেন। 'আপনি?'

'আমাকে থাকতে হচ্ছে। অসহায় ওই লোকগুলোকে ফেলে আমি যেতে পারছি না।'

'থাকছেন?'

'হ্যাঁ, থাকছি।'

'কিন্তু কেন? কি উপকার করতে পারবেন? এই আবহাওয়ায় বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন ওদের?'

'হয়তো পারব না। তবে চেষ্টা করে দেখব।'

'কি অবস্থা দেখলেন ওখানে?'

'প্লেনের ক্যাপ্টেন কো-পাইলট দু'জনেই মারা গেছে। যাত্রীদের মধ্যে মেয়ে আর বুড়োই বেশি। জখম হয়েছে কয়েকজন। দু'য়েকজন যা সমর্থ আছে, তারা কতদূর কি করতে পারবে জানি না। বরফ সম্পর্কে কতটা আইডিয়া আছে ওদের, তা-ও জানি না। এই ঠাণ্ডায় টিকিয়ে রাখা মুশকিলই হবে।'

'নিজের ব্যাপারে কি ভাবছেন?' জানতে চাইলেন কমান্ডার। 'আপনি নিজে কিভাবে টিকবেন?'

মৃদু হাসল রানা। কোন জবাব দিল না।

'আমি যদি জোর খাটাই?' আবার প্রশ্ন করলেন রাইকভ। 'যদি আপনাকে নামতে না দিই?'

'জোর থাকলে খাটাতে পারতেন, কমান্ডার,' হাসল রানা। 'কিন্তু জোরই তো নেই আপনার। কি আদেশ আছে আপনার ওপর মনে নেই? জাহাজ বা নাবিকদের কি কোন ক্ষতি হচ্ছে আমি এখানে নেমে গেলে? আমাকে নিয়ন্ত্রণের অধিকার আপনাকে দেয়া হয়নি, বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে...'

'আমি জানি,' হাত তুলে থামার ইঙ্গিত করলেন কমান্ডার। 'কিন্তু আপনাকে এভাবে এই বরফের মধ্যে কি করে নামিয়ে দিই বলুন? এভাবে একা...উদ্ধারের কোন নিশ্চয়তা নেই...আপনি জানেন, নিশ্চিত মৃত্যুর পথে যে পা বাড়াতে যাচ্ছেন?'

'আমার জন্যে মায়া লাগছে, ওই লোকগুলোর জন্যে একটুও লাগছে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

অন্ধকারেই পুরো দুই সেকেন্ড রানার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কমান্ডার। রানার চেহারা দেখলেন না পরিষ্কার। কিন্তু বুঝলেন, কিছুতেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না ওকে। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যাবেই সে। তাছাড়া রানাকে আটকে রাখার সত্যিই কোন অধিকার নেই তাঁর। ধীরে ধীরে বললেন, 'ধন্য দেশের ধন্য হীরের টুকরো সন্তান আপনি, মেজর। আপনার তুলনা হয় না। যাকগে, চলুন, নিচে চলুন, যা দরকার আপনার, নিয়ে নিন।'

দরকারী জিনিসগুলো একটা ব্যাগে ভরে এনে রানার হাতে তুলে দিল গ্যাকো। নানান জিনিসে বোঝাই, ভারী ব্যাগ। কিন্তু বয়ে নিয়ে যেতে পারবে রানা।

ক্রাচে ভর দিয়ে কন্ট্রোল রুমে এসে ঢুকল এই সময় পিনিন। 'এই যে, মেজর, শুনলাম এই মোড়েই বাস থেকে নেমে যাচ্ছেন?'

'যেতে হচ্ছে, পিনিন।'

রানার আরও কাছে এগিয়ে এল পিনিন। পকেটে হাত ঢোকাল। জিনিসটা বের

করে বাড়িয়ে ধরল, 'এটা রয়ে যাচ্ছিল আমার কাছে।'

'থ্যাংক ইউ, পিনিন,' হাত বাড়িয়ে ওয়ালথারটা নিয়ে ট্রাউজারের পকেটে ভরল রানা। কি মনে করে রুস্তভের দিকে তাকাল, 'লেফটেন্যান্ট, আরেকটা জিনিস দিতে পারো আমাকে? গ্রীনল্যান্ডের একটা ম্যাপ?'

'পারি, কিন্তু ম্যাপ দিয়ে কি হবে?'

'শুনেছি, গ্রীনল্যান্ডে ওয়েদার স্টেশনের অভাব নেই। হাত গুটিয়ে বসে না থেকে একটু খোঁজাখুঁজি করতে চাই। জমে বরফ হয়ে যাওয়ার আগে, কে জানে, সাহায্য পেয়েও যেতে পারি কারও। স্টেশন থাকলে ট্রাক্টরও থাকবে।'

কাছেই দাঁড়িয়ে আছে নভেলির চীফ টেকনিশিয়ান, গোলাপী গালের বুয়েল। রুস্তভ কিছু বলার আগেই বলে উঠল সে, 'এক মিনিট, মেজর রানা। আসছি।'

এক মিনিট নয়, ত্রিশ সেকেন্ড পরেই ফিরে এল বুয়েল। হাতে একটা চার ভাঁজ করা কাগজ। কাগজটা একখানা ছোট্ট টেবিলে বিছিয়ে রানাকে ডাকল। এগিয়ে গেল রানা। রুস্তভ, গ্যাকো গেল, রাইকভও গেলেন।

ম্যাপটা দেখিয়ে রুস্তভকে জিজ্ঞেস করল বুয়েল, 'প্লেনটা কোথায় পড়েছে, ম্যাপে দেখাতে পারবেন?'

দেখিয়ে দিল রুস্তভ। ম্যাপের এক জায়গায় তর্জনী রেখে বলল, 'এই যে...এখানে...হ্যাঁ, হ্যাঁ এখানে, এইখানটায় রয়েছি আমরা এখন—প্লেনটা পড়েছে ঠিক এইখানে।'

'ভালই করেছে,' বলতে বলতে পকেট থেকে পেনসিল বের করল বুয়েল। মনে হচ্ছে খুশি হয়ে উঠেছে সে। রুস্তভ যে পয়েন্টটা নির্দেশ করেছে তার সামান্য পশ্চিমে এক জায়গায় পেনসিল দিয়ে ছোট্ট গোল দাগ দিল। রানার দিকে চেয়ে হাসল, 'কপাল ভাল আপনার। এই যে দাগ দিলাম, ঠিক এখানে একটা ওয়েদার ক্যাম্প আছে। ইংরেজদের। রিমোট সাইন্টিফিক রিসার্চ স্টেশন। প্লেন থেকে মাইলখানেক হবে বড়জোর...উঁচু টিলা আছে একটা, বরফের পাহাড়ই বলতে পারেন। ওটার পাশে...'

'আপনি জানলেন কি করে?' জানতে চাইল রানা। হঠাৎ আশার আলো দেখতে পেয়েছে সে।

'আরে! জানব না মানে? আমি ড্রিফট স্টেশন নভেলির চীফ টেকনিশিয়ান না? এদিকে কোথায় ক'টা ওয়েদার স্টেশন বা ক্যাম্প রয়েছে, মুখস্থ আমার। কখন কি দরকার পড়ে কেউ জানে না। নিজেদের স্বার্থেই আমাদের অনেক কিছু জেনে রাখতে হয়। তাছাড়া প্রতিযোগিতাও রয়েছে তো আমাদের মধ্যে।'

'হুঁ,' ম্যাপে জায়গাটা ভাল মত দেখে নিল রানা। 'থ্যাংক ইউ, বুয়েল। আচ্ছা, ওসব ক্যাম্পে ট্রাক্টর...'

'থাকে। ওই সব স্টেশনে বা ক্যাম্পে যারা কাজ করতে আসে, তাদের আসল বাহনই হলো ট্রাক্টর। স্লেজও থাকে অবশ্য। তবে বছরের এই সময়ে এই ক্যাম্পে কারও দেখা পাবেন কিনা সন্দেহ আছে। আবহাওয়া ভীষণ খারাপ হয়ে পড়ে তো, সময় থাকতেই সরে পড়ে সবাই। তবে খাবার আর শেল্টার যে

পাবেন…'

মাথার ওপরে মাইক্রোফোনের ধাতব কণ্ঠে বুয়েলের কথায় বাধা পড়ল। 'কমান্ডার, একেবারে কাছে এসে গেছে ডেস্ট্রয়ার। এবার ডুব না দিলে…'

'সময় হলে ডুব দিতে বলব আমি,' রাইকভের কণ্ঠস্বর গম্ভীর।

আর একটাও কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল রানা। সামনেই দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ডাক্তার রুডেনকোকে।

'মেজর কিরিম কেমন আছে, ডাক্তার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভালই। ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি,' বলল রুডেনকো। 'আর হপ্তাখানেকের মধ্যেই হাঁটতে পারবে।'

'ও জাগলে আমার শুভেচ্ছা দেবেন। চলি।'

সেইলে উঠে এল রানা। তার পেছন পেছন উঠে এল আরও অনেকে। আসলে এভাবে অনিশ্চয়তার মাঝে রানাকে যেতে দেয়া উচিত হচ্ছে না মোটেই, জানে; আবার যাওয়াটাই যে মানবতার পরিচয়, তাও জানে। কেমন যেন অসহায় বোধ করছে লেনিনগ্রাদের সবাই। রানাকে বারণ করা যায় না, নিজেদেরও থাকার উপায় নেই। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এসে দাঁড়াল ওরা বিদায় জানাতে।

উত্তরে তাকাল একবার রানা। তুষারে ঢাকা গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা গেল না।

'চলি, ক্যাপ্টেন,' রাইকভের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকাল রানা।

'আসুন,' হঠাৎই নিজেকে বড় ছোট মনে হলো রাইকভের, বড় অসহায়, অক্ষম।

তক্তা পেরিয়ে ব্যাগ নিয়ে নামার সময় রানাকে সাহায্য করল রুস্তভ। পেছন পেছন এল গ্যাকো। বরফের ওপর নেমে এল তিনজনেই। বিদায় জানাতে যাবে রানা, হঠাৎ বলে উঠল গ্যাকো, 'মেজর, এক মিনিট দাঁড়াও। আমি আসছি,' বলেই আর দাঁড়াল না সে।

ঠিক পঁচিশ সেকেন্ডের মাথায় ফিরে এল গ্যাকো। রানার হাতে কিছু একটা গুঁজে দিতে দিতে বলল, 'এটা নিয়ে যাও। কাজে লাগবে।'

হাতের আন্দাজেই জিনিসটা কি বুঝল রানা। একটা ধাতব হুক আর খানিকটা দড়ি।

'আর আসতে হবে না তোমাদের। সবকিছুর জন্যে তোমাদের অনেক… অনেক ধন্যবাদ,' বলে রওনা হলো রানা।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও খানিকটা এল গ্যাকো আর রুস্তভ। তারপর জোর করে ফেরাল নিজেদের।

চলতে চলতেই ফিরে চাইল একবার রানা। সেইলে দাঁড়িয়ে আছে এখন মাত্র একটা মূর্তি। কমান্ডার।

সার্চলাইট জ্বলছে লেনিনগ্রাদের। তীব্র আলোকে অনেক ম্লান করে দিয়েছে উড়ন্ত তুষারকণা। বাতাসের গতিবেগ বাড়ছে তো বাড়ছেই। হাঁটছে রানা দ্রুতপায়ে।

শ'দুয়েক গজ এগিয়েছে রানা, হঠাৎই দপ করে নিভে গেল সার্চলাইট। একেবারে কাছে এসে গেছে নিশ্চয় ডেস্ট্রয়ার। পিছনে ফিরে চাইল আবার। হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় আরও ঘন হয়েছে যেন দুর্যোগের কালো রাত। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না, কিন্তু বুঝতে পারছে সে, ডুব দিচ্ছে লেনিনগ্রাদ।

সামনে পেছনে ডাইনে বাঁয়ে শুধু অন্ধকার। চারদিকে বাতাসের গর্জন। হঠাৎই অনেক বেশি মনে হলো ঠাণ্ডাটা। সার্চলাইটের আলো নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও যেন বেড়ে গেছে আচমকা। বিশাল এই বরফ-শূন্যতার মাঝে নিজেকে বড়ই ক্ষুদ্র আর অসহায় মনে হলো রানার।

পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বালল সে। ব্যাগ কাঁধে এগিয়ে চলল সামনে।

দুই

রিক ব্যারির কানেই প্রথম ধরা পড়ল ক্ষীণ শব্দটা। ওর শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সত্যিই বিস্ময়কর।

গভীর মনোযোগে হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা তিমির দাঁত পরীক্ষা করছিল ব্যারি, শব্দটা শুনেই আচমকা স্থির হয়ে গেল ওর হাত দুটো। কান খাড়া করে কয়েক সেকেন্ড শুনে হাতুড়িটা দাঁতের পাশে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল। ধীর পায়ে এসে দাঁড়াল ভেন্টিলেশন শ্যাফটের কাছে। কান রাখল শ্যাফটের বাতাস চলাচলের ফোকরটায়। চোখ আধবোজা করে সেকেন্ড দুই গভীর মনোযোগে শুনল। তারপর ঘোষণা করল, 'একটা প্লেন।'

পড়তে আর ভাল লাগছিল না ডাক্তার ব্রাউন ডেভিডসনের। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশ হয়ে এসেছে হাত দুটো। বিরক্তভাবে বইটা পাশে নামিয়ে রেখে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে চিবুক পর্যন্ত ঢুকিয়ে নিয়ে তাকিয়ে আছেন ব্যারির দিকে।

'প্লেন?' দুই কনুইয়ে ভর রেখে আধশোয়া হলেন ব্রাউন। 'মদ গিলেছ নাকি, রিক?'

'আপনি জানেন, ডাক্তার, ওসব খাই না আমি,' গম্ভীর গলায় বলল ব্যারি, কিন্তু নীল চোখ দুটো হাসছে। এস্কিমো সে—খাঁটি এস্কিমোদের মতই উজ্জ্বল চামড়ার রঙ, বিশাল চোয়াল আর মুখের সঙ্গে চোখ দুটো কেমন যেন বেমানান। 'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি এখন। উঠে আসুন, আপনিও শুনতে পাবেন।'

'দরকার নেই,' আস্তে করে আবার শুয়ে পড়লেন ব্রাউন। পনেরো মিনিট আগে ঢুকেছেন স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে। একটু একটু করে গরম হতে শুরু করেছে ভেতরটা। এই সময়ে বেরিয়ে আসার কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। শুয়ে শুয়েই স্কাই-লাইটের দিকে তাকালেন। তুষারকণা ভারী হয়ে জমেছে কাঁচের বাইরে, অস্বচ্ছ করে দিয়েছে কাঁচ দুটোকে। তরুণ রেডিওম্যান কেভিন পোর্টারের দিকে তাকালেন। ঘুমের মাঝেও ছটফট করছে সে, স্বপ্ন দেখছে হয়তো। তাঁরই সাথে

চার মাস আগে জনশূন্য তুষার-উপত্যকায় গড়ে তোলা এই স্টেশনে এসেছে পোর্টার। নির্জন বরফের দেশে চারটি মাস এক সাংঘাতিক দীর্ঘ সময়। ভাবলেন, তিনিও ঘুমের মধ্যে ওরকম ছটফট করেন কিনা কে জানে। এতদিনে এই প্রথম প্লেনের শব্দ শোনা গেল, সভ্যতার সঙ্গে প্রথম পরোক্ষ সংস্পর্শ। ব্যারির দিকে আবার তাকালেন ডাক্তার, 'এখনও শুনতে পাচ্ছ?'

'আরও পরিষ্কার। জোরাল হচ্ছে শব্দটা।'

কোথা থেকে এল বিমানটা?—ভাবছেন ডাক্তার। থিউলের ওয়েদার প্লেন? না, সম্ভব নয়। এখান থেকে ছ'শো মাইলেরও বেশি দূরে থিউল। তাছাড়া রোজ অন্তত তিনবার আবহাওয়ার খবর পাঠান তাঁরা থিউলে। তাহলে কোন আমেরিকান বম্বার? DEW লাইনের সন্ধান করছে? কিংবা ট্রান্স-পোলার রুট খুঁজে বেড়াচ্ছে? নাকি গডথ্যাব থেকে···।

'ডাক্তার ব্রাউন,' তীব্র উৎকণ্ঠা প্রকাশ পেল ব্যারির গলায়, 'প্লেনটা বিপদে পড়েছে! খুব নিচু দিয়ে চক্কর মারছে। বিরাট প্লেন···কয়েকটা মোটর···'

'দুত্তোর!' বিরক্ত হয়ে ব্যাগের ভেতর থেকে হাত বের করলেন ডাক্তার। মাথার পেছনে নিয়ে গেলেন ডান হাত। ঘুমানোর আগে সব সময় মাথার কাছে দেয়ালের হুকে রেশমের দস্তানা দুটো ঝুলিয়ে রাখেন, আন্দাজেই খুলে নিলেন। দস্তানা পরে বেরিয়ে এলেন ব্যাগের ভেতর থেকে। উষ্ণ উত্তাপ থেকে বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে হি হি শীত হাড় পর্যন্ত যেন কাঁপিয়ে দিল। আধ ঘণ্টাও হয়নি, বাইরে বেরোনোর গরম পোশাকগুলো খুলে রেখেছিলেন, ইতোমধ্যেই জমে শক্ত হয়ে গেছে। বাইরের তুলনায় ঘরের ভেতরে গরম, অর্থাৎ জিরো ডিগ্রীর সামান্য নিচে। হিমঠাণ্ডা পোশাকগুলো পরতে শুরু করলেন আবার ডাক্তার: আন্ডারওয়্যার, ফারের শার্ট-প্যান্ট, পার্কা, উলের টুপি, দুই জোড়া উলের মোজা, বরফে চলার উপযোগী জুতো। অভ্যস্ত হাতে এতগুলো কাপড়-চোপড় পরতে মাত্র তিরিশ সেকেন্ড খরচ করলেন তিনি। এই দুর্গম তুষারের রাজ্যে বেঁচে থাকতে হলে কিছু ব্যাপারে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করতে হয়, দ্রুত কাপড়-চোপড় পরার কৌশল তার মাঝে একটা।

কাপড় পরে পোর্টারের কাছে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। নাক চোখ আর কপাল শুধু বেরিয়ে আছে স্লিপিং ব্যাগের বাইরে। পাশে বসে তাকে ধাক্কা দিলেন ব্রাউন; 'ওঠো, উঠে পড়ো তো, পোর্টার। ও-ঠো-ও।'

'কি হলো?' হাই তুলল পোর্টার। দু'হাতে চোখ ডলল। মাথার ওপরের ক্রোনোমিটারটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আধঘণ্টাও তো হয়নি।'

'জানি, পোর্টার, দুঃখিত। ওঠো,' এগিয়ে চললেন ডাক্তার। বিরাট আর সি এ ট্রান্সমিটারটার পাশ কাটিয়ে, স্টোভের ধার দিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন যন্ত্রপাতি রাখার টেবিলটার কাছে। রেজিস্টার শো করছে: পুব উত্তর-পুবে বাতাস বইছে, গতিবেগ সতেরো মাইল। খালি বাতাস হলে এই গতিবেগ এমন কিছুই নয়, কিন্তু উড়ন্ত তুষার পরিবেশটাকে ঘোরাল করে তুলেছে। অ্যালকোহল থার্মোগ্রাফে দ্রুত নামছে তাপমাত্রা। ঝড় আসবে জানাচ্ছে অ্যানিমোমিটার। প্রতিটি যন্ত্রপাতিতে অশুভ

সঙ্কেত, রাতটা ভয়ানক দুর্যোগের মধ্যে দিয়ে কাটবে। ভবিষ্যৎ কয়েক ঘণ্টার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়লেন ডাক্তার ব্রাউন।

ব্যারির দিকে তাকালেন ডাক্তার। ইতোমধ্যেই পোশাক পরে ফেলেছে সে-ও। অন্য ধরনের পোশাক। বল্গা হরিণের চামড়ার ট্রাউজার, শার্ট আর টুপি। চমৎকার ভাবে হাতে সেলাই করেছে ওর বউ। চামড়ার দস্তানা পরতে পরতে এস্কিমোর দিকে তাকিয়ে হাসলেন ব্রাউন। ঠিক এই সময় পরিষ্কার শুনতে পেলেন ইঞ্জিনের শব্দ। পোর্টারও শুনেছে। বায়ুযন্ত্রটার একঘেয়ে খড়খড় আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠেছে শক্তিশালী ইঞ্জিনের গর্জন।

'প্লেন···প্লেনের শব্দ!' নিজেকেই যেন বোঝাচ্ছে পোর্টার।

'ঠিকই,' আইস মাস্ক আর গগলসটা হাতে ঝুলিয়ে নিলেন ডাক্তার। ব্যাটারি ঠাণ্ডায় নষ্ট হয়ে যায়, তাই টর্চসুদ্ধ স্টোভের পাশের তাকে রাখা হয়, গরম থাকে ওখানে। টর্চটা তুলে নিলেন ব্রাউন।

'ইঞ্জিনে কোন গোলমাল আছে বলে তো মনে হয় না,' কান পেতে শুনে বলল পোর্টার।

'ইঞ্জিন ছাড়াও প্লেনের আরও অনেক কিছু খারাপ হতে পারে,' ডাক্তার বললেন।

'কিন্তু চক্কর মারছে কেন ওটা?'

'কি করে বলি? হয়তো আমাদের কেবিনের আলো দেখেছে। পঞ্চাশ হাজার বর্গমাইলের ভেতরে তো লোকবসতি নেই, আমাদের আশপাশেই নামতে চায় হয়তো।'

'খোদা সহায় হোন ওদের,' শান্তকণ্ঠে বলল পোর্টার। বিড়বিড় করে আরও কিছু বলল, কিন্তু শোনার আগ্রহ নেই ডাক্তারের। যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়িয়েছেন।

এখানে, এই বরফে বসে ঘর বানানো সম্ভব নয়। কাঠ দিয়ে পুরো কেবিনটার বিভিন্ন অংশ আগে বানানো হয়েছে থিউলে, জাহাজে করে টুকরোগুলো বয়ে আনা হয়েছে কাছের উপকূলে, সেখান থেকে ট্রাক্টরে করে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে। বরফপাহাড়ের ঢালে এক জায়গায় একটা বড় গর্ত খুঁড়ে তাতে জোড়া লাগানো কেবিনটা বসিয়ে দেয়া হয়েছে শুধু। বরফসমতল থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি বেরিয়ে আছে কেবিনের চুড়ো, বাকি পুরো ঘরটাই গর্তের ভেতরে রয়েছে। প্রচণ্ড ঝড়ের কবল থেকে কেবিনটাকে রক্ষা করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। দরজাটাও সাধারণ দরজার মত নয়, বিশেষ এক ধরনের ট্র্যাপ-ডোর। একটা মাত্র পাল্লা, দু'দিক থেকে হিঞ্জে আটকানো, ওপরে-নিচে যাতায়াত করতে পারে শুধু, অর্থাৎ বাইরে বেরোনোর কিংবা ভেতরে ঢোকার দরকার হলে ঠেলে বা টেনে ওপরের দিকে তুলে দিতে হয়।

দুই ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে দরজার পাশেই নির্দিষ্ট জায়গায় ঝুলিয়ে রাখা হাতুড়িটা টেনে নিলেন ডাক্তার। যতবারই পাল্লা খোলার দরকার পড়ে হাতুড়িটা দিয়ে পিটিয়ে হিঞ্জ থেকে বরফ পরিষ্কার করে নিতে হয়। নইলে খুলবেই না পাল্লা।

হাতুড়ি দিয়ে ঠুক ঠুক করে বরফ পরিষ্কার করে নিলেন ডাক্তার। তারপর

পাল্লার নিচের হাতল ধরে টান দিলেন ওপর দিকে। দরজাটা ওপরের দিকে উঠতেই হিঞ্জে লেগে থাকা আলগা বরফের কুচিগুলো ঝুর ঝুর ঝরে পড়ল। খোলা আকাশের তলায় এসে দাঁড়ালেন ব্রাউন। রাতটা কেমন যেন বিচিত্র মনে হলো।

তৈরি হয়েই বেরিয়েছেন, কিন্তু তবু ঠাণ্ডা বাতাসের আচমকা ঝাপটায় দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড় হলো ডাক্তারের। ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে হড়াৎ করে নাকের ভেতরে ঢুকে গেল কিছু বরফের কুচি। কেশে উঠে সঙ্গে সঙ্গেই দস্তানা পরা হাত দিয়ে নাকটা চেপে ধরলেন। বাতাসের দিকে পিছন ফিরে তাড়াতাড়ি পরে নিলেন স্নো গগলস আর মাস্কটা। এই সময়ই বাইরে বেরিয়ে এল রিক ব্যারি।

ব্যারিই প্রথমে দেখল বিমানটাকে। প্রচণ্ড গর্জন তুলে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওটা। ফিরে এল। আবার গেল আবার ফিরল। গোত্তা মেরে মেরে পাক খাচ্ছে। একটু একটু করে কমিয়ে আনছে উচ্চতা।

'নামবে ওটা, কোন ভুল নেই,' বলল ব্যারি।

'কুকুর আর স্লেজটা···জলদি!' আদেশ দিলেন ব্রাউন। ট্রাক্টরের ইঞ্জিন জমে আছে ঠাণ্ডায়। ওটা চালু করতে অনেক সময় লাগবে। আদৌ চালু হবে কিনা তাই বা কে জানে। এখন একমাত্র ভরসা কুকুর-টানা স্লেজ।

চলে গেল ব্যারি। ডাক্তার ঢুকলেন কেবিনে। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে ধাক্কা খেলেন পাশের ইন্সট্রুমেন্টস শেল্টারে। সিঁড়ি বেয়ে নামার মত সময় নেই, লাফিয়ে নামলেন মেঝেতে।

পোর্টারও পোশাক পরে তৈরি। ফারের টুপিটা কাঁধে ঝুলছে, সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে আসছে। কেবিনের অন্যপ্রান্তে সুড়ঙ্গমুখটা। বরফ কেটে লম্বা-চওড়া এই সুড়ঙ্গ বানানো হয়েছে খাবার-দাবার, জ্বালানি ইত্যাদি রাখার জন্য।

'যত পারো গরম জামাকাপড় সঙ্গে নাও, কেভিন,' বললেন ডাক্তার। 'কোট, প্যান্ট, কম্বল যা পারো নিয়ে প্লাস্টিকের বস্তায় ভরো।'

'ওরা তাহলে সত্যি নামছে, স্যার? নামতে পারবে?' বুদ্ধিদীপ্ত চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে পোর্টারের। মুখে সন্দেহ আর শঙ্কার ছাপ পরিষ্কার।

'নামতে যাচ্ছে ঠিকই, পারবে কি পারবে না, জানি না। যাও, জলদি করো। আর হ্যাঁ, শোনো, ফায়ার বম্ব, পাইরিন···জমে যায়নি নিশ্চয়?'

'না। কিছু বোমা আর দুটো পাইরিন তৈরি করেই রেখেছি।'

'ভেরি গুড। হ্যাঁ, ন্যু-সুইফট জি-থাউজ্যান্ডও নিও কয়েকটা। বিরাট প্লেন। হাজার হাজার গ্যালন তেল থাকবে হয়তো। আগুন নেভানো সহজ হবে না। ফায়ারঅ্যাক্স, ক্রো-বার, কেইন, হোমিং স্পূল, সার্চলাইটের ব্যাটারি···সব নাও। দেখো, ঠিকঠাক মত ব্যাগে ভরো।'

'ব্যান্ডেজ?'

'দরকার নেই। কাটা থেকে রক্ত বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জমে যাবে এই ঠাণ্ডায়। আরও রক্ত বেরোতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, মরফিয়া কিটটা নাও। বাকেট দুটোতে পানি আছে?'

'ভরা। তবে পানির চেয়ে বরফই বেশি।'

'স্টোভে বসিয়ে দাও। গরম হোক। কেবিন থেকে বেরোনোর সময় নিভিয়ে দেবে স্টোভ। কেবিনে কোন ল্যাম্পও জ্বলবে না।'

আগুন ছাড়া বাঁচার কোন উপায়ই নেই বরফের দেশে, অথচ আগুনই এখানকার বড় শত্রু। আগুনের ব্যাপারে সামান্যতম অসাবধান হওয়া যায় না। বিশেষ করে রাশানদের আইস স্টেশন নভেলি পুড়ে যাওয়ায় সতর্ক হয়ে গেছে আর সব স্টেশন।

আবার বাইরে বেরোলেন ডাক্তার। কেবিনের এক পাশে কুকুরের ঘর। প্যাকিং বাক্সের কাঠ আর ট্রাক্টর ঢেকে রাখার একটা পুরানো তেরপল দিয়ে তৈরি করেছে ব্যারি। কুকুরদের ট্রেনার এবং মালিকও সে-ই। তীব্র প্রতিবাদে চেঁচামেচি জুড়ে দিয়েছে কুকুরগুলো। কর্কশ কণ্ঠে কয়েকটা এস্কিমো-গাল দিল ব্যারি। কুঁই কুঁই আওয়াজ তুলে মিইয়ে গেল জানোয়ারগুলো। চারটে কুকুরকে স্লেজের সঙ্গে জুতে বের করে নিয়ে এল ব্যারি।

'ঠিক আছে সব?' চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'ঠিক আছে। রোল্টা হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে একটু খেপে গেছে অবশ্যি।'

স্নো-মাস্কের আড়ালে এস্কিমোর মুচকি হাসিটা মনে মনে কল্পনা করলেন ডাক্তার। ব্যারির সেরা কুকুর রোল্টা। নব্বই পাউন্ডের প্রকাণ্ড এক ভয়ঙ্কর জানোয়ার: নেকড়ে আর বুনো সাইবেরিয়ান কুকুরের মিশ্রণ। ভয় কাকে বলে জানা নেই। তেজি, বুদ্ধিমান, কষ্টসহিষ্ণু, দারুণ প্রভুভক্ত। খেপে গেলে কিন্তু প্রভুকেও ছেড়ে কথা কয় না সে। কামড়ায় না যদিও, দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে আসে।

কেবিনের পশ্চিমে জমাট তুষারশৈলের কাছে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। কান পাতলেন। বাতাসের বিলাপ আর বায়ু-যন্ত্রের একঘেয়ে খড়খড় ছাড়া কিছুই শুনলেন না। তীব্র ধারাল বাতাসের দিকে মুখ করে ঘুরে দাঁড়ালেন। নাহ্, শোনা যাচ্ছে না।

ব্যারিকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্লেনের আওয়াজ এখন শুনছ, রিক?'

ডান কানের আধ ইঞ্চি ওপর হাতের তালু নিয়ে এল ব্যারি। বাতাসের দিকে কান পেতে চুপচাপ শুনল দুই সেকেন্ড। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, 'না।'

'নেমে পড়ল না তো কোথাও!'

আবার মাথা নাড়াল ব্যারি।

'কি করে বুঝলে? এই আবহাওয়ায় আধ মাইল দূরে ওটা ভেঙে পড়লেও শোনা যাবে না।'

'যাবে। শোনা না গেলেও অনুভব তো করতামই।'

আর কিছু বললেন না ডাক্তার। ব্যারির কানের ওপর পুরো আস্থা আছে তাঁর। তাছাড়া যত খারাপ আবহাওয়াই হোক, বিরাট একটা প্লেন ভেঙে পড়ার শব্দ এক-আধমাইল দূর থেকে শোনা যাবে। নিদেন পক্ষে কম্পন তো অনুভব করা যাবেই। জমাট বরফে অনেক দূর থেকেও টের পাওয়া যায় কাঁপন; এই তো কয়েক মাস আগে, কেবিন থেকে সত্তর মাইল দূরে, একটা ঝুলন্ত হিমশিলা ভেঙে পড়েছিল নিচের ফিয়র্ডে। কাঁপনটা টের পাওয়া গিয়েছিল এখান থেকেও। তাহলে? হয়তো কেবিনের আলো হারিয়ে ফেলেছে পাইলট, পথ ভুলে অন্য কোনদিকে চলে গেছে।

কেবিন আর গর্তের এক পাশের দেয়ালের মাঝে ইচ্ছে করেই কয়েক গজ ফাঁক রেখে দেয়া হয়েছে। ট্রাক্টরটা রাখা হয়েছে ওই ফাঁকে। তেরপল দিয়ে ঢাকা যন্ত্রটার কাছে তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন ডাক্তার। যদি দূরে কোথাও গিয়ে পড়ে বিমান, খুঁজতে হলে লাগবে এটা। তেরপলে জমে থাকা বরফের কুচিগুলো সরিয়ে এক কোণ ধরে আলতো টান দিলেন। জমে গেছে তেরপল। আরেকটু জোরে টান দিতেই ভেঙে খসে এল তেরপলের ছোট একটা টুকরো। বুঝলেন তিনি, লাভ নেই। তুলতে গেলে ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাবে তেরপল। বাড়তি নেই, ফলে খোলা রাখতে হবে ট্রাক্টরটাকে। কয়েক ঘণ্টা পরেই ওটাকে বাতিল বলে ধরে নিতে হবে।

ট্রাক্টরের দু'দিকের বনেটে দুটো সার্চলাইট ফিট করা আছে। সহজেই যাতে খোলা-লাগানো যায় এজন্যে বাটারফ্লাই নাট ব্যবহার করা হয়েছে। একবার চেষ্টা করেই হাল ছেড়ে দিলেন ব্রাউন। নাট আর বোল্টে বরফ জমে আছে, পাথরের মত শক্ত। এই বরফ গলানো ঝামেলার ব্যাপার, সময়ও নেই। ট্রাক্টরের টুল বক্স থেকে একটা স্প্যানার নিয়ে ঠুকে বরফ পরিষ্কার করতে গেলেন, বাজে কাঁচা লোহার মত ভেঙে গেল বোল্ট।

সার্চলাইটটা হাতে নিয়েছেন, এই সময় আবার শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ। দ্রুত এগিয়ে আসছে। কিন্তু ওটাকে দেখার কোন চেষ্টা করলেন না ব্রাউন। কেবিনের দরজার দিকে ছুটলেন। কিন্তু থেমে গেলেন কয়েক পা এগিয়েই। বাইরে বেরিয়ে এসেছে পোর্টার। ব্যারির সহায়তায় স্লেজে জিনিসপত্র তুলছিল পোর্টার, প্লেনের শব্দে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে, এক সেকেন্ড পরেই একটা হিস হিস শব্দ উঠল। পোর্টারের কাছ থেকে তীব্র একটা সাদা আলোর ঝলক শাঁ করে উঠে গেল আকাশে। শব্দ করে ফাটল। উজ্জ্বল নীলচে-সাদা আলোয় দিন হয়ে গেল কালো রাত। ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ারের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন ডাক্তার। কিন্তু পোর্টারের ঠিক মনে আছে। বুদ্ধি করে নিয়ে এসেছে সে। ছুঁড়েছেও ঠিক সময়ে।

পুব থেকে এসে তীব্র আলোর ভেতর দিয়ে ছুটে পশ্চিমে চলে গেল বিমানটা মাথার বিশ-পঁচিশ গজ ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড শব্দে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হলো। কর্কশ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কুকুরগুলো, কিন্তু ইঞ্জিনের কানফাটানো শব্দে চাপা পড়ে গেল সেই গর্জন।

'অ্যান্টেনা!' চেঁচিয়ে উঠলেন ব্রাউন, 'অ্যান্টেনা লাইন ধরে যেতে হবে আমাদের···ওদিকেই নামবে···'

'গড! ওদিকে তো শুধু বরফের স্তূপ। বিশাল টিলাও আছে। ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে তো!' আঁৎকে উঠেছে পোর্টার।

'জলদি ছোটো!' বলেই রওনা দিলেন ব্রাউন।

পশ্চিম দিকে সরাসরি আড়াইশো ফুট পর্যন্ত এগিয়ে গেছে অ্যান্টেনা লাইন। চোদ্দ ফুট পরপর বসানো হয়েছে খুঁটি। জমে পঞ্চাশগুণ মোটা হয়ে ঝুলছে বরফ ওগুলোর মাথায় আটকানো তারে। টর্চের আলোয় খুঁটি দেখে দেখে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। বিশ গজ আসতে কয়েক বার পা পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচেছেন। কিন্তু এবারে আর পারলেন না। উঁচু হয়ে থাকা ছোট্ট একটা ঢিবিতে হোঁচট খেয়ে হুমড়ি

খেয়ে পড়লেন। এই সময়ই শোনা গেল শব্দটা। তীব্র ঘষা খাবার আওয়াজ। বরফে কান পেতে শুনলেন, আরও জোরাল শোনাচ্ছে শব্দটা। কেমন একটা অদ্ভুত কাঁপন ছড়িয়ে পড়ছে বরফে। নেমে পড়েছে বিমানটা।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ব্রাউন। কয়েক পা এগিয়েই টের পেলেন ব্যাপারটা, স্নো-মাস্ক নেই মুখে। তাড়াতাড়ি ফিরে টর্চের আলো ফেললেন। নেই। বাতাসে কোথায় উড়ে গেছে মাস্কটা কে জানে। কেবিনে ফিরে গিয়ে আরেকটা মাস্ক আনার সময় নেই এখন। পেছনে কুকুরের চিৎকার শোনা যাচ্ছে, কয়েক সেকেন্ড পরেই এসে গেল ওরা।

ব্রাউনকে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করল পোর্টার, 'কি হলো, স্যার?' আলো ফেলল ডাক্তারের মুখে। 'একি! আপনার মাস্ক?'

'হারিয়ে ফেলেছি। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই,' কিন্তু কথাটা বলেই বুঝলেন ব্রাউন, চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। শ্বাস নেবার সময় গলা জ্বালা শুরু হয়ে গেছে ইতোমধ্যেই। কেবিনে ফেরার পর মুখের অবস্থাটা কি হবে মনে মনে আন্দাজ করে নিয়ে বললেন, 'প্লেনটা পড়েছে শুনেছ?'

'শুনেছি,' বলল ব্যারি।

'চলো, জলদি,' বলেই আবার হাঁটতে লাগলেন ব্রাউন।

খুঁটি ধরে ধরে বাতাসের গতিকে সামান্য বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছে ওরা। আগে ডাক্তার, মাঝে কুকুরের পাশে ব্যারি, পেছনে পোর্টার।

সব শেষের খুঁটিটার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন ব্রাউন। পোর্টারও দাঁড়িয়ে পড়ল। কুকুরগুলোকে থামাল ব্যারি।

চাইতেই হোমিং স্পূল বের করে দিল পোর্টার। সুতোর বান্ডিলটা হাতে নিয়ে খুঁটির কাছে এসে দাঁড়ালেন ব্রাউন। খুঁটিতে বরফ জমে আছে। লাথি মারতেই গুঁড়ো হয়ে ঝুরঝুর করে পড়ল বরফের কুচি। গাছের বাকলের মত ছোটবড় বরফের বাকলও উঠে এল কিছু। বরফ পরিষ্কার করে খুঁটির গায়ে সুতোর এক দিকটা জড়িয়ে বাঁধলেন ডাক্তার। প্লেনটা ঠিক কোথায় পড়েছে, জানা নেই। কতদূরে কতটা খুঁজতে হবে, জানেন না। অন্ধকারে পথ চিনে আবার কেবিনে ফিরে আসার অন্যতম উপায় এই অ্যান্টেনার খুঁটিতে বাঁধা সুতো। এই সুতোর ওপরই জীবন নির্ভর করছে তাদের। কাজেই হুঁশিয়ার হয়েই গিঁট দিলেন ব্রাউন। যদি সুতো খুলে যায় খুঁটি থেকে তাহলেই সর্বনাশ!

আবার শুরু হলো চলা। আগের মতই প্রথমে ডাক্তার, মাঝে ব্যারি, পেছনে পোর্টার—হাতে স্পূল, আসছে সুতো ছাড়তে ছাড়তে।

মাস্ক নেই, মুখে অসহ্য যন্ত্রণা। জোর করে আবার না নিজের মাস্ক খুলে তাঁকে দিয়ে দেয় সঙ্গী দুজনের কেউ, এজন্যে যন্ত্রণার কোন অভিব্যক্তিই প্রকাশ করতে পারছেন না ডাক্তার। পথও যেন আর ফুরোতে চায় না। প্লেনটা কোথায় পড়েছে কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। মুখ আর ফুসফুসের জ্বলুনি তেতো করে তুলেছে তাঁর মন। দমকে দমকে কাশি আসছে, দস্তানার আড়ালে সারাক্ষণই ঢেকে রাখতে হচ্ছে নাক-মুখ। অনেকক্ষণ আটকে রেখে শ্বাস ছাড়ছেন। হাতের আড়াল

করে ধীরে শ্বাস নিচ্ছেন। কিছুটা কাজ হচ্ছে বটে, কিন্তু পুরোপুরি আটকাতে পারছেন না তুষার কণা। ফাঁকফোকর দিয়ে নাকে ঢুকে যাচ্ছেই।

ডাক্তারের টর্চ পকেটে, ব্যারির টর্চের আলোয় পথ দেখে হাঁটছেন। নাক-মুখ হাতের আড়ালে, কুঁজো হয়ে থাকতে হচ্ছে সর্বক্ষণ।

'শেষ,' হঠাৎ বলে উঠল পোর্টার।

নিজের অজান্তেই মুখ ফিরিয়ে তাকালেন ব্রাউন, 'কি?'

'স্পূলের সুতো শেষ···গড!' আঁতকে উঠে বলল পোর্টার, 'আপনার নাক-গাল তো গেছে, স্যার!'

হাত থেকে দস্তানা খুলে নিলেন ব্রাউন, গাল ঘষতে লাগলেন। অসাড় হয়ে এসেছিল, ঘষার ফলে অনুভূতি ফিরে এল, চামড়ার নিচে রক্ত চলাচল শুরু হয়েছে আবার। কেউ মাস্ক দান করে বসার আগেই এগিয়ে গিয়ে স্লেজ থেকে ব্যাগ খুলে একটা শার্ট বের করে নিলেন। পেঁচিয়ে নিলেন মুখে। 'এবার হয়েছে, আর অসুবিধে নেই। হ্যাঁ, কেইন গেড়ে গেড়ে হাঁটতে থাকব এবার।'

কেইন মানে সরু বাঁশের ছোট করে কাটা এক মাথা ছুঁচাল টুকরো। পনেরো-বিশ ফুট পর পর একটা করে কেইন চিহ্ন হিসেবে বরফে বসিয়ে দিতে দিতে চলল এবার পোর্টার। ছয়-সাতশো গজ চলতেই শেষ হয়ে গেল কেইন। দিক পরিবর্তন করেনি বাতাস। তাই আগের মতই বাতাসের গতিকে সামান্য বাঁয়ে রেখে আবার এগোল ওরা।

আরও বেশ অনেকদূর এগিয়েও বিমানটাকে দেখতে না পেয়ে রীতিমত ভাবনায় পড়ে গেলেন ব্রাউন। এইভাবে এগিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক। কি করবেন ঠিক করতে পারছেন না তিনি···ফিরে যাবেন? যদিও কুকুর রয়েছে সাথে···

আচমকা ঘোষণা করল ব্যারি, 'পেয়েছি।'

'কি? কি পেয়েছ?' জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'ওই যে,' টর্চের আলো ফেলল ব্যারি জায়গাটার ওপর।

গভীর দুটো গর্ত, পাশাপাশি। গর্ত দুটোর পশ্চিম পাড় থেকে দুটো গভীর দাগ চলে গেছে সামনের দিকে, যেন দুটো বড় সাইজের লাঙ্গল টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বুঝতে কারোই অসুবিধে হলো না, চাকার দাগ। টায়ারের মার্কিং নেই, তার মানে কোন কারণে ঘোরেনি চাকা, কিংবা অসমতল বরফে বিমানের গতিবেগের সঙ্গে তাল রেখে ঘুরতে পারেনি। ফলে ছেঁচড়ে যেতে হয়েছে।

আর অসুবিধে নেই। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন ব্রাউন। দাগ ধরে ধরে এগিয়ে গেলেই পাওয়া যাবে বিমানটাকে।

বিমানটার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে রানা, এমনি সময়ে কানে এল শব্দটা। নেকড়ের ডাক শুনেছে বলে মনে হলো তার। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে কান খাড়া করল। কিন্তু আর শোনা গেল না। নিজেকে বোঝাল রানা, মনের ভুল। এই গ্রীনল্যান্ডে নেকড়ে আসবে কোথা থেকে? ও বাতাসের শব্দ।

বিমানের পেটের তলা দিয়ে ডানে কন্ট্রোল কেবিনের নিচে এসে থামল রানা।

ব্যাগটা নামিয়ে রাখল কাঁধ থেকে। পকেট থেকে হুকসুদ্ধ দড়িটা বের করল। খুলল। বাঁ হাতে জানালায় আলো ফেলে ডান হাতে হুক ছুঁড়ে ফ্রেমে আটকাতে একটুও অসুবিধে হলো না। ব্যাগটা দড়ির নিচের মাথায় বাঁধল। টর্চ পকেটে রেখে দড়ি বেয়ে উঠে কেবিনে ঢুকল সে। তারপর দড়ি টেনে তুলে নিল অন্য মাথায় বাঁধা ব্যাগটা।

ওয়্যারলেস অপারেটরের পাশে এখনও বসে রয়েছে মেয়েটা। একটা কম্বল গায়ে জড়িয়েছে। কিন্তু তাতে ঠাণ্ডার কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। ভাঙা জানালা দিয়ে ভেতরে এসে ঢুকছে হিমেল বাতাস। বাইরের চেয়ে ঠাণ্ডা খুব একটা কম নয় এখানে। ব্যতিক্রম শুধু, বাইরে বাতাস আর বরফ রয়েছে, এখানে নেই। অবাক লাগল রানার, রেডিওম্যানকে ছেড়ে যেতে চাইছে না কেন মেয়েটা?

পরে জানা যাবে, ভেবে প্যাসেঞ্জার কেবিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। ভেজানোই রয়েছে পাল্লা। কি ব্যাপার? কোনরকম কৌতূহল নেই যাত্রীদের। কেবিন থেকে বেরোবার চেষ্টা করেনি কেউ। নাকি বেরিয়েই প্রচণ্ড ঠাণ্ডার তাড়া খেয়ে গিয়ে আবার ঢুকেছে ভেতরে?

দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ল রানা। বাইরের তুলনায় ঘরটা এখনও অনেক গরম, তবে প্রথমবার যখন এসেছিল তার চেয়ে অনেক কম। ইতোমধ্যেই অনেক নেমে গেছে তাপমাত্রা।

সামনেই একটা চেয়ারে বসে আছে পাকাচুলো গোমড়ামুখো লোকটা। চোখ বলছে ঘন ঘন মেজাজ বদলানোই এই লোকের স্বভাব। রানাকে দেখে চেয়ার থেকে উঠে সামনে এসে দাঁড়াল লোকটা। বাজখাঁই গলায় একসঙ্গে কতগুলো প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল সে, 'ব্যাপার কি, অ্যাঁ? প্লেনটা ল্যান্ড করেছে কেন? এখানে কি করছি আমরা? বাইরে ও কিসের আওয়াজ? আর আপনি···আপনাকে তো চিনতে পারলাম না!'

লোকটাকে অপছন্দ করল রানা। অনুমান করল জাঁদরেল ব্যবসায়ী গোছের কিছু হতে পারে। টাকা আর ক্ষমতার অহঙ্কারে আর সবাইকে তুচ্ছ ভাবতে অভ্যস্ত। কিংবা কে জানে, লোকটার সম্পর্কে ভুল ধারণাই করছে সে হয়তো। আধুনিক বিমানের এয়ার-কন্ডিশনড কেবিনে আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে যদি কেউ আচমকা জেগে উঠে সামনে আইস-মাস্ক, গগলস আর ফারের পোশাক পরা সারা গায়ে তুষার মাখা কাউকে দেখে, চমকে মেজাজ বিগড়ে গেলে তাকে দোষ দেয়া উচিত হবে না।

'প্লেনটা ক্র্যাশ ল্যান্ড করেছে,' ধীরে সুস্থে গোমড়ামুখোর প্রশ্নের জবাব দিল রানা, 'আপাতত আপনাদের কিছুই করার নেই কারও, বসে বসে সাহায্য আসার অপেক্ষা ছাড়া। বাইরে ঝড় হচ্ছে, তুষার ঝড়। আর আমাকে চেনার ব্যাপারটা এখন বাদই রাখুন। নামটা জেনে রাখুন শুধু, মাসুদ রানা।'

লোকটাকে পাশ কাটিয়ে এগোতে গেল রানা, কিন্তু সরে এসে তার মুখোমুখি দাঁড়াল আবার পাকাচুলো।

'দাঁড়ান,' কর্তৃত্ব প্রকাশ পেল লোকটার কণ্ঠে। রানার বুকে হাত দিয়ে ঠেলা

মারল, 'আমাদের জানার অধিকার রয়েছে···'

'পরে জানবেন,' গোমড়ামুখোর কব্জি ধরে চাপ দিল রানা। অবিশ্বাস ফুটল লোকটার চোখেমুখে। লোকটার হাত ছেড়ে দিল রানা। কাঁধ ধরে পেছনে ঠেলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল আগের চেয়ারে, 'বাড়াবাড়ি করবেন না। চুপচাপ বসে থাকুন।'

কিন্তু চুপচাপ রইল না গোমড়ামুখো, রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল।

মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসে আছে এখন কোঁকড়া চুলের অল্পবয়েসী লোকটা। রানাকে বলল, 'দিলেন তো চটিয়ে।'

'আসলে চটেই আছেন উনি,' বলতে বলতে কোঁকড়াচুলের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। লোকটার চওড়া কাঁধ আর সমর্থ শরীরের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল। এই লোকের মজবুত হাত দুটোকে কাজে লাগাতে হবে। জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছেন এখন?'

'ভাল।'

'চেহারা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আগেরবার কিন্তু এত ভাল মনে হয়নি।'

'ধকলটা কাটিয়ে উঠেছি আর কি। তা···কোন সাহায্য করতে পারি?'

'এই কথাটাই জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম,' বলল রানা। 'রেডিওরুমে মারাত্মক আহত একজন লোক পড়ে আছে। তাকে এখানে নিয়ে আসতে সাহায্য করতে পারেন। তার আগে···'

বিমানের দরজার বাইরে একটা ধাতব শব্দ উঠল হঠাৎ। থেমে গিয়ে কান পাতল রানা। কয়েক সেকেন্ড পরে আবার হলো শব্দটা। চকিতে ঘুরে দাঁড়াল রানা। লেনিনগ্রাদ আবার ফিরে এল? ছুটল সে কেবিনের দরজার দিকে।

কন্ট্রোলরুমের ভাঙা উইন্ডব্রেকারের কাছে এসেই থমকে গেল রানা। না এবার আর ভুল শোনেনি, বিমানের বাঁ পাশ থেকেই এসেছে চিৎকারটা। নেকড়ে! ঝড়ো বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠেছে নেকড়ের ক্ষুধার্ত চিৎকার। ঘাড়ের কাছে রোমগুলো খাড়া হয়ে গেল রানার। নিজের অজান্তেই হাত চলে গেল পকেটে রাখা পিস্তলটার ওপর। কিন্তু কতক্ষণ? কটাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে সে পিস্তলের এক ম্যাগাজিন গুলি দিয়ে? রিমোট স্টেশন খোঁজা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে এখন। একা থাকে না নেকড়েরা, ওদের দলবদ্ধ চোখকে ফাঁকি দেয়া সম্ভব নয়। প্লেনে উঠে আসতে পারবে না জানোয়ারগুলো, কিন্তু এখানে বসে থাকলেও শীতে মরতে হবে। তাহলে?

নিচের দিকে তাকাল রানা। চোখ ডলল, ভুল দেখছে না-তো! নাহ্, ভুল দেখছে না, বিমানের পেটের তলা দিয়ে আলো এসে ছড়িয়ে পড়েছে বরফের ওপর। উজ্জ্বল আলো। তার মানে মানুষ। কিন্তু নেকড়ের ডাক এল যে! জানালা দিয়ে হাত বের করে প্লেনের গায়ে চাপড় মারল রানা। চেঁচিয়ে ডাকল, 'কে, কে ওখানে?'

'দরজাটা খোলা দরকার, রিক,' সার্চলাইটের আলোয় ডিম আকৃতির দরজাটা

দেখিয়ে বললেন ডাক্তার ব্রাউন। লেজের দিক থেকে বিমানের বাঁয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তারা। 'এমনিতে তো খোলা যাবে না, শাবল নিয়ে এসো।'

'শাবল দিয়ে…' বলতে বলতে বাধা পেয়ে গেল ব্যারি।

'আহ্, তর্ক করে না। আনো।'

সার্চলাইটটা পোর্টারের হাতে তুলে দিলেন ডাক্তার। শাবলটা নিলেন ব্যারির হাত থেকে। এগিয়ে গিয়ে দরজার ফাঁকে শাবলের মাথা ঢুকিয়ে চাপ দিলেন। পাথরের মত অনড় দরজা। চেপেচুপে ঘেমে গেলেন ডাক্তার, কিন্তু দরজা একচুল নড়ল না।

ব্যারিকে ডাকলেন ডাক্তার, তার সঙ্গে হাত লাগাতে বললেন।

দুজনেই সমানে চাপ দিল শাবলে। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে চেপেও কোন ফল হলো না। অগত্যা ব্যারিকে পেছনটা চেপে ধরে রাখতে বলে নিজে হ্যাঁইও করে ধাক্কা মারলেন শাবলের মাঝামাঝি। মরচে ধরা পুরানো শাবল, তার ওপর বরফ কামড় বসিয়েছে ধাতব গায়ে। প্রচণ্ড চাপ সইতে পারল না ওটা, মট করে ভেঙে গেল। দুজনেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল বরফের ওপর। হেসে উঠল পোর্টার।

ভীষণ ঠাণ্ডা। কুকুরগুলোও অস্থির হয়ে উঠতে চাইছে। গলা ছেড়ে চেঁচিয়ে উঠল রোল্টা। ধমকে তাকে থামাল ব্যারি। উঠে দাঁড়াল, ব্রাউনকে টেনে তুলল। ঝুঁকে হাঁটু ডলতে ডলতে দরজাটার দিকে চাইলেন ডাক্তার, ভাঙা শাবলটার দিকে তাকালেন। চোখ তুলে চাইলেন ওপরের জানালার দিকে। বললেন, 'জানালা, মানে, জানালা ভাঙা যাবে?'

'মনে হয় না। সাংঘাতিক শক্ত কাঁচ। তাছাড়া উঠবেন কি করে ওখানে?' দস্তানা পরা ডান হাতটা ঝাড়ছে ব্যারি।

'খুব লেগেছে, না?' নিজের হাঁটু ডলছেন এখনও ডাক্তার।

'না, এমন কিছু না।'

'কিন্তু কথা হলো ঢুকি কি করে?'

কিছু বলতে গিয়ে মুখ খুলেও থেমে গেল ব্যারি। ওপাশ থেকে বিমানের গায়ে চাপড় মারার শব্দ এল। কে যেন ডাকছে, 'কে, কে ওখানে?'

হুকে বাঁধা দড়ি বেয়ে উঠে এল ওরা দুজন, ডাক্তার ব্রাউন আর রিক ব্যারি। রানার পিছু পিছু এসে ঢুকল কেবিনে।

মুখে প্যাঁচানো শার্ট খুলে ফেললেন ডাক্তার। কেবিনের যাত্রীদের দিকে একবার চোখ বোলালেন, তারপর তাকালেন রানার দিকে। তার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিয়ে আরেকবার তাকালেন যাত্রীদের দিকে, আবার ফিরলেন। রানাকে যাত্রীদের থেকে আলাদা লাগছে, ঠিক যেন মিলছে না হিসেব—ফারের পোশাকে তুষার কণা।

জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার, 'আপনি কি প্লেনেই ছিলেন?'

'না,' বলল রানা।

'তাহলে ঠিকই ধরেছি। যাত্রীদের সঙ্গে পোশাক-আশাকে অনেক অমিল।

বাইরে থেকে এসেছেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কোথা থেকে?'

'বলছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন। আপনারা নিশ্চয়ই ব্রিটিশ রিমোট স্টেশনটা থেকে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। প্লেনটা বিপদে পড়েছে বুঝেই রওনা হয়েছি।'

'ভালই করেছেন। নইলে আপনাদের খোঁজে বেরোতে হত আমাকে।'

'আমাদের কথা জানলেন কি করে? আমরা কে, তা-ও জানেন বোধহয়?'

'আপনাদের নাম জানি না, তবে কি কাজ করেন জানি, মানে জেনেছি। ওই স্টেশনে কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছেন আপনারা।'

'ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি এলেন কোত্থেকে?'

'নর্থ পোলের কাছাকাছি গিয়েছিলাম কাজে। কাজ শেষ করে ফিরছিলাম, প্লেনটা বিপদে পড়েছে বুঝে নেমেছি।'

'নেমেছেন? জাহাজ?'

'সাবমেরিন। কোন কারণে এখান থেকে কয়েকশো গজ পুবে ভেসে উঠেছিল সাবমেরিনটা। সেইলে উঠেছিলাম আমরা। প্লেনটাকে তখনি পড়তে দেখি।'

'ও। যাক ভালই হলো। যাত্রীদের নিয়ে যেতে পারবেন...' হঠাৎই থেমে গিয়ে রানার মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার। আইস মাস্কে ঢাকা থাকায় মুখের কিছু দেখলেন না। 'সাবমেরিন থাকতে...আমাদের খুঁজতে যাবেন...'

'সাবমেরিনটা চলে গেছে। ফিরবে না আর। আমি একাই থেকে গেছি।'

'একাই থেকে গেছেন! ঠিক বুঝতে পারছি না আপনার কথা!' একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন ডাক্তার।

'যাত্রীদের সাহায্য প্রয়োজন। আপনারা যে উদ্দেশ্যে এখানে এসেছেন, আমিও ঠিক একই কারণে নেমেছি।'

'আপনি একা?' অবিশ্বাস ফুটে উঠল ডাক্তারের চোখে।

'সাবমেরিন থেকে দু'জন লোক এসেছিল আমার সঙ্গে। ওরা চলে গেছে, না গিয়ে উপায় ছিল না ওদের। তবে কাপড়-চোপড়, ওষুধপত্র রেখে গেছে।'

'এই তুষার ঝড়ের মধ্যে...আপনি একা...এই অনিশ্চিত অবস্থায়...আপনাকে রেখে ওরা চলে গেল...,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ডাক্তার, 'নাহ্ বিশ্বাস হচ্ছে না!'

'ঠিকই বলছে ও,' সীট থেকে উঠে ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়াল পাকাচুল। 'আগেরবার যখন এসেছিল, আরও একজন কেবিনে ঢুকেছিল ওর সঙ্গে, ফারের পোশাক পরা। আমাদের গরম কাপড় দিচ্ছিল, হঠাৎ প্লেনের পেটের কাছে একটা খট খট শব্দ শুনে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেছে দুজনেই। পঁচিশ তিরিশ মিনিট পরেই আবার ফিরে এসেছে ও,' রানাকে দেখিয়ে বলল, 'একা।'

বিস্মিত দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকালেন ডাক্তার, 'কে আপনি? আপনার নাম?'

'মাসুদ রানা।'

'কিছু মনে করবেন না,' কথা বলল এবারে ব্যারি। 'মুখ থেকে মাস্কটা সরাবেন দয়া করে?'

এক মুহূর্ত ব্যারির মাস্ক পরা মুখের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। ধীরে ধীরে নিজের মুখ থেকে মাস্ক খুলে আনল।

রানার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যারি। জড়িয়ে ধরল দুই হাতে। দু'জনের দিকে একসঙ্গে ঘুরে গেছে ঘরের সবক'টা চোখ। অবাক।

'রানা! আরে, আমাকে চিনলে না!' উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে ব্যারি। 'আরে আমি, আমি...' মুখ থেকে মাস্ক সরাল সে। 'দেখো তো চিনতে পারো কিনা?'

'রিক!' ভুরু কুঁচকে গেছে রানার। 'আইস স্পেশালিস্ট রিক ব্যারি। তুমি এখানে!'

'হ্যাঁ, আমিও কাজ করছি এই গবেষণা কেন্দ্রে। আশ্চর্য! আবার দেখা হবে ভাবতেও পারিনি।'

'আমিও না। তা আছ কেমন?'

'এই যেমন দেখতে পাচ্ছ,' বলে ডাক্তারের দিকে ফিরল ব্যারি। 'বস্, বাংলাদেশী দুঃসাহসী এক যুবকের কথা বলেছিলাম আপনাকে...এই সেই লোক। ক্যানাডায় কিছুদিন ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে কাজ করেছি আমরা। দারুণ লোক এই মাসুদ রানা। অন্যের জন্যে নিজের জীবনকে তুচ্ছ করে...'

'রঙ একটু বেশি চড়িয়ে ফেলছ, রিক,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'রিমোট স্টেশনটার কথা জানলেন কি করে আপনি, মিস্টার রানা?' গম্ভীর হয়ে গেছেন ব্রাউন।

'এ প্রশ্ন কেন?'

'বলুন না, জানতে চাইছি আর কি।'

'সাবমেরিনে এদিককার একটা ওয়েদার স্টেশনের চীফ টেকনিশিয়ান ছিল। তার কাছে জেনেছি।'

'ও। আমরা এখানে আছি জানে সে?'

'না। ও শুধু জানে, স্টেশনে গ্রীষ্মকালে বিজ্ঞানীরা এসে থাকেন, শীতকালে চলে যান আবার। ও বলেছিল, এখানে এসময়ে আপনাদের থাকার কথা নয়। তবে খাবার, আশ্রয়, পোশাক আর ওষুধ পাব।'

'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিয়েছেন আপনি। অপরিচিত কিছু লোককে সাহায্য করতে...এভাবে অনিশ্চয়তার মাঝে...নাহ্, আপনার কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না, মিস্টার রানা। কেউ এরকম...'

'বস্,' বলল ব্যারি, 'যতদূর জানি, খামোকা মিছে কথা বলার লোক মাসুদ রানা নয়। আমি গ্যারান্টি দিতে পারি, চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করতে পারেন ওকে, নিঃসন্দেহে ভরসা রাখতে পারেন ওর ওপর।'

'আমার নাম কার্টার ব্রাউন। ডাক্তার।' নিজের পরিচয় দিয়ে ডান হাত সামনে বাড়িয়ে দিলেন প্রৌঢ় ডাক্তার। রানা হাতটা ঝাঁকিয়ে দিতেই বললেন, 'নর্থ পোল...সাবমেরিন...উদ্ভট লাগছে শুনতে। যাই হোক, আগের কাজ আগে—এখন

আহতদের সেবা দরকার। আসুন হাত লাগানো যাক।'

তিন

'জামা-কাপড় পরে তৈরি হয়ে নিন সবাই, বেরোতে হবে এখান থেকে,' বলল রানা। 'বাইরে সাংঘাতিক ঠাণ্ডা।'

'ঠাণ্ডায় আমার কিচ্ছু হয় না,' বলে উঠল কোঁকড়াচুল।

'এখানকার ঠাণ্ডায় হবে। বাইরের তাপমাত্রা কত জানেন? কেবিনের চেয়ে আশি-নব্বই ডিগ্রী নিচে।'

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল কিছু যাত্রীর মুখ থেকে। চিন্তিত দেখাল কোঁকড়াচুলকে। ব্যারির হাত থেকে পারকা আর ফারের প্যান্ট তুলে নিল সে।

যাত্রীদের ভার ব্যারির ওপর দিয়ে ডাক্তারকে নিয়ে রেডিওম্যানকে দেখতে চলল রানা।

আহত রেডিওম্যানের পাশে বসে রয়েছে এখনও স্টুয়ার্ডেস। ধরে আস্তে করে ওকে দাঁড় করিয়ে দিল রানা। বাধা দিল না মেয়েটা। বোবা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে আছে। চোখের তারায় আতঙ্ক। থরথর করে কাঁপছে, বরফের মত ঠাণ্ডা দুই হাত।

'আত্মহত্যা করবেন নাকি?' কঠিন শোনাল রানার কণ্ঠ। 'আপনার কোট, টুপি, এসব কোথায়?'

'অ্যাঁ...আছে। ঠিক আছে, পরে আসছি,' নিষ্প্রাণ কণ্ঠ। রওনা দিল মেয়েটা। প্যান্ট্রিতে রয়েছে ওর কাপড়চোপড়।

'ডাক্তার সাহেব, একে নিয়ে যেতে হবে কেবিনে,' বলল রানা। 'দেখুন তো স্ট্রেচারে করে নেয়া সম্ভব কিনা।'

বসে পড়ে রেডিওম্যানকে পরীক্ষা করলেন ব্রাউন। রানার দিকে চেয়ে বললেন, 'নিতে তো হবেই, তবে ঝুঁকি অনেক।'

'এখানে থাকলেও তো মরবে।'

ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন ডাক্তার। বেরিয়ে এসে কন্ট্রোল কেবিনের ভাঙা জানালার কাছে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, 'কেভিন, একটা স্ট্রেচার।'

স্লেজের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে পোর্টার। ভাঁজ করা স্ট্রেচারটা তুলে বাড়িয়ে ধরল ওপর দিকে। জানালা দিয়ে হাত বের করে ওটা নিলেন ডাক্তার। ফিরে এলেন আবার রেডিওরুমে।

ডিম্বাকৃতি দরজাটা খোলা গেল না কিছুতেই। ফ্রেমটা বেঁকে গেছে, আটকে গেছে দরজা। ভাঙা জানালা দিয়েই বাইরে বেরোতে হবে সবাইকে। আহত লোকটাকেও বের করতে হবে ওই পথেই। কাজটা ভীষণ কঠিন।

ডাক্তারের হাত থেকে স্ট্রেচারটা নিয়ে ভাঁজ খুলে মেঝেতে রাখল রানা। সে আর ডাক্তার মিলে ধরাধরি করে তুলল ওতে রেডিওম্যানকে।

এই সময় ফিরে এল স্টুয়ার্ডেস। কোট পরে এসেছে। কিন্তু কাঁপুনি সামান্যতম বন্ধ হয়নি। সেদিকে একবার তাকিয়ে উঠে গেল রানা। কন্ট্রোল কেবিনে এখনও গরম কাপড় বিতরণ শেষ করেনি ব্যারি। তার কাছ থেকে একটা পারকা আর বল্গা হরিণের চামড়ায় তৈরি প্যান্ট চেয়ে নিল রানা। বলল, 'কাজ শেষ করে জলদি এসো। রেডিওরুমে আছি আমরা।'

ফিরে এসে গরম কাপড়গুলো স্টুয়ার্ডেসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল রানা, 'নিন, এগুলো পরে ফেলুন।'

ইতস্তত করতে লাগল মেয়েটা।

'কি হলো, পরে ফেলুন। জমে যাবেন তো।'

'আমি···আমি···মানে যাত্রীদের দেখা উচিত আমার।'

'অনেক দেরিতে ভাবছেন না কথাটা?'

'জানি···কিন্তু ওকে···' রেডিওম্যানকে দেখিয়ে বলল স্টুয়ার্ডেস, 'ওকে ফেলে যেতে পারিনি। ও···ও কি মরে গেছে?'

'না। তবে অবস্থা খুবই খারাপ।'

কথা বলতে বলতেই স্ট্রেচারের ফিতেগুলো দিয়ে রেডিওম্যানকে বেঁধে ফেলল রানা। ঝাঁকুনি থেকে বাঁচানোর জন্যে ফারের শার্টের একটা প্যাড বানিয়ে মাথার নিচে ঢুকিয়ে দিল। কম্বল দিয়ে ঢেকে দিল অজ্ঞান লোকটার দেহ।

'একে একটা কেবিনে নিয়ে যাব আমরা,' স্টুয়ার্ডেসকে বলল রানা। 'নিচে স্লেজ আছে। আপনারও জায়গা হবে।'

'কিন্তু···যাত্রীরা···'

'ওদের চাইতে তো এই লোকটার দিকেই নজর বেশি আপনার,' বলে উঠলেন ডাক্তার। 'এতক্ষণ যখন ভাবেননি, যাত্রীদের কথা এখন আর আপনার ভাবতে হবে না। তাছাড়া ওরাও যাচ্ছে আমাদের সঙ্গে।'

গাল লাল হয়ে উঠল মেয়েটার, কিন্তু আর কিছুই বলল না।

ব্যারি এখনও আসছে না। আবার কেবিনে এসে ঢুকল রানা। কাজ শেষ করেছে ব্যারি। বেরোনোর জন্যে দরজার দিকে এগিয়ে আসছে। সরে ওকে বেরোনোর জায়গা করে দিল রানা। কেবিনে টিমটিমে আলোর জ্যোতি কমে গেছে। ফুরিয়ে এসেছে ব্যাটারি। যাত্রীদের উদ্দেশে বলল রানা, 'রেডিওম্যান আর স্টুয়ার্ডেস আমাদের সঙ্গে কেবিনে যাচ্ছে। স্লেজে যাবে ওরা। আরও একজনের জায়গা হবে স্লেজে···'

'আমি যাব তাহলে,' উঠে দাঁড়াল পাকাচুল।

'স্লেজে আপনার জায়গা হবে না, হেঁটে যেতে হবে। আহত এবং মেয়েরা ছাড়া হাঁটতে হবে সবাইকেই।'

ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল পাকাচুল।

'বসছেন কেন? যাবেন না?' পাকাচুলের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। কলার-বোন ভাঙা মেয়েটিকে বলল, 'আপনি পরের ট্রিপে যাবেন। ব্যান্ডেজ বাঁধাছাঁদা বাকি আছে···,' অন্য দুই মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আপনাদেরও একজন

থাকুন। একে সাহায্য করতে হবে।'

'কি সাহায্য?' জানতে চাইল মিংককোট পরা মহিলা। পোশাকের সঙ্গে তাল রেখে কণ্ঠস্বরটাকেও দামী করে তোলার চেষ্টা করছে, 'কি হয়েছে ওর?'

'কলার-বোন ভেঙে গেছে।'

'তাই নাকি?' বললেন বয়স্কা মহিলা। কণ্ঠে উৎকণ্ঠা ঝরছে, উঠে দাঁড়ালেন। 'এজন্যেই বুঝি মুখটা মলিন ওর! তা এতক্ষণ বলেননি কেন?'

মহিলার কথার ধরনে হেসে ফেলল রানা। 'এতক্ষণ সময় হয়নি বলেই বলিনি··· সে যাককে, কে থাকছেন বলুন?' মিংককোটের বয়েস কম। মনে মনে তাকেই পছন্দ করে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি?'

অসম্ভব অবাস্তব একটা অনুরোধ করে ফেলেছে যেন রানা, এমনিভাবে তার দিকে তাকাল মিংককোট।

মিংককোটের মুখ দেখেই ব্যাপারটা আঁচ করে নিলেন বয়স্কা মহিলা। বললেন, 'আমি থাকছি। মেয়েটাকে সাহায্য করতে পারলে খুশিই হব।'

'আপনি···' ইতস্তত করছে রানা।

'কেন? বেশি বুড়ি হয়ে গেছি নাকি?'

'না না, কি যে বলেন···' অপ্রতিভ দেখাল রানাকে। মহিলা তার মনের কথা জেনে ফেলেছেন। 'বুড়ো হতে এখনও অনেক দেরি আছে আপনার।'

'চালাক লোক আপনি, এবং মিথ্যুক,' মহিলার সারা মুখে হাসি চিকচিক করছে। 'আসুন, দেরি করে লাভ নেই। কি করতে হবে আমাকে, বলুন।'

'ওকে এখানে আলোর কাছে নিয়ে এসে কোটটা খুলতে হবে।'

ধরে ধরে এনে সামনের একটা আসনে বসিয়ে দেয়া হলো মেয়েটাকে।

এই সময় দরজা খুলে উঁকি দিলেন ডাক্তার। ডেকে বললেন, 'মিস্টার রানা, রেডিওম্যান আর স্টুয়ার্ডেসকে নামানো হয়েছে। আর কে কে যাবেন?'

যাত্রীরা উঠে দাঁড়াল। মিংককোটও উঠল। স্লেজে জায়গা হয়ে যাবে তার।

একে একে বেরিয়ে গেল যাত্রীরা। বয়স্কা মহিলা আর কলার-বোন ভাঙা মেয়েটা রয়ে গেল। রানাকে বললেন ডাক্তার, 'ব্যারি আর কেভিনকে পাঠিয়ে দেব গিয়েই,' বেরিয়ে গিয়ে পেছনে দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি।

আরও বেড়েছে বাতাসের বেগ। লক্ষ-কোটি সুচের মত ছুটোছুটি করছে বরফের কুচি। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। হাড় ভেদ করে মজ্জায় কামড় বসাতে চাইছে। কুকুরগুলো পর্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছে ঠাণ্ডায়। মাঝে মাঝেই আর্তনাদের মত করে চেঁচিয়ে উঠছে সাধারণ তিনটে কুকুর, আর নেকড়ের মত হিংস্র ডাক ছাড়ছে রোল্টা। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে সে। শীতের তাড়না থেকে বাঁচার জন্যে গায়ের জোরে টানছে। তার সঙ্গে তাল রেখে ছুটতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে অন্য কুকুরগুলো।

প্রবল তুষার প্রবাহকে পেছনে রেখে প্রায় ছুটেই চলেছে ওরা ক্যাম্পের দিকে। আগে আগে এগিয়ে যাচ্ছে স্লেজটা। বিমানের চাকার দাগ, বাঁশের টুকরো আর হোমিং স্পূলের নিশানা ধরে সঙ্গীদের নিয়ে নির্ভুল লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে রোল্টা।

পাশে টর্চ হাতে চলেছে ব্যারি। মাঝখানে যাত্রীদের সারি। সবার পেছনে পোর্টার আর ব্রাউন। দু'জনের হাতেই টর্চ। কঠিন বরফের সঙ্গে স্লেজের তলার ইস্পাতের মসৃণ পাতের ঘষা খাবার হিসহিস শব্দ উঠছে। মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে স্লেজ। কোন অ্যাম্বুলেন্সের সাধ্যও নেই একটা মারাত্মক আহত মানুষকে এত নিরাপদে বয়ে নিয়ে যায়। ক্ষতি যা করছে, তা তুষার আর ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা।

চেনা পথ। কেবিনে পৌঁছতে বিশ মিনিটের বেশি লাগল না। বয়ে এনে স্ট্রেচারসুদ্ধ রেডিওম্যানের দেহটা কেবিনের মেঝেতে নামিয়ে রাখল পোর্টার আর কোঁকড়াচুল যাত্রী। স্টুয়ার্ডেস রইল পাশে পাশে। কোলম্যান ল্যাম্পটা জ্বালাল ব্যারি। চুলো ধরাল।

চুলোর পাশে পাতা হলো একটা কোলাপসিবল কট। স্ট্রেচার থেকে রেডিওম্যানকে তুলে নিয়ে শুইয়ে দেয়া হলো কটে। নিজের স্লিপিং ব্যাগটা নিয়ে এলেন ডাক্তার। ওটার ভেতরে ডজনখানেক নরম গদি ঢোকালেন। বিশেষ কায়দায় তৈরি এই গদিগুলোতে এক ধরনের কেমিক্যাল মাখানো রয়েছে। মানুষের দেহের তাপ আর আর্দ্রতার সংস্পর্শে এলেই গরম হয়ে ওঠে এই গদি। রেডিওম্যানকে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢোকানো হলো। একটা কম্বল পাকিয়ে রোল করে রেডিওম্যানের ঘাড়ের নিচে ঠেলে দিলেন ডাক্তার। ঠাণ্ডা ঢোকার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেল। সাধারণ অপারেশনের সামান্য কিছু যন্ত্রপাতি আছে স্টকে, কিন্তু সেগুলো পরে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নিলেন ডাক্তার। আগে গরম হয়ে উঠুক লোকটার দেহ, তারপর দেখা যাবে কি করা যায়।

স্টুয়ার্ডেসকে কফি তৈরির সরঞ্জাম দেখিয়ে দিলেন ডাক্তার। কাজে লেগে গেল মেয়েটা।

দেয়ালে ঝোলানো একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখ দেখছে কোঁকড়াচুল। অবাক হয়ে নিজের চোয়ালে ফ্রস্টবাইটের চিহ্ন দেখছে। একটা কানের ওপর হাত বুলাচ্ছে। কোন সাড়া নেই কানটাতে। জমে গেছে।

কেবিনের ভেতরটা আর যন্ত্রপাতিগুলো চেয়ে চেয়ে দেখছে যাত্রীরা। চোখে বিস্ময়।

যাত্রীরা সব বেরিয়ে যেতেই লেনিনগ্রাদ থেকে আনা ব্যান্ডেজের রোল বের করল রানা।

'কি করবেন?' জানতে চাইলেন বয়স্কা মহিলা।

'কাঁধে-পিঠে ব্যান্ডেজ জড়াব আপাতত। বাঁ হাতটা ঝোলাব স্লিঙে। ব্যথা কমানোর ইঞ্জেকশনও দিতে হবে একটা। কেবিনে গেলে তখন ডাক্তার ব্রাউনের দায়িত্বে চলে যাবে রোগী।' মেয়েটার রেনকোট দেখিয়ে বলল, 'নিন, কোটটা খুলে দিন ওর।'

'কিন্তু শীত...'

'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

কোট খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করলেন বয়স্কা, 'তোমার নামটা কি, খুকি?'

'মার্থা,' খুবই ব্যথা পাচ্ছে মেয়েটা। কণ্ঠস্বর আর চেহারাই বলে দিচ্ছে।

'বাহ্, বেশ চমৎকার নাম তো! কথার টানে তো মনে হচ্ছে ইংরেজ কিংবা আমেরিকান নও।'

'ঠিকই ধরেছেন, ম্যাডাম। আমার দেশ জার্মানী।'

'ওসব ম্যাডাম-ফ্যাডামের দরকার নেই। তা ইংরেজী তো ভালই বলতে পারো। জার্মানী···কোথায়, ব্যাভেরিয়ার মেয়ে নাকি গো তুমি?'

'হ্যাঁ,' হাসছে মেয়েটা। কথা বলতে বলতে নিপুণ হাতে কাপড় খুলছেন বয়স্কা। দ্রুত অন্যমনস্ক করে নিয়েছেন মার্থাকে। মার্থা বলল, 'মিউনিখ। আপনি চেনেন?'

'চিনি না মানে! ভাল করেই চিনি।' আত্মপ্রসাদের সুর মহিলার কণ্ঠে। 'তা বয়েস তো তেমন নয় গো তোমার।'

'সতেরো। কমই বা কি?'

'সতেরো চমৎকার বয়স,' দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন মহিলা। 'এই বয়েসটা একদিন আমারও ছিল, খুকি। কি সময়! পৃথিবীটাই তখন অন্য রকম লাগে। চোখে-মনে রঙ··· দুনিয়াটা এক রঙিন স্বপ্ন···' স্মৃতিচারণ করতে করতে হঠাৎ বাস্তবে ফিরে এলেন মহিলা, 'জানো, তখন আটলান্টিক পাড়ি দেবার মত ভাল প্লেন ছিল না।'

'আপনার সতেরো বছর বয়েস···। ভাল প্লেন থাকবে কি করে?' হাসছে রানা। দারুণ মহিলা। কয়েকটা কথায়ই অপরিচিত কাউকে আপন করে নেবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা রয়েছে তাঁর মাঝে।

'দেখুন,' ধমক মারলেন মহিলা। কিন্তু চোখ দুটো হাসছে, 'অপমান করে কথা বলবেন না।'

'অপমান করব আপনাকে!' মহিলাকে চিনে ফেলেছে রানা এতক্ষণে। 'এক সময়ে বড় বড় কাউন্ট-প্রিন্সেরা যাঁর সান্নিধ্য পেলে নিজেদের ধন্য মনে করত, তাঁকে অপমান করব আমি!'

'আমাকে চেনেন তাহলে?' খুশি হয়ে উঠেছেন মহিলা।

'সুসান গিলবার্টের নাম জানে না, চেহারা চেনে না, সঙ্গীত রসিক এমন লোক আছে নাকি দুনিয়ায়?' মার্থার দিকে তাকাল রানা। বিস্মিত দৃষ্টি ফুটেছে আহত মেয়েটার চোখে। 'ওই দেখুন, মার্থাও আপনার নাম শুনেছে। গান যারা শোনে, থিয়েটার যারা দেখে, তারা তো বটেই, ইয়োরোপের অনাথ আশ্রমগুলো পর্যন্ত এক ডাকে চেনে আপনাকে, শ্রদ্ধা জানায়। গরীব-দুঃখীরা দেবী মনে করে···'

'এত বাড়িয়ে কথা বলতে পারেন না আপনি···' রানার উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় লজ্জিত হাসি হাসলেন সুসান। মার্থার কোট খোলা হয়ে গেছে। সেটা পাশের সীটে রাখতে রাখতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আমার চেহারা চিনলেন কি করে?'

'অবান্তর প্রশ্ন,' এগিয়ে গিয়ে মার্থার ফ্রকের গলার কাছের কয়েকটা বোতাম খুলে দিল রানা। লজ্জায় জড়োসড়ো হয়ে গেল মার্থা।

'আরে, বোকা মেয়ে! অত লজ্জার কি আছে শুনি?' ধমকে উঠলেন সুসান। 'হাড় ভেঙেছে, ব্যান্ডেজ বাঁধতে হবে না? ডাক্তারের কাছে লজ্জা করলে রোগ

সারবে কি করে?'

'আমি কিন্তু ডাক্তার নই,' ব্যান্ডেজের রোল খুলতে খুলতে বলল রানা।

'ওই হলো। ডাক্তারী কাজ যে করবে, সে-ই ডাক্তার। পাস করা হলো কি হলো না, তাতে কিছু যায় আসে না···সে যাক, যা বলছিলাম, তা আমাকে চিনলেন কি করে, বললেন না?'

'গত মাসে লাইফ পত্রিকায় একটা ছবি দেখেছি আপনার, মিস গিলবার্ট।'

'বন্ধুদের কাছে আমি শুধু সুসান।'

'আমি তো আপনার বন্ধু নই। মাত্র পরিচয় হলো···

'তুমি বাপু বড় বেশি কথা বলো। লাইফে বেরোনো ওই ছবি দেখে আসল আমাকে চেনা কি চাট্টিখানি কথা! ব্যাটা আর্টিস্টরা তুলির পোঁচ মেরে বয়েস বিশ বছর কমিয়ে দিয়েছে ছবিতে। সেই ছবি দেখে আসল লোকটাকে চিনতে পারা কি কম কথা? কত লোকেই তো কত ছবি দেখে, তারপর ভুলে যায়। তুমি তো মনে রেখেছ। তার মানে তুমি আমার বন্ধু।'

'আসলে আমার স্মৃতিশক্তি···'

'চুলোয় যাক তোমার স্মৃতিশক্তি,' ধমকে উঠলেন সুসান। 'আমাকে ভাল লেগেছে, স্বীকার করতে লজ্জা কেন? বুড়ি হয়ে গেছি বলে? তা, তোমাকে কিন্তু আমি শুধু রানা বলেই ডাকব, মিস্টার ফিস্টার সব বাদ।'

'অবশ্যই ডাকবেন।'

'মনটা তোমার দারুণ ভাল হে, ছোকরা, বুঝে ফেলেছি। মার্থার মত বয়েস যদি হত আমার এখন, হয়তো তোমার প্রেমেই পড়ে যেতাম!' দিলখোলা হাসি হাসলেন সুসান। 'তা কদ্দূর হলো তোমার কাজ?'

'হ্যাঁ, হয়ে গেছে,' ব্যান্ডেজ বাঁধা, ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ করেছে রানা। ফারের দুটো পোশাক সুসানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এই শার্ট-প্যান্ট পরিয়ে দিন ওকে। পরে স্লিং বাঁধব।'

ঠিক এই সময় কেবিনের দরজা খুলে গেল। ফিরে এসেছে ব্যারি আর পোর্টার।

হাড় ভাঙা মার্থাকে জানালা দিয়ে বাইরে বের করতে অনেক বেগ পেতে হলো। ব্যারি না থাকলে ওকে বের করাটাই এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। রানা আর পোর্টার ধরাধরি করে জানালা দিয়ে বাইরে ঠেলে দিল মার্থাকে। নিচে দাঁড়িয়ে হাত বাড়িয়ে তাকে ধরল ব্যারি, পাঁজাকোলা করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল স্লেজে, মেয়েটা যেন হালকা একটা পুতুল। এস্কিমোর ছয় ফুটের ওপর লম্বা বিশাল দেহটার দিকে তাকিয়ে মনে মনে প্রশংসা করল রানা। সত্যিকারের কাজের লোক।

মার্থার মত একই কায়দায় নামিয়ে দেয়া হলো সুসানকেও। তবে নিচে নেমে হেঁটে গিয়েই স্লেজে উঠলেন তিনি।

পোর্টার নেমে গেল। রানাকে নামতে ডাকল ব্যারি।

'তোমরা যাও, রিক,' জানালা দিয়ে মুখ বের করে বলল রানা। 'আমি পরে

আসছি। একটু কাজ আছে।'

জানালার দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইল ব্যারি দীর্ঘ এক মুহূর্ত, রানার চেহারা দেখতে পাচ্ছে না অন্ধকারে। তারপর আর কোন কথা না বলে ঘুরে দাঁড়াল।

'আর হ্যাঁ, ব্যারি,' ডাকল আবার রানা। ব্যারি ফিরে চাইতেই বলল, 'কেবিনে কি করে পৌঁছব, বললে না? কোন চিহ্ন আছে নিশ্চয়?'

'প্লেনের চাকার দাগ ধরে ধরে এগিয়ে যাবে। তারপর কেইন, হোমিং স্পূল, এরিয়ালের খুঁটি। শেষ খুঁটিটার কয়েক গজ পরেই কেবিন। তুষারে ঢেকে না গেলে স্লেজের দাগ ধরেও যেতে পারবে। চলি।'

মনিবের নির্দেশ পেয়ে ছুটতে শুরু করল রোল্টা, তার সাথে সাথে আর সব কুকুরগুলোও।

চার

কেবিনে ফিরে আসতে মোটেই বেগ পেতে হলো না রানার। বরফের দেশের এই সব কাঠের তৈরি ঘর সম্পর্কে ধারণা আছে তার। দরজাটা খুঁজে পেল সহজেই।

ভেতরে ঢুকে পেছনে দরজাটা নামিয়ে দিয়ে ঘুরল রানা। সিঁড়িতে দাঁড়িয়েই চোখ বুলাল একবার ঘরের ভেতরে। থমকে গেল দৃষ্টিটা ট্রান্সমিটারের ওপর। চোখে না পড়ার মত জিনিস নয় ওটা।

ঘরের একপাশে চুলোর কাছে নিচু কটে কম্বলে ঢাকা একজন মানুষ। প্লেনের রেডিওম্যান, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। রেডিওম্যানের একপাশে চুলোটাকে ঘিরে অর্ধবৃত্তাকারে ছড়িয়ে বসেছে সব ক'জন যাত্রী। ওদের কাছ থেকে কিছুটা দূরে গুম হয়ে বসে আছেন ডাক্তার ব্রাউন। কেবিনের দ্বিতীয় দরজাটার কাছে বসে আছে পোর্টার আর ব্যারি। চেয়ারের বিকল্প হিসেবে খালি প্যাকিং বাক্সের ওপর বসেছে সবাই।

কে কোথায় বসল এসব নয়, আসল ব্যাপার রেডিও ট্রান্সমিটার। যাত্রীদের, বিশেষ করে স্টুয়ার্ডেসের কাছ থেকে একটু দূরে টেবিলসুদ্ধ উল্টে পড়ে আছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে বড়সড় ভারী আর সি এ রেডিও ট্রান্সমিটারটা। প্লেনেরটাও গেছে, এটাও শেষ। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগের আর কোন উপায় থাকল না।

নীরব দীর্ঘ কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। ঘরের ভেতরে কোলম্যান ল্যাম্পের হিসহিসানি। বাইরে, মাথার ওপরে অ্যানিমোমিটার কাপ ঘোরার ধাতব খড়খড় শব্দ ছাপিয়ে গুঙিয়ে উঠছে বাতাস, এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই।

'কি করে ভাঙল এটা, ডাক্তার সাহেব?' কথা বলল রানা। সিঁড়ি থেকে নেমে এসেছে।

'জানি না,' তিক্ত কণ্ঠে বললেন ডাক্তার। প্যাকিং বাক্সের ওপর নড়ে চড়ে

বসলেন। 'অ্যানিমোমিটারের কাপে বরফ জমেছিল। ঘুরছিল না। পরিষ্কার করতে গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি এই সর্বনাশ!'

'কে করল?'

'জিজ্ঞেস করিনি,' বললেন ডাক্তার। 'তবে এদেরই কেউ করেছে, তাছাড়া আর কে? আমরা তো সব বাইরে…'

'আমি…আমারই দোষ,' কেঁদেই ফেলবে যেন স্টুয়ার্ডেস। বিবর্ণ ফ্যাকাসে চেহারা। 'সব দোষ আমার।'

'আপনি!' ভুরু কুঁচকে মেয়েটির দিকে তাকাল রানা। 'আপনি একাজ করেছেন? কিন্তু আপনার তো অজানা থাকার কথা নয়, রেডিও নষ্ট হয়ে গেলে কি বিপদে পড়ব আমরা! ঠিক বলছেন তো?'

'ঠিকই বলছে,' শান্ত কণ্ঠে সাক্ষ্য দিল কপালে আঘাত পাওয়া লোকটা। 'সে সময় আর কেউ ছিল না ওটার কাছে।'

'আপনার হাতে কি হলো?' লোকটার রক্তাক্ত হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'উল্টে পড়ে যাচ্ছিল রেডিওটা, দেখেই ধরতে গিয়েছিলাম,' ম্লান হাসল লোকটা। 'কিন্তু এত ভীষণ ভারী যন্ত্র, বুঝতে পারিনি।'

'চেষ্টা তাহলে করেছেন! ধন্যবাদ!' মুখ বিকৃত করলেন ডাক্তার। কথায় স্পষ্ট রাগ। 'তা আঙুল টাঙুল ভাঙেনি তো?'

'আমাকে মাফ করে দেবেন,' কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল স্টুয়ার্ডেস। 'জেসের কাছ থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম…'

'কে?' জানতে চাইল রানা।

'জেস ওয়েন্স, সেকেন্ড অফিসার…'

'সেকেন্ড অফিসার?' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'আমি তো ভেবেছিলাম রেডিওম্যান।'

'ভুল ভেবেছেন। জেস আসলে পাইলট। তিনজন পাইলট ছিল প্লেনে, কোন রেডিওম্যান ছিল না।'

'অ-অ। তাহলে রেস্টরুমে মরে পড়ে আছে, ও কে? নেভিগেটর?'

'নেভিগেটরও ছিল না। ও রিচার্ড হার্বার্টসন, ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ার ছিল।'

'তা নেভিগেশনের কাজ না হয় পাইলটই করেছে, বুঝলাম, কিন্তু রেডিও?'

'জেস খুব ভাল ওয়্যারলেস অপারেটর।'

'বুঝলাম। কিন্তু এই রেডিওটা ভাঙলেন কি করে বলুন তো?'

'টেবিলটার কাছেই বসে ছিলাম। উঠতে গিয়ে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খাই, বেশি জোরে না অবশ্য। এতেই কি করে যে রেডিওসুদ্ধ টেবিলটা হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল!' মেয়েটার গলার স্বর অনিশ্চিত।

'হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল?' বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। 'দেড়শো পাউন্ড ওজনের একটা জিনিস!'

'আমার ধাক্কা লাগতেই খুব সম্ভব পায়াগুলো বসে গেছে।'

'পায়া নেই টেবিলটার। হিঞ্জে বসানো ছিল।'

'তাহলে হিঞ্জই বসে গেছে।'

পোর্টারের দিকে তাকাল রানা। রেডিও আর রেডিও রাখার টেবিলের ব্যাপারে পোর্টারই ভাল জানে। 'এটা সম্ভব, পোর্টার?'

'অসম্ভব।' দৃঢ়কণ্ঠে বলল পোর্টার।

আবার নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল ঘরটায়। কেমন একটা চাপা অস্বস্তি। আর কাউকে কিছু প্রশ্ন করে কোন লাভ নেই, রেডিওটা ভেঙে গেছে, এটাই চরম সত্য।

'হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে আর কি হবে?' রাগ এখনও কমেনি ডাক্তারের, কপালে-হাতে আঘাত পাওয়া লোকটাকে ডাকলেন। 'এদিকে আসুন, কাটাগুলো দেখি। ভেবে লাভ নেই, যা হবার হয়েছে, আসুন।' পোর্টারের দিকে ফিরে বললেন, 'কেভিন, কফি বানাও তো। বেশি করে বানিয়ো। আর হ্যাঁ, ব্র্যান্ডিও এনো এক বোতল।'

ডাক্তারের মত অত সহজভাবে ব্যাপারটাকে নিতে পারল না রানা। প্লেনে অনেক ব্যাপার দেখে এসেছে সে। মারাত্মক ব্যাপার। প্লেনের রেডিওটাও গেছে, এখানে এই রেডিওটাও ভাঙল। বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ রাখতে চাইছে নিশ্চয় কেউ।

তুলোয় আয়োডিন মাখিয়ে লোকটার কপালের ক্ষত পরিষ্কার করতে লাগলেন ডাক্তার। গভীরভাবেই কেটেছে। সে তুলনায় রক্তপাত অবশ্য কম। ঠাণ্ডার জন্যে। ব্যথা পাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সামান্যতম উ-আ করল না লোকটা। খুবই সহ্যশক্তি।

কেবিনের ভেতরের চাপা অস্বস্তি ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। বুঝে, রানার কাছে এগিয়ে এল কোঁকড়াচুল যুবক। কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল, 'দেখুন, আপনারা কে জানি না। তবে আমাদের জন্যে যা করেছেন, সেজন্যে সত্যিই কৃতজ্ঞ আমরা। আপনারা সময়মত হাজির না হলে মারাই যেতাম। ঘরের যন্ত্রপাতি দেখেই অনুমান করতে পারছি, কোন ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে এখানে। ওয়্যারলেস একটা অতি প্রয়োজনীয় জিনিস আপনাদের জন্যে, বুঝতে পারছি। ঠিক না?'

'ঠিক,' যুবকের দিকে তাকিয়ে বলল রানা।

প্লেনে তাড়াহুড়োয় খেয়াল করেনি, এখন ভাল করে দেখে বুঝল রানা, অগ্রাহ্য করার মত লোক নয় যুবক। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুই চোখ, আত্মপ্রত্যয়ে দৃঢ়।

'আরও কিছু বলবেন মনে হচ্ছে?' রানার প্রশ্ন।

'হ্যাঁ। বলছিলাম কি, একটা ভুল বোঝাবুঝি হতে যাচ্ছে আমাদের মাঝে। আগেই সংশোধন করে ফেলা দরকার। স্টুয়ার্ডেসের ওপর খামোকা রাগ করছেন আপনারা। রেডিওটা দামী, ঠিকই, কিন্তু আর পাওয়া যাবে না এমন তো নয়। কথা দিচ্ছি, আগামী এক সপ্তাহ—বড়জোর দশদিনের মধ্যেই বদলে দেয়া হবে ওটা। নতুন একটা সেট পেয়ে যাবেন।'

'আপনার দয়া,' আহত লোকটার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে শুকনো

গলায় বললেন ডাক্তার। 'কিন্তু ওই দশদিন বেঁচে থাকতে পারলে তো!'

'বেঁচে থাকব না—মানে?' ডাক্তারের দিকে ফিরল যুবক।

'মানে, রেডিও ছাড়া এখানে আমাদের টিকে থাকা অসম্ভব। কোথায় রয়েছেন, ধারণা আছে?'

'অবশ্যই,' কাঁধ সামান্য ঝাঁকাল যুবক। 'কাছাকাছি ওষুধের দোকানটা ঠিক কতদূরে বলতে পারব না অবশ্য। রাস্তার মোড়ে…'

'এখন কোথায় আছি, আমি জানিয়েছি ওঁদের,' বলল স্টুয়ার্ডেস। 'একটু আগে জানতে চাইছিলেন ওঁরা। ঝড়ের মাঝে রেকিয়াভিকের রানওয়েটা ক্যাপ্টেন হ্যারিসন ঠিক চিনতে পারেননি বোধহয়। আমরা ল্যাঙ্গোকালে আছি, না?' ডাক্তারের মুখের ভাবে এমন কিছু দেখল, শুধরে নেবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল মেয়েটা, 'তাহলে হফসোকাল? আইসল্যান্ডে এই দুটো স্নোফিল্ডই তো আছে?'

'আইসল্যান্ড?' মজা করার লোভটুকু সামলাতে পারলেন না ডাক্তার। 'আসলে কোথায় রয়েছেন, শুনতে চান? গ্রীনল্যান্ডে, একটা আইস ক্যাপে।'

যাত্রীদের চোখগুলো একসঙ্গে ঘুরে গেল ডাক্তারের দিকে। সুসান গিলবার্টও জীবনে কখনও দর্শকদের এমনভাবে চমকে দিতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ। হতভম্ব হয়ে গেছে যাত্রীরা। তাদের চোখে অবিশ্বাস।

'কক্ষনো না। এ হতেই পারে না।' চেঁচিয়েই উঠল স্টুয়ার্ডেস। 'লন্ডন থেকে রেকিয়াভিকে উড়ে যাচ্ছিলাম আমরা, সেখান থেকে গ্যান্ডার যেতাম। গ্রীনল্যান্ডের ধারেকাছেও না ওই রুট। অটোম্যাটিক পাইলট রয়েছে প্লেনে, রেডিও বীম আছে—প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বেসের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করে চেকিঙের ব্যবস্থা আছে—না, এটা অসম্ভব! আমি বিশ্বাস করি না,' থর থর করে কাঁপছে মেয়েটা। শ্রান্তিতে না ঠাণ্ডায়, বোঝা যাচ্ছে না।

এগিয়ে গিয়ে স্টুয়ার্ডেসের কাঁধে হাত রাখল কোঁকড়াচুল। চমকে উঠল মেয়েটা। বিকৃত চেহারা। ব্যথা পাচ্ছে, সম্ভবত পিঠে, অনুমান করল রানা।

পোর্টারের দিকে তাকালেন ব্রাউন। বললেন, 'কেভিন, আমরা ঠিক কোথায় আছি, জানিয়ে দাও তো ওদের।'

মগে কফি ঢালছিল পোর্টার, চোখ তুলে তাকাল। 'ল্যাটিচিউড সেভেনটি টু পয়েন্ট ফোর ডিগ্রী, লংগিচিউড ফরটি পয়েন্ট ওয়ান ডিগ্রী।' শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠস্বর। 'সবচেয়ে কাছের লোকবসতি এখান থেকে তিনশো মাইল দূরে। আর্কটিক সার্কেলের চারশো মাইল উত্তরে আছি। রেকিয়াভিক এখান থেকে আটশো মাইল, গ্রীনল্যান্ডের দক্ষিণের কেপ ফেয়ারওয়েল হাজার মাইল, অর্থাৎ উত্তর মেরুর কাছাকাছি রয়েছি আমরা। কারও যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয়, বাইরে বেরিয়ে যে কোনদিকে খানিকটা হেঁটে আসার পরামর্শ দিচ্ছি।'

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল। হাত তুলে থামালেন ওদের ডাক্তার, লোকগুলোকে চমকে দিতে পেরে মজা পাচ্ছেন। 'যা হবার হয়ে গেছে, ওসব নিয়ে আপাতত ভাবনা-চিন্তা করে লাভ নেই। আসুন, কফি খেয়ে নিন সবাই। ব্র্যান্ডি মেশানো আছে।'

'ব্র্যান্ডি?' রঙিন পেন্সিলে যত্ন করে আঁকা কৃত্রিম ভুরু কুঁচকাল মিংককোট। 'চমৎকার! কিন্তু এখন ব্র্যান্ডি খাওয়া কি উচিত হবে?'

'কেন হবে না?'

'খেলেই তো ঘামতে শুরু করব। ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।'

'লাগবে না। গরম পোশাক তো পরেই আছেন।'

পোশাকের কথায় নিজের কাপড়চোপড় আর অন্যান্য জিনিসের কথা মনে পড়ে গেল মহিলার। 'আর হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম আমাদের জিনিসপত্র সবই তো প্লেনে রয়ে গেছে। কাউকে পাঠিয়ে দিন না, নিয়ে আসুক ওগুলো।'

'দেখুন, এটা আপনার ডরচেস্টার নয়। বাইরে সাংঘাতিক ঝড় হচ্ছে। এই রাতে আপনার জিনিসপত্রের জন্যে কেউ যেতে পারবে না। সকালে দেখব কিছু করা যায় কিনা।'

'কিন্তু দামী জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে...।'

'এত তাড়া থাকলে নিজেই নিয়ে আসুন না। দেখবেন চেষ্টা করে?'

ওদের কথোপকথন উপভোগ করছে রানা।

'আপনার আবার কি হলো?' রেভারেন্ডের দিকে চোখ পড়তে বললেন ডাক্তার। 'খাচ্ছেন না কেন?'

একটা প্যাকিং বাক্সের এক প্রান্তে বসেছে পাদ্রী। অন্য প্রান্তে রাখা কফির মগটার দিকে তাকাচ্ছে আর উসখুস করছে।

'আমার না খাওয়াই বোধহয় ভাল,' বলল রেভারেন্ড। 'বুঝলেন না, মানে আমাদের ধর্মে...'

'জান বাঁচানো ফরজ। ওষুধ মনে করে খেয়ে ফেলুন,' বিরক্ত কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

'ঠিক আছে, ডাক্তার মানুষ, বলছেন যখন...' ভাব দেখাল, যেন বিষের মগ তুলে নিচ্ছে রেভারেন্ড। কিন্তু চুমুক দেবার ধরন দেখে অনুমান করতে কষ্ট হয় না, রীতিমত উপভোগ করছে সে ব্র্যান্ডি মেশানো কফি।

ব্যাপার দেখে আর থাকতে পারলেন না অভিনেত্রী, ফিক করে হেসে ফেললেন। হাসিটা সংক্রামিত হলো রানা এবং আরও অনেকের মাঝে। কিন্তু দেখেও না দেখার ভান করল রেভারেন্ড।

সবাই উপভোগ করছে কফি। আস্তে আস্তে মগে চুমুক দিচ্ছে স্টুয়ার্ডেস, মাঝেমধ্যে চোখ তুলে তাকাচ্ছে নিচু কটে শুয়ে থাকা অজ্ঞান লোকটার দিকে।

কফি শেষ করে উঠে গেলেন ডাক্তার। সেকেন্ড অফিসারকে পরীক্ষা করলেন। নাড়ির গতি এখনও ধীর, তবে শ্বাস প্রশ্বাসের উন্নতি হয়েছে। স্লিপিং ব্যাগের গলার ফাঁক দিয়ে আরও কয়েকটা প্যাড ঠেলে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন ব্রাউন।

একেবারে ডাক্তারের গায়ের কাছে এসে বসল স্টুয়ার্ডেস। 'ও...ওর অবস্থা একটু ভাল?'

'সামান্য। তবে এখনও কোন ভরসা দিতে পারছি না,' চোখ তুলে মেয়েটার দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আপনাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, না? একসঙ্গে বহুবার

উড়েছেন?'

কান খাড়া করল রানা, মেয়েটার উত্তর শুনতে আগ্রহী।

'হ্যাঁ,' এর বেশি আর কিছু বলতে চাইল না মেয়েটা। 'ওর ব্রেন কি...'

'এখনও কিছুই বলা যায় না। তা এখন আপনার পিঠটা দেখান তো।'

'কি... কি দেখাব?'

'পিঠ,' শান্ত কণ্ঠস্বর ডাক্তারের। 'কাঁধের কাছটায় ব্যথা করছে, না?'

'না-না, কিছুই হয়নি আমার। আমি ঠিক আছি,' তাড়াতাড়ি সরে গেল স্টুয়ার্ডেস।

'দেখো, ছেলেমানুষী কোরো না। উনি ডাক্তার,' বলে উঠলেন সুসান গিলবার্ট। কণ্ঠে সহানুভূতি। 'ওঁকে দেখাও...'

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল স্টুয়ার্ডেস।

শ্রাগ করলেন ডাক্তার। জোর করলেন না আর। উঠে আবার গিয়ে আগের জায়গায় বসলেন।

কফির মগে চুমুক দিতে দিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে যাত্রীদের পর্যবেক্ষণ করছে রানা। একদল বিচিত্র মানুষ। কারও সঙ্গেই কারও মিল নেই। একেক জন একেক রকম, স্বভাব-চরিত্র-চেহারায়। কিন্তু সব কজনের ভাগ্য এখন একই সুতোয় বাঁধা।

কেবিনটাকে ভাল করে দেখার সুযোগ পেয়েছে এখন রানা। লম্বা এক চুমুকে মগের তলানিটুকু শেষ করে প্যাকিং বাক্সের পাশে মেঝেতে পাত্রটা নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। ব্রাউনের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল পুরো কেবিনটা।

আসবাব পত্র তেমন কিছুই নেই আর্মচেয়ার, চেয়ার, কার্পেট, বুকশেল্ফ্, বিছানা, জানালা, পর্দা, কিচ্ছু নেই। আঠারো ফুট দীর্ঘ আর চোদ্দ ফুট চওড়া কাঠের একটা গুদাম যেন। মেঝে তৈরি হয়েছে হলুদ পাইন কাঠের তক্তা দিয়ে। দেয়ালের বাইরেটা একই কাঠে তৈরি। ভেতরের দিকে দেয়ালে প্রথমে পুরু করে ছোবড়া বিছানো হয়েছে, তার ওপর আটকে দেয়া হয়েছে মোটা সবুজ অ্যাসবেসটসের পর্দা। তাপ নিরোধক করা হয়েছে এভাবে। ছাতও কাঠের তৈরি। দেয়ালের মত একই কায়দায় ভেতরের দিকে ছোবড়া বিছানো হয়েছে। তবে এখানে অ্যাসবেসটসের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়মের পাত ব্যবহার করা হয়েছে। ছাতের এক জায়গায় স্কাইলাইট। আলো আসার জন্যে। কিন্তু ওই পথে কতটা আলো আসতে পারে সন্দেহ আছে রানার, কারণ, এই মুহূর্তে ভারী হয়ে তুষার জমেছে কাঁচের ওপরে। এই বরফের রাজ্যে তুষার পড়ে প্রায় সারাক্ষণই, প্রায়ই কাঠের মই বেয়ে উঠে গিয়ে কাঁচের বাইরের বরফ পরিষ্কার করতে হয় নিশ্চয়, অনুমান করল রানা।

কেবিনের দু'দিকে দুটো দরজা। একটা দরজা বাইরে বেরোনোর জন্যে। অন্যটা? ব্যারিকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল রানা ওর ওপাশে স্টোররুম। ওখানে খাবার আর কাপড় ছাড়াও রয়েছে গ্যাসোলিন, স্টোভের তেল, ব্যাটারি, রেডিও জেনারেটর, সেইসমোলজিক্যাল এবং গ্লেশিয়াল ইনভেস্টিগেশনের জন্যে

বিস্ফোরক, আর অন্যান্য প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি অনেক জিনিস।

স্টোর রাখার সুড়ঙ্গে ঢুকল রানা। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে এগিয়ে গেল। জিনিসপত্রে বোঝাই। প্রতিটি প্যাকিং বাক্সের গায়ে নিখুঁত করে লেবেল সাঁটানো, যাতে প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুঁজে নিতে মোটেই বেগ পেতে না হয়।

বিশ-পঁচিশ ফুট এগিয়ে হঠাৎ নব্বই ডিগ্রী বেঁকে গেছে সুড়ঙ্গ। এগিয়ে গেছে আরও ফুট দশেক। শেষ মাথায় টয়লেট। কেমন যেন প্রাগৈতিহাসিক মনে হলো রানার কাছে গোটা ব্যবস্থাটা।

ফিরে এল আবার। আঠারো ফুট লম্বা দেয়ালে বসানো সারি সারি বাঙ্কগুলো আগেই দেখেছে। ওগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে থামল ইনস্ট্রুমেন্টস টেবিলটার সামনে। অসংখ্য যন্ত্রপাতি, অনেকগুলোই তার চেনা।

কেবিনটা দেখা শেষ করে আবার ঘুরল রানা। যাত্রীদের দিকে তাকাল। কারও মুখে কথা নেই। থমথমে নীরব পরিবেশ। উত্তেজনার প্রাথমিক ধাক্কাটা চলে যাবার পর এখন ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে পারছে সবাই। কতটা বিপদে পড়েছে, অনুমান করতে কষ্ট হচ্ছে না আর এখন যাত্রীদের।

কোলম্যান ল্যাম্পের হিসহিসানি কেমন যেন একটা ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। মাথার ওপরে হাওয়া যন্ত্রের খড়খড় শব্দ পরিবেশেকে আরও ভারী করে তুলেছে। বাইরে কেবিনের দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ছে বরফ-কুচি মেশানো ঝড়ো বাতাস।

ধীরে ধীরে এসে নিজের প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে পড়ল রানা। ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'পরিচয়ের পালাটা শেষ করা উচিত, ডাক্তার সাহেব।'

'হ্যাঁ,' কফির শূন্য মগটার দিকে তাকালেন ব্রাউন। তারপর ঘরের কোণে বসে থাকা রেডিওম্যানের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরেক মগ করে দিলে মন্দ হয় না, কেভিন।'

'দিচ্ছি, স্যার,' উঠে ব্লো-টর্চের পাশে বসানো কেটলির দিকে এগিয়ে গেল পোর্টার।

'কয়েক দিনের জন্যে আমাদের অতিথি হতে বাধ্য হয়েছেন আপনারা, বুঝতে পারছি,' বক্তৃতার ঢঙে কথা শুরু করলেন ডাক্তার। 'কাজেই আমরা কে কি সবারই জানা থাকলে ভাল। নিজেদের পরিচয়টাই আগে দিয়ে নিই,' কফি বিতরণরত পোর্টারের দিকে আঙুল তুললেন, 'ওর নাম কেভিন পোর্টার, আমাদের রেডিওম্যান।'

ভাঙা রেডিওটার দিকে ইঙ্গিত করে বলল পোর্টার, 'আপাতত বেকার।'

'আর ওই যে, দরজার কাছে বসে আছে,' সুড়ঙ্গ মুখের দিকে দেখিয়ে বললেন ব্রাউন, 'ও রিক ব্যারি। নামটা আগেই শুনেছেন। লেডিস অ্যান্ড জেন্টলমেন, ওর জন্যে এই মুহূর্ত থেকে মনেপ্রাণে দোয়া শুরু করুন আপনারা। সত্যিই যদি বেঁচে কখনও বাড়ি ফিরে যেতে পারেন, তো ওর জন্যেই পারবেন। এই গ্রীনল্যান্ডের দুর্গম আইস ক্যাপ আর বরফ-ঢাকা অঞ্চলে বেঁচে থাকার কায়দা-কৌশল এখানে একমাত্র ও-ই জানে।'

'বেচে থাকো, বাবা,' ব্যারির দিকে তাকিয়ে হাসলেন সুসান গিলবার্ট। ল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল ধবধবে সাদা দাঁত। 'কিন্তু··· তোমাকে তো ঠিক ব্রিটিশ মনে হচ্ছে না?'

মৃদু হাসল ব্যারি। 'আমার নানা-নানী ছিলেন ড্যানিশ। আমি হাফ গ্রীনল্যান্ডার, হাফ ড্যানিশ। ড্যানিশ আর এস্কিমো রক্ত সমান সমান বইছে আমার শিরায়। তবে নিজেকে এস্কিমো বলেই পরিচয় দিই আমি, বাপ এস্কিমো তো।'

একটু অবাক হয়েই ব্যারির দিকে তাকালেন ডাক্তার। এভাবে খোলাখুলি কথা বলে না কখনও ব্যারি, সুসান গিলবার্টের নিমেষে আপন করে নেবার অদ্ভুত গুণের জন্যেই এটা সম্ভব হয়েছে।

'চমৎকার!' দামী নাইলনের মোজার ওপর দিয়ে পা চুলকাতে চুলকাতে বলল মিংককোট, 'আমার দেখা প্রথম এস্কিমো।'

চকিতে হাসি হাসি ভাবটা মুছে গেল ব্যারির মুখ থেকে, পরমুহূর্তে আবার ফিরে এল। দরাজ গলায় অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, 'ভয় পাবেন না, ম্যাডাম। এস্কিমোরা মানুষ খায় না।'

শঙ্কিত হয়ে পড়লেন ডাক্তার। হাসিখুশি ওই এস্কিমোর সরলতার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে দারুণ বদমেজাজ। ওর পূর্ব-পুরুষদের অনেকেই ছিল দুর্দান্ত জলদস্যু, বদমেজাজটা ওখান থেকেই এসেছে ব্যারির রক্তে, জানেন ডাক্তার।

তাড়াতাড়ি আবার কথা বলে উঠলেন ডাক্তার, 'আমি কার্টার ব্রাউন, এই আই জি ওয়াই স্টেশনের ইনচার্জ। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালাচ্ছি আমরা এখানে। মিটিওরোলজি, গ্লেশিয়োলজি, পৃথিবী ম্যাগনেটিজম, বোরিয়ালিস, এয়ারগ্লো, আয়োনোস্ফিয়ার, কসমিক রে, ম্যাগনেটিক স্টর্ম এবং এমনি আরও অনেক বিষয়ে গবেষণা চালাচ্ছি,' কিছু বলতে যাচ্ছিল মিংককোট, হাত তুলে থামালেন। 'এসব গালভরা নাম আপনাদের শুনতে ভাল না-ও লাগতে পারে। এই স্টেশনে মোট আটজন আছি আমরা। অন্য পাঁচজন একটা গবেষণার কাজে উত্তরে গেছে। সপ্তাহ তিনেকের ভেতরই ফিরবে। শীত আরও বেড়ে উপকূল জমে যাবার আগেই তল্পিতল্পা গুটিয়ে কেটে পড়ব আমরা এখান থেকে। ফিরে আসব আবার আগামী গ্রীষ্মকালে।'

'শীত আরও বাড়বে? বলেন কি!' কথা বলে উঠল কোঁকড়াচুলের পাশে বসা লোকটা। ডোরা-কাটা একটা কোট পরেছে সে।

'বাড়বে বৈকি। ১৯৩০-৩১ সালে এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক ভেতরে গিয়েছিলেন একজন এক্সপ্লোরার, আলফ্রেড ওয়েগনার। তাপমাত্রা কত রেকর্ড করেছেন তিনি জানেন? পঁচাশি ডিগ্রী বিলো জিরো। তুষারপাত হয়েছিল ১১৭ ডিগ্রী। আরও উত্তরের চেয়ে এটা অবশ্য কমই বলা চলে।'

প্রথম থেকেই খেয়াল করছে রানা, চমৎকার রসজ্ঞান ডাক্তার ব্রাউনের। বয়েস পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের কোঠায়, কিন্তু চেহারা দেখে আরও কম মনে হয়। চুলদাড়িতে ঢাকা মুখ, কাট-ছাঁটের সময় পান না হয়তো, কিংবা নিজের প্রতি খেয়াল কম। সরল সাদাসিধে লোকটাকে অপছন্দ করা যায় না কিছুতেই।

মুখরোচক একটা সংবাদ দিয়ে চুপ করে গেলেন ডাক্তার। যাত্রীদের হজম করার সময় দিলেন। তারপর বললেন, 'আমাদের পরিচয় জানলেন। এবার আপনাদের কথা শোনা যাক।'

'আমার নাম জন ওয়াকার,' পরিচয় দিল কপালে-হাতে আঘাত পাওয়া লোকটা। 'গ্যান্ডার যাচ্ছিলাম। ওখান থেকে প্লেন বদলে বদলে নিউ ইয়র্ক।'

'কেন?' জানতে চাইলেন ডাক্তার। 'বেড়াতে?'

'না।' জনের কথার সঙ্গে বাঁকা হাসিটা কেমন যেন বেমানান মনে হলো রানার কাছে। জন বলল, 'গ্লাসগোর একটা প্রতিষ্ঠান, মরিসন ট্রাক্টর কোম্পানির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছিলাম। কোম্পানিটার নাম শুনেছেন?'

'শুনিনি। তবে ট্রাক্টর কোম্পানির লোক শুনে আনন্দ হচ্ছে। বাইরে একটা মান্ধাতা আমলের ট্রাক্টর আছে আমাদের। হাতুড়ি আর স্প্যানারের বাড়ি না খেলে চলতে চায় না।'

'তাই নাকি!' ট্রাক্টরের কথা শুনে একটু যেন চমকে গেল লোকটা। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয় চেষ্টা করব।'

'আমার কি মনে হয় জানেন, মিস্টার ওয়াকার?' বাঁকা চোখে লোকটার দিকে তাকালেন সুসান, 'জীবনে ট্রাক্টর নামক কোন বস্তুর গায়ে হাত ছোঁয়াননি আপনি।'

'তাহলে এবারে ছোঁয়াবার সুযোগ পেয়ে যাবেন,' হাসল রানা।

'আসলে কি জানেন,' হাসল জনও। 'ট্রাক্টর কোম্পানির দায়িত্ব নিতে যাচ্ছি, অথচ ট্রাক্টর সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না, বলতে লজ্জাই হচ্ছে। কিন্তু সবাই তো আর ইঞ্জিনিয়ার নয়। তাছাড়া চীফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের ইঞ্জিনিয়ার হবার দরকারও পড়ে না।'

'তা বটে,' মাথা দোলালেন সুসান।

রেভারেন্ডের দিকে তাকালেন ডাক্তার ব্রাউন। চোখে জিজ্ঞাসা।

'আমি নিউবোল্ড,' গালে হাত ঘষছে গলাবন্ধ-কোট। 'রেভারেন্ড স্টিফেনস নিউবোল্ড। লন্ডনের ইউনিটেরিয়ান অ্যান্ড ফ্রী ইউনাইটেড চার্চে অনুষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে আমি নিউ ইয়র্ক থেকে ডেলিগেট হিসেবে গিয়েছিলাম। বিরাট অধিবেশন হয়ে গেল। গত কয়েক বছরে এত বড় অধিবেশন আর হয়নি, জানেন বোধহয়?'

'জানি না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়লেন ডাক্তার। 'খবরের কাগজ তো আর পাই না আমরা এখানে।' ডোরাকাটা কোটের দিকে ফিরলেন ব্রাউন, 'আপনি?'

'টম মার্টিন। নিউ ইয়র্কের অধিবাসী,' অযথা কথা বাড়াতে চায় না ডোরাকাটা। পাশে বসা কোঁকড়াচুল যুবকের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'মাই সন, ডেরি।'

'কি বললেন? আপনার ছেলে?'

'ওর কথা শুনবেন না,' নাক-মুখ পাকিয়ে বলল যুবক। 'আমার নাম ঠিকই বলেছে, ডেরি, মানে ডেরেক ক্লেটন। কিন্তু আমি ওর ছেলে নই। ও-ই আমার ম্যানেজার।' মিংককোটের দিকে একবার তাকাল ডেরেক। মনে মনে কি হিসেব

করে নিল। আবার ডাক্তারের দিকে ফিরে বলল, 'আমি আসলে সাধারণ এক মুষ্টিযোদ্ধা।' টমের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের সব বলো, ম্যানেজার।'

'ওর কথা বিশ্বাস করবেন না,' দুই হাত ওপরে তুলেছে মার্টিন! 'সাধারণ ও মোটেই নয়, অসাধারণ। ভবিষ্যৎ হেভী ওয়েট চ্যাম্পিয়ন। ইউরোপিয়ানদের একমাত্র আশা ভরসা। ইউরোপের ঘরে ঘরে ফেরে ওর নাম।'

'কিন্তু ডাক্তার ব্রাউন আমার নাম শুনেছেন কিনা জিজ্ঞেস করে দেখো আগে,' বলল ক্লেটন।

হেসে ফেললেন ডাক্তার, 'নাম না শুনলেই বা কি? তবে চেহারা দেখে কিন্তু আপনাকে ফাইটার বলে মনে হচ্ছে না, মিস্টার ক্লেটন। বরং যে কেউ দেখলে বলবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ছুটি কাটাতে চলেছেন কোথাও।'

'কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কি মুষ্টিযোদ্ধা হতে পারে না? লেখাপড়ার সঙ্গে তো এই পেশার কোন বিরোধ আছে বলে জানি না।'

'ঠিক,' জোর দিয়ে বলল মার্টিন। 'বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছিল রোল্যান্ড লা স্টারজা; তখন কি করত ও, কলেজের ছাত্র ছিল না? মুষ্টিযুদ্ধের ইতিহাসে...'

'থামো, টম,' মার্টিনকে থামিয়ে দিল ক্লেটন। 'এখানে কোন সাংবাদিক নেই। কাজেই লেকচার না দিলেও চলবে।'

ক্লেটনের পাশের মেয়েটির দিকে তাকালেন ডাক্তার। 'আপনি, মিস?'

'মিসেস। ভারনন ডুলানী। হয়তো নাম শুনে থাকবেন।'

'উঁহুঁ,' যেন মনে করার চেষ্টা করছেন, এমনি ভাবে ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার, 'নাহ্, শুনিনি।' আসলে কিন্তু ঠিকই শুনেছেন তিনি। লন্ডনের এক কোটিপতি হেনরী ডুলানীর বিধবা স্ত্রী। স্বামীর মৃত্যুর পর নাম করার জন্যে দাতব্য প্রতিষ্ঠান খুলেছে কয়েকটা। তবে যতদূর শুনেছেন ডাক্তার, ওই খোলা পর্যন্তই। এরপরে আর ওগুলোর দিকে তেমন নজর দেয়া হয়নি। আসলে এই মহিলা হয়তো চেয়েছিল, খবরের কাগজে ফলাও করে তার নাম ছাপা হোক। কত বিচিত্র চরিত্রের বাস এই পৃথিবীতে।

ডাক্তার 'শুনিনি' বলাতেও কিন্তু কিছু এসে গেল না ডুলানীর। মিষ্টি করে হাসল, 'আশ্চর্যের কিছু নেই। সমাজ আর লোকজন থেকে অনেক দূরে বাস করেন আপনি।' কলার-বোন ভাঙা মেয়েটার দিকে আঙুল তুলল এবার মহিলা। 'হফম্যান।'

'হফম্যান?'

'হফম্যান। আমার পার্সোনাল মেইড।'

'আপনার পার্সোনাল মেইড,' মেয়েটার প্রতি ডুলানীর অবজ্ঞা দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে ডাক্তারের। রাগ দমিয়ে বললেন, 'আপনার পার্সোনাল মেইড? হাড় ভেঙে গেছে মেয়েটার, আর আপনি ওকে একবার জিজ্ঞেসও করলেন না, কেমন আছে। সেবা করা তো দূরে থাক।'

'মিস গিলবার্টই তো করছেন,' শান্ত কণ্ঠস্বর ডুলানীর। 'আমার দরকার কি?

'ঠিক, মিস গিলবার্টই তো করছেন, আপনার দরকার কি!' বলে উঠল ক্লেটন,

'আপনার হাতে হয়তো ময়লা লাগত।'

ভদ্রতার খোলস ঝরে পড়ল ডুলানীর মুখ থেকে। কঠিন হয়ে গেছে মুখ, রক্ত জমেছে দুই গালে। কিন্তু কোন উত্তর জোগাল না তার মুখে। তাছাড়া উত্তর দেবার আছেইবা কি? সত্যি কথাটা সহজ ভাবেই বলে ফেলেছে ক্লেটন।

'আপনারা দুজন,' তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলালেন ডাক্তার। পাকাচুলো আর খোঁচা খোঁচা দাড়ি বৃদ্ধ লোকটির পরিচয় জানতে চাইলেন তিনি।

পকেট থেকে খাপসুদ্ধ চশমা বের করলেন খোঁচা দাড়ি। খাপের ভেতর একটা ভারী পাওয়ারের রিমলেস চশমা। চোখে লাগালেন। ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি মুস্তাফা শরাফী। ফিলিস্তিনী। ইহুদীরা দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে। তখন লেজ গুটিয়ে পালিয়েছিলাম। কিন্তু এখন এমন জিনিস আছে আমার কাছে, সর্বনাশ করে ছাড়ব ব্যাটাদের। রবা…শরাফীকে চেনে না।'

ভুরু কুঁচকে লোকটার দিকে তাকাল রানা। শরাফীর কথায়, চেহারায় কোথায় যেন কি একটা গোলমাল আছে, ঠিক ধরতে পারল না।

'কি এমন জিনিস আছে আপনার কাছে, মিস্টার শরাফী?' জানতে চাইলেন ডাক্তার।

'আছে—না, মানে এখন নেই, তবে থাকবে…'

'ও,' শরাফী মাথা খারাপদের দলে শিগ্‌গিরই যোগ দেবে, মনে মনে ধারণা করে নিয়ে পাকাচুলোর দিকে তাকালেন ডাক্তার। চোখে জিজ্ঞাসা।

'ম্যাক্সওয়েল।' থামল পাকাচুলো। 'সিনেটর ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল।' সিনেটর কথাটার ওপর বিশেষ জোর দিল। 'কোন সাহায্য করতে পারলে আনন্দিত হব, ডাক্তার কার্টার ব্রাউন।'

'ধন্যবাদ সিনেটর,' মুচকে হাসলেন ডাক্তার। সিনেটরের নিজেকে প্রচার করার বহর দেখে অবাকই হয়েছেন তিনি। মানুষ এত বেহায়া হতে পারে!

'ইয়োরোপ ভ্রমণে এসেছিলেন বুঝি?'

'সে-রকমই বলতে পারেন,' গর্বের সঙ্গে বলল সিনেটর। 'অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে তো আমাকে…দেশে দেশে ঘুরে তাই…'

'হাওয়া খাচ্ছিলেন,' হালকা গলায় বলে বসল ক্লেটন। 'স্ত্রী আর সেক্রেটারিরা কোথায়, জনাব? আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন? দেশটাকে আর কত ডোবাবেন? রক্ত পানি করা পয়সায় ট্যাক্স দিচ্ছে লোকে, আর আপনারা সেগুলো দু'হাতে ওড়াচ্ছেন। মৌজ করছেন।'

মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা, এক্ষুণি একটা যাচ্ছেতাই রকমের কেলেঙ্কারি কাণ্ড না হয়ে যায়! কিন্তু না, পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ ম্যাক্সওয়েল, কিংবা কে জানে ঘুসি খাবার ভয়েই হয়তো, চটল না। শান্তকণ্ঠে বলল, 'দেখো ছোকরা, গায়ে পড়ে অপমানের চেষ্টা করছ কিন্তু।'

'আরে না না, অপমান আর কোথায়। ওসব গায়ে মাখেন নাকি আপনারা? চামড়া যে মোটা…'

'এক্কেবারে বাচ্চা ছেলে! অবুঝ! পাগল!' দিলদরিয়া মেজাজে বলল সিনেটর।

বিচিত্র, সত্যিই বিচিত্র একদল মানুষ, ভাবছে রানা। এদের একজন ব্যবসায়ী, একজন গায়িকা-অভিনেত্রী, এক রেভারেন্ড, লন্ডনের এক সমাজ বিলাসিনী আর তার জার্মান পরিচারিকা, এক মার্কিন সিনেটর, আজব এক ফিলিস্তিনী, হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এক এয়ার হোস্টেস, সহজ-সরল অথচ বদরাগী এক বিজ্ঞানী, বিশালদেহী হাসিখুশি এক আইস স্পেশালিস্ট এস্কিমো, স্বল্পভাষী এক রেডিওম্যান আর মুমূর্ষু এক পাইলট কাম-ওয়্যারলেস অপারেটর। ঘটনাচক্রে এই বিচিত্র দলটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে সে। তিনজন ছাড়া অন্যদের বিপদ থেকে রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় তুলে নিয়েছে সে নিজের কাঁধে। প্রথমে মনে করেছিল, একটা স্বাভাবিক প্লেন দুর্ঘটনা, কিন্তু এখন জানে, অন্য ব্যাপারও রয়েছে এর ভেতর। ফলে অনেক বেশি ঘোরাল হয়ে উঠেছে গোটা পরিস্থিতি···।

'আচ্ছা ডাক্তার ব্রাউন,' জন ওয়াকারের কথায় ভাবনার জগৎ থেকে ফিরে এল রানা। 'আপনাদের গবেষণার বিষয়বস্তু একটু ভেঙে বলবেন কি?'

'কতদূর বুঝবেন, জানি না,' সত্যি কথাই বললেন ডাক্তার। 'তবে মূল ব্যাপার যতটা সম্ভব সহজ করে বলছি, শুনুন।' কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন ব্রাউন। 'গত প্রায় এক বছর ধরে সৌরকলঙ্কের তীব্র সক্রিয়তা টের পাচ্ছি আমরা। জানেন বোধহয়, সৌরকলঙ্ক কিংবা এর থেকে সৌরকণার বিকিরণই অরোরা বোরিয়ালিস আর চৌম্বক ঝড়ের প্রধান কারণ। আয়োনোস্ফিয়ারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যেও সৌরকলঙ্ক আর সৌরকণাই দায়ী। এই বিশৃঙ্খলা জোরাল হয়ে উঠলে বেতার যোগাযোগে বাধার সৃষ্টি করে, ক্ষণিক পরিবর্তন ঘটায় ভূ-চুম্বকত্বে—সাময়িকভাবে বেকার করে দেয় চুম্বক কম্পাস। আমাদের দুর্ভাগ্য, জোরাল বিশৃঙ্খলা চলছে এখন আয়োনোস্ফিয়ারে···'

'অর্থাৎ, রেডিও এবং কম্পাস—কোনটারই সাহায্য পাচ্ছি না আমরা, এই তো বলবেন?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিকই ধরেছেন,' রানার দিকে তাকালেন ব্রাউন। 'আমার কি মনে হয় জানেন? প্লেনের কম্পাসও খারাপ হয়ে গেছে এই বিশৃঙ্খলার জন্যেই। পথ হারিয়ে ফেলেছেন পাইলট···'

'না,' জোর দিয়ে বলল রানা। 'প্লেনে আজকাল আর সাধারণ কম্পাস থাকে না, জাইরো কম্পাস ব্যবহার করা হয়। আর এই জাইরো কম্পাসের কোন ক্ষতিই করতে পারে না আয়োনোস্ফিয়ারের বিশৃঙ্খলা কিংবা ভূ-চুম্বকত্বের ক্ষণিক পরিবর্তন।'

আরও আধ ঘণ্টা পর। আহত জেস ওয়েন্সের ক্ষত ধুয়ে কাটাছেঁড়াগুলো সেলাই করে ওষুধ লাগানো শেষ করেছেন ডাক্তার ব্রাউন। তাঁকে সাধ্যমত সাহায্য করেছে স্টুয়ার্ডেস।

কাজ শেষ করে ওয়েন্সকে একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে দিলেন ডাক্তার।

'কেমন মনে হচ্ছে, ডাক্তার ব্রাউন?' জানতে চাইল স্টুয়ার্ডেস।

'বলা শক্ত। ব্রেন স্পেশালিস্ট ছাড়া আসল ব্যাপারটা জানা যাবে না। তবে

আমি ব্রেন হেমোরেজ আশঙ্কা করছি,' ডাক্তার গম্ভীর।

'যদি ব্রেন হেমোরেজ না হয়, আঘাতটা যত ভাবছেন তত খারাপ না হয়? আকুল কণ্ঠ স্টুয়ার্ডেসের।

'তাহলে হয়তো আশা আছে। ওর জীবনীশক্তি দেখে অবাকই লাগছে। গর খাবার, ভাল হাসপাতাল আর সেবাযত্ন পেলে হয়তো সেরেই যেত।'

'ধন্যবাদ...'

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটার মুখের দিকে তাকালেন ডাক্তার। চোখের কোে কালিমা। ভারী পোশাক পরেও থরথর করে কাঁপছে। একেবারে ভেঙে পড়েে মেয়েটা।

'শুতে যান,' এই প্রথম মেয়েটার জন্যে করুণা অনুভব করলেন ডাক্তার। 'ঘু আর উত্তাপ দরকার এখন আপনার। আর হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনার নামটাই জানি না এখনও।'

'শ্যারিন...শ্যারিন ক্যাম্পবেল।'

'স্কচ?' পাশেই একটা প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে ডাক্তারের কাজ দেখছিল রানা, জিজ্ঞেস করল।

চোখ তুলে রানার দিকে তাকাল মেয়েটা। 'আইরিশ।'

হাসল রানা, ভরসা দিতে চাইছে যেন। 'আচ্ছা মিস...মিসই তো?' মেয়েট মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলে বলল, 'মিস ক্যাম্পবেল, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না এত বড় একটা প্লেন এত কম যাত্রী নিয়ে যাচ্ছিল কেন?'

'এটা এক্সট্রা প্লেন। প্যাসেঞ্জারের ওভারফ্লো হয়ে গিয়েছিল গ্যান্ডা এয়ারপোর্টে। তাই এই বাড়তি প্লেনটার বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ে আগেই ছেড়েছে। ওই ফ্লাইটের জন্যে যে ক'টা টিকিট বিক্রি হয়েছিল, সব কজন প্যাসেঞ্জারকে টেলিফোন করা হয়েছে। কে কে আগেই যেতে চায় জিজ্ঞেস করে মোট দশজনকে পাওয়া গেছে।'

'ও। আচ্ছা, ট্র্যান্স-আটলান্টিক ফ্লাইট—বিরাট বিমান, অথচ আপনি একজন মাত্র স্টুয়ার্ডেস...একটু অস্বাভাবিক না?'

'ঠিকই বলেছেন,' বাঁ হাতে গাল চুলকাল শ্যারিন। ল্যাম্পের আলোয় ঝিকিয়ে উঠল অনামিকায় পরা আঙটির পাথর। 'আসলে মোট তিনজন থাকার নিয়ম একজন স্টুয়ার্ড এবং দু'জন স্টুয়ার্ডেস, কিংবা একজন স্টুয়ার্ডেস এবং দু'জন স্টুয়ার্ড কিন্তু মাত্র দশজন যাত্রীর জন্যে তো আর এটা সম্ভব নয়।'

'হুঁ, দশজনের জন্যে একজনই যথেষ্ট,' হালকা গলায় বলল রানা। 'এরপরেও ঘুমোনোর সময় পাওয়া যায়। কম যাত্রী হলে লাভ আছে।'

'প্লীজ, আমাকে লজ্জা দেবেন না আর। এর আগেও কম যাত্রীদের সঙ্গে উড়েছি, প্রচুর সময়ও পেয়েছি, কিন্তু কক্ষনো এবারের মত হয়নি আমার!'

'সরি, মিস ক্যাম্পবেল, আপনাকে খোঁচা দিয়ে কিছু বলতে চাইনি।'

'আসলে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছি না আমি,' পানি চিকচিক করছে শ্যারিনের আয়ত বাদামী চোখে। 'ঘুমিয়ে না পড়লে যাত্রীদের হুঁশিয়ার করে দিতে

পারতাম আগেই। সীট বেল্ট বাঁধতে বলতাম। ওভাবে মারা যেতেন না ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্স…।'

'কে?' কথার মাঝখানেই জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার।

'ক্যাপ্টেন ফিলিপ ব্রায়ার্স। পেছনের আসনে যিনি বসেছিলেন।'

'কিন্তু ও-তো সিভিল পোশাকেই রয়েছে?'

'কেন? সামরিক বাহিনীর লোকেরা সিভিল পোশাক পরে প্লেনে চড়তে পারে না?' ডাক্তারকে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'হ্যাঁ…তা পারে।' এদিক ওদিক মাথা দোলালেন ডাক্তার।

'প্যাসেঞ্জার লিস্টে নামের আগে ক্যাপ্টেন লেখা ছিল,' বলল শ্যারিন। 'হ্যাঁ, আমি ঘুমিয়ে না পড়লে এভাবে মারা যেতেন না তিনি। মিস হফম্যানের কলার-বোনও ভাঙত না।'

হফম্যানের কাঁধের হাড় হয়তো ভাঙত না, কিন্তু ক্যাপ্টেনের মৃত্যু তুমি ঠেকাতে পারতে না, শ্যারিন। ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো তোমাকেও মরতে হত, ভাবছে রানা। কিন্তু মেয়েটার অস্বস্তির কারণ এবারে বুঝতে পারল। আসলে কর্তব্যে অবহেলা করে ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে নিজেকে ক্ষমা করতে পারছে না স্টুয়ার্ডেস। নাকি অন্য কিছু?

'খামোকা কষ্ট পাচ্ছেন আপনি,' সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল রানা। 'আপনি ঘুমিয়ে না পড়লেই যে ওরা মারা যেত না, এটা ঠিক নয়।'

'ওরা?' ভুরু কোঁচকালেন ডাক্তার।

'দুই পাইলটের কথা বলছি।'

'ও,' বললেন ডাক্তার। 'তা যা হবার হয়ে গেছে, ওসব ভেবে এখন লাভ নেই। যারা জীবিত আছেন, তাঁরা কি করে বাঁচবেন সেই উপায়ই ভাবা দরকার। রাত অনেক হলো। এখন খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়তে হবে। সকালে উঠে যাহয় একটা উপায় বের করা যাবে।'

গরম সুপ, গরুর ভাজা মাংস, আলু আর সব্জী দিয়ে খাওয়াটা বেশ ভালই জমল। সবই টিনের খাদ্য, কিন্তু খিদেয় সবারই পেট চোঁ চোঁ করছে, কাজেই গোগ্রাসে গিলল সবাই।

ক্রোনোমিটারে দেখা গেল, ভোর তিনটে। শুতে গেল ওরা।

মোট আটটা ঘুমোবার তাক। সবচেয়ে ওপরের চারটেতে চারজন মহিলার শোবার বন্দোবস্ত হলো। কিন্তু চারজনের একজন—শ্যারিনকে কিছুতেই রাজি করানো গেল না, সে মেঝেতেই শোবে—জেস ওয়েন্সের পাশে। ওপরের তাকগুলোতে মেঝের চেয়ে তাপ অন্তত পঁচিশ ডিগ্রী বেশি। ভোরের দিকে তাপমাত্রা নেমে যাবে আরও, তখনও ওখানে মেঝের চেয়ে তাপ বেশি থাকবে। চুল্লি জ্বেলে রাখতে পারলে, একটু বেশি গরম থাকত কেবিনের আবহাওয়া, কিন্তু ঘুমোনোর আগে সব সময় আগুন নিভিয়ে ফেলেন ডাক্তার। কাঠ আর ছোবড়ার তৈরি কেবিন, কাজেই আগুনের ঝুঁকি কিছুতেই নিতে রাজি নন তিনি।

মেয়েদের বাদ দিলে বাকি রইল সাতজন যাত্রী, আহত ওয়েন্স সহ। তাকের

ওপর ওয়েলসের কটের জায়গা হবে না, মেঝেতে এখন যেভাবে রয়েছে তেমনিই থাকতে হবে। তাক অবশিষ্ট আছে পাঁচটা, পাঁচজন যাত্রী ঘুমোতে পারবে, বাদ রয়ে যাবে একজন। কে থাকবে? তাছাড়া রানা, ডাক্তার, ব্যারি আর পোর্টারের কথা তো বাদই। এই শেষ চারজন মেঝেতেই ঘুমোবে, নিজেরাই আলোচনা করে ঠিক করেছে। গোল বাধাল যাত্রীরা। তারাও নিজেদের নিঃস্বার্থ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগে গেল। সমাধানের ব্যবস্থা করল জন ওয়াকার। পকেট থেকে একটা কয়েন বের করল। শেষ পর্যন্ত নিজেই হেরে গেল টসে। খুশিমনে শুতে গেল মেঝেতে।

তাকে উঠে নিজেদের স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢোকাল যাত্রীরা। শুয়ে পড়ল রানা, ওয়াকার আর শ্যারিনও।

ইনস্ট্রুমেন্টস টেবিল থেকে ওয়েদার লগবুক আর টর্চটা তুলে নিলেন ডাক্তার। ব্যারির দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকালেন। তারপর রওনা দিলেন বাইরে বেরোনোর দরজার দিকে।

তাক থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল ক্লেটন, 'এত রাতে আবার কোথায় যাচ্ছেন, ডাক্তার সাহেব?'

'আবহাওয়ার খবর নিতে। এমনিতেই তিন ঘণ্টা দেরি করে ফেলেছি।'

'আজ রাতেও? মানে, আমি বলছি, এই ঝড়ের মাঝেও?'

'ঝড়ের মাঝেও। আবহাওয়া পর্যবেক্ষণে ফাঁকি দিলে চলবে না।'

'ও···। এসব কাজ করে কি মজা যে পান···' ব্যাগের ভেতরে মুখ ঢোকাল ক্লেটন।

ব্যারি উঠে দাঁড়িয়েছে। 'আমিও আসছি, ডাক্তার। কুকুরগুলোকে দেখা দরকার।'

সোজা ট্রাক্টর শেডের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন ডাক্তার। বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। আইস ক্যাপে নেমেছে শীতের দীর্ঘ ভয়ঙ্কর রাত।

'পুরো ব্যাপারটাতে কোথাও ভীষণ গোলমাল রয়েছে, রিক,' কোনরকম ভূমিকা না করেই বললেন ডাক্তার।

'মানে? কি বলতে চাইছেন?' বিস্মিত হলো ব্যারি।

'এই প্লেন দুর্ঘটনা। ব্যাপারটা কেমন যেন অস্বাভাবিক।'

'এ ধারণা আপনার মাথায় ঢুকল কেন?'

'এতবড় একটা দুর্ঘটনা ঘটল, অথচ যাত্রীরা টেরই পেল না কিছু। কেন?'

'কি জানি···' অনিশ্চিত কণ্ঠ ব্যারির।

'কারণ কেউ ওদের হুঁশিয়ার করেনি। ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিল যাত্রীরা।'

অন্ধকারে ডাক্তারের মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। শান্ত কণ্ঠে বলল ব্যারি, 'শিওর না হয়ে সাধারণত কোন কথা বলেন না আপনি।'

'আমি শিওর, ব্যারি। ঘুমের বড়ি গুলে খাওয়ানো হয়েছিল ওদের। বাজারে চালু মিকি ফিন জাতীয় কিছু।'

'কি বলছেন!'

'ঠিকই বলছি। আমি ডাক্তার, ভুলে যাচ্ছ কেন? যাত্রীদের চোখের তারায় লক্ষণ দেখেছি, কিছুতেই ভুল হবার নয়...'

'কিন্তু এতগুলো লোক, জেগে ওঠার পর কেউ সন্দেহ করল না, তাদের ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে?'

'অন্য সময় হলে হয়তো টের পেত কেউ কেউ, কিন্তু ওই পরিস্থিতিতে অসম্ভব। সামান্য দুর্বলতা, মাথা ঘোরা কিংবা অবসন্নতা নিশ্চয় বোধ করেছে, তবে এসবকে দুর্ঘটনার ফল বলেই ধরে নিয়েছে হয়তো। কিংবা বুঝেও আমাদের কাছে চেপে গেছে, নিজেদের দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায়নি। প্রয়োজন বা বিপদের সময়ে, বিশেষ করে অন্যের ঘাড়ে চাপতে যাচ্ছে যখন বোঝে, নিজেদের অসুস্থ দেখাতে চায় না লোকে, এটা মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।'

সহসা কোন উত্তর জোগাল না ব্যারির মুখে। ডাক্তারের কথাগুলো বোঝার চেষ্টা করছে। হাড় ভেদ করে মজ্জায় ঢোকার চেষ্টা চালাচ্ছে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, কিন্তু খেয়াল নেই তার।

'অবিশ্বাস্য,' কয়েক মুহূর্ত পর বলল ব্যারি। 'সকলকেই নেশা করানো হয়েছিল বলছেন?'

'অনেককেই।'

'কিন্তু কে এমন করতে পারে...

'এ কথার জবাব শোনার আগে বলো তো, আমাদের রেডিওটা কি করে পড়ল?'

'কি বললেন?' ডাক্তারের প্রশ্নের তাৎপর্য বুঝতে পেরেই চমকে গেল ব্যারি। রেডিওটা কি করে পড়ল জিজ্ঞেস করছেন? কারও গায়ে লেগে উল্টে পড়তে পারে না ওটা, এটুকু বলতে পারি। আপনি বলতে চাইছেন কেউ ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে ওটাকে।'

'শ্যারিন নিজেই স্বীকার করেছে, ওর গায়ের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে টেবিলটা।'

'কিন্তু কেন? যোগাযোগ ব্যাহত করে লাভ কি? যাত্রীদের ঘুম পাড়িয়েই বা কি লাভ হয়েছে?'

'জানি না। জানি না আরও অনেক কিছুই। আচ্ছা, না হয় বুঝলাম, বেখেয়ালে টেবিলের সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে শ্যারিন...কিন্তু ওষুধ? যাত্রীদের ওষুধ গেলানো কার পক্ষে সহজ ছিল? কিসের সঙ্গে?'

'গড!' আর্তনাদের মত শোনাল এস্কিমোর স্বর। 'ড্রিংক! মানে, কফি!'

'মদও হতে পারে। তবে কফিতে মিশিয়ে খাওয়ানোর সম্ভাবনাই বেশি। আর প্লেনে কে সরবরাহ করে কফি?'

'ওর ব্যবহার অস্বাভাবিক লাগছিল এজন্যেই, বস্, এখন বুঝতে পারছি...'

'কিন্তু কেন এই কাণ্ড করল সে, কিছুই মাথায় আসছে না আমার,' অনিশ্চিত শোনাল ডাক্তারের গলা।

'রানাকে জানাতে হবে। ওকে যতটা জানি, মাথাটা ওর খুবই পরিষ্কার। হয়তো কোন সমাধান দিতে পারবে সে...।'

'আর হ্যাঁ, সুযোগ পেলে কেভিনকেও জানিয়ে রেখো। হুঁশিয়ার থাকতে হবে আমাদের।'

দু'জনেই ফিরে এসে ঢুকল কেবিনে। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তাপ যন্ত্রটার কাছে এগিয়ে গেলেন ডাক্তার। শূন্যের আটচল্লিশ ডিগ্রী নিচে নেমেছে তাপমাত্রা। তুষারপাত মাপার যন্ত্রটায় দেখলেন, আশি ডিগ্রী শো করছে।

পার্কা না খুলেই স্লিপিং ব্যাগে গিয়ে ঢুকলেন ডাক্তার।

চুলো নিভিয়ে দিয়ে এসে রানার গা ঘেঁষে শুলো ব্যারি। কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে ডাকল, 'রানা?'

এক ডাকেই সাড়া দিল রানা, 'শুনছি।'

অল্প কথায় ঘুমের ওষুধের ব্যাপারটা খুলে বলল ব্যারি।

চুপচাপ শুনল রানা। শেষে বলল, 'জানি আমি।' কয়েক মুহূর্ত পরেই ঘুমিয়ে পড়ল সে আবার।

পাঁচ

গত চার মাসে এই প্রথম ঘড়ির অ্যালার্মে দম দিতে ভুলে গেলেন ডাক্তার ব্রাউন। অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল তাঁর। শীতকাল। বরফের দেশে বেলা হয়েছে ঘড়ির কাঁটায়, বাইরে এখনও মাঝরাতের মতই অন্ধকার। দিগন্তের ওপর সূর্যের শেষ দেখা পাবার পর তিন সপ্তাহের মত কেটে গেছে। এখন শুধু দুপুরে সামান্য আলো ফোটে, তা-ও মেঘলা গোধূলিতে যেটুকু হয়, তার চেয়ে কম। ঠাণ্ডার মধ্যে কাঠের শক্ত মেঝেতে শুয়ে সারা শরীর ব্যথা হয়ে গেছে ডাক্তারের। হাতঘড়িটা স্লিপিং ব্যাগের ভেতর থেকে বের করে চোখের সামনে নিয়ে এলেন। রেডিয়াম লাগানো কাঁটা আর নম্বর জ্বলজ্বল করছে, সকাল সাড়ে ন'টা।

ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এলেন ডাক্তার। পকেট থেকে টর্চ বের করলেন। অয়েল-ল্যাম্পটা খুঁজে নিয়ে জ্বাললেন। ম্লান আলোয় কেবিনের কিছুই পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। তাকের ওপরে স্লিপিং ব্যাগগুলোকে দেখাচ্ছে মমি রাখার আধারের মত। মেঝেতেও পড়ে রয়েছে কয়েকটা ব্যাগ, আবছা আলোয় কেমন যেন অবাস্তব লাগছে দেখতে।

দেয়ালের গায়ে তুষারের প্রলেপ। দরজার নিচের অতি সামান্য ফাঁক দিয়ে বাতাস ঢোকে ঘরে, এতেই তুষার জমে দেয়ালে। সব সময় এটা ঘটে না, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়লে আর তুষারপাত হলেই এভাবে বরফ জমে যায়। তাপ-যন্ত্রে দেখলেন ডাক্তার, বাইরের তাপমাত্রা শূন্যের ৫৪ ডিগ্রী নিচে।

চুলোটা ধরাতে দারুণ বেগ পেতে হলো। ঠাণ্ডায় স্বাভাবিক তরলতা হারিয়েছে জ্বালানী তেল। আগুন ধরতে সময় নিল। সারারাত মেঝেয় পড়েছিল বালতি দুটো, জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে পানি। দুটোই চুলোয় বসালেন ডাক্তার।

তারপর আইস মাস্ক আর গগলসটা পরে নিয়ে বেরিয়ে এলেন বাইরে। আবহাওয়ার অবস্থা দেখবেন।

গতি হারিয়েছে বাতাস। অ্যানিমোমিটারের কাপ ঘোরার শব্দ প্রায় নেই বললেই চলে। বরফ কুচির দৌরাত্ম্য এখন বন্ধ। গুঁড়ো তুষারে পড়ে চকচক করছে টর্চের আলো। পুবমুখো বাতাস বইছে ঝিরঝির করে। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। বাতাসের গতি নেই, তাতেই এ অবস্থা। গতি বাড়লে আরও বাড়বে হিম।

কেবিনে এসে ঢুকলেন আবার ডাক্তার। ব্যারি উঠে পড়েছে। কফির ব্যবস্থা করছে। ডাক্তারকে দেখে হাসল। জান বের করে দেয়া ঠাণ্ডায় সারারাত পড়ে থেকে সকালে উঠে এমন হাসি কি করে হাসে এস্কিমো, বুঝতে পারেন না ডাক্তার। ব্যারির চেহারায় শ্রান্তি আর বিরক্তির লক্ষণ কখনও দেখেননি তিনি। প্রচণ্ড পরিশ্রম আর সারা রাতের নিদ্রাহীনতাও একটু কাহিল করতে পারে না তাকে।

সিনেটর বাদে অন্যদেরও ঘুম ভেঙেছে, কিন্তু ব্যাগ থেকে বেরিয়ে আসছে না কেউই। চুল্লির দিকে তাকিয়ে আছে সবাই, থর থর করে কাঁপছে, চোখ দিয়ে যেন আগুনের উত্তাপ শুষে নিতে চায়। ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে মুখ। চোখ ফিরিয়ে মাঝে মাঝে ব্যারির দিকেও তাকাচ্ছে কেউ কেউ, কফির আশায়। কফির কড়া গন্ধে ভরে উঠেছে ঘর। কেউ কেউ অবাক চোখে তাকাচ্ছে সিলিঙের দিকে। আগুনে গরম হয়ে উঠেছে ঘরের ভেতরের উত্তাপ, সিলিঙে জমে থাকা তুষার গলে টুপটাপ ঝরতে শুরু করেছে। ছাত আর মেঝের তাপমাত্রার ব্যবধান এখন চল্লিশ ডিগ্রী।

ব্যাগের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল রানা। হাই তুলল। ব্যারিকে ডেকে বলল, 'এই রিক, তোমার কফি হলো? বাবারে বাবা, হাত-পা নাড়াতে পারছি না। ঠাণ্ডা, ব্যথা! উফ্!' হাত ঝাড়া দিল সে।

'গুড মর্নিং, মিস্টার মাসুদ রানা দি গ্রেট অ্যাডভেঞ্চারার,' হাসি হাসি গলায় কথা শোনা গেল ওপরের তাক থেকে। সুসান গিলবার্ট। গত রাতের চেয়ে দশ বছর বয়েস বেড়ে গেছে যেন তাঁর হঠাৎই। ওপরের তাকে মেঝের চেয়ে উত্তাপ অনেক বেশি; প্রচুর কাপড়-চোপড় আর স্লিপিং ব্যাগও পেয়েছেন, তবু ঠাণ্ডা কাহিল করে ফেলেছে তাঁকে। দেখে, এই প্রথম মনে হলো রানার, সুসান গিলবার্ট বৃদ্ধা।

'গুড মর্নিং, ডার্লিং,' হাসল রানা। 'নতুন বাড়িতে রাতটা কেমন কাটল?'

'রাত!' ব্যাগের ভেতর থেকে হাত দুটো বের করে এনে তালুর ওপর মাথা রাখলেন সুসান। চুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা; এটাই যেন শেষ রাত হয় এখানে।' ডাক্তারকে ডেকে বললেন, 'চমৎকার জায়গায় দোকান খুলেছেন আপনি, ডাক্তার সাহেব। এত ঠাণ্ডা, বাপরে বাপ!'

'দুঃখিত,' ঘুম থেকে ওঠার পর প্রথম হাসি ফুটল ডাক্তারের মুখে। গোমড়া লোকের মুখেও হাসি ফুটাতে মহিলা ওস্তাদ। 'আসলে চুলোটা নেভানো একদম উচিত হয়নি আমার।' সিলিঙের গলে যাওয়া তুষারের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'এরই মাঝে কেমন গলে যাচ্ছে বরফ, দেখুন।' থেমে বললেন, 'গরম কফি খান, আরাম পাবেন।'

'আরাম আর কখনও পাব না,' কণ্ঠে বিরক্তি, কিন্তু চোখের কোণে মিষ্টি হাসির

ঝিলিক অভিনেত্রীর। উঁকি দিয়ে মার্থার দিকে তাকালেন, 'কি গো মেয়ে, তোমার কি অবস্থা?'

'একটু ভালই। থ্যাংক ইউ, মিস গিলবার্ট,' জার্মান মেয়েটার গলায় কৃতজ্ঞতার ছোঁয়া। 'ব্যথা টের পাচ্ছি না, অবশ হয়ে গেছে যেন জায়গাটা।'

'তোমার তো ভাঙা জায়গাটা শুধু,' হালকা গলায় বললেন সুসান। 'এদিকে আমার পুরো শরীরই অবশ। বরফই হয়ে গেছে মনে হয়।' ভারনন ডুলানীর দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার রাত কেমন কাটল গো?'

'বেঁচে রয়েছি দেখছেনই তো,' ম্লান হাসি ডুলানীর মুখে। শ্বাস টানলেন জোরে জোরে। 'বাহ, চমৎকার গন্ধ বেরিয়েছে তো কফির! হফম্যান, নিয়ে এসো তো এক কাপ।'

রানার চোখ ঘুরে গেল মার্থার দিকে। জিপার বন্ধ ব্যাগের ভেতর থেকে হাত বের করার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। মগে কফি ঢালছে ব্যারি। উঠে গিয়ে একটা মগ তুলে নিয়ে মেয়েটার কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ধমক দিল মার্থাকে, 'কি বোকার মত কাণ্ড করছ! নিজেই নড়তে পারো না···' ব্যাগের চেন খুলে দিল। হাত বের করল মেয়েটা। এক হাতের ওপরই ভর দিয়ে উঠে বসল। কাপটা বাড়িয়ে ধরে বলল রানা, 'ওখানে বসেই খেয়ে নাও।' ঘুরে ডুলানীর দিকে তাকিয়ে কড়া করে বলল, 'আপনার ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি, মেয়েটার কলার-বোন ভাঙা। ওর নিজেরই নড়াচড়া করতে অসুবিধে হয়।'

'আরে, তাই তো! সত্যিই খুব দুঃখিত, একদম ভুলে গিয়েছিলাম!' ডুলানীর মুখ দেখেই বোঝা গেল, মার্থা অসুস্থ তা মোটেই ভোলেনি সে। ইচ্ছে করেই আদেশটা দিয়েছে পরিচারিকাকে। বুঝল রানা, একজন শত্রু তৈরি করল। অবশ্য এতে কিছুই যায় আসে না তার।

এই সময় দুই হাতে কফির মগ নিয়ে রানার পাশে এসে দাঁড়াল ব্যারি। তার হাত থেকে একটা মগ নিয়ে সুসানের দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, 'নিন।'

হাত বাড়িয়ে মগটা ধরলেন সুসান। রানাকে উদ্দেশ্য করে বাতাসে চুমো খেলেন। ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে উঠল শ্যারিন ক্যাম্পবেল। চমকে গেলেন সুসান। তাঁর হাত কেঁপে গিয়ে মগ থেকে গরম কফি ছলকে পড়ল রানার হাতে।

জ্বলে উঠল হাতের চামড়া, কিন্তু গ্রাহ্যই করল না রানা। প্রায় ছুটে গেল শ্যারিনের দিকে। কটে শুয়ে থাকা দেহটার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে মেয়েটা। ধাক্কা দিয়ে তাকে সরিয়েই হাঁটু মুড়ে পাশে বসে পড়ল রানা। ডাক্তারও এসে বসলেন তার পাশে।

জেস ওয়েন্সের নাড়ি দেখলেন ডাক্তার, আরও দুয়েকটা পরীক্ষা সারতে কয়েক সেকেন্ড খরচ হলো। ইতোমধ্যেই মার্থা ছাড়া সবাই বেরিয়ে এসেছে স্লিপিং ব্যাগের বাইরে। রানা আর ডাক্তারের মাথার ওপর এসে দাঁড়িয়েছে ডেরেক ক্লেটন।

'মারা গেছে লোকটা, না, ডাক্তার সাহেব?' নীরবতা ভাঙল মুষ্টিযোদ্ধা। অদ্ভুত শান্ত অথচ কেমন যেন কর্কশ শোনাল গলাটা। 'ওই মাথার আঘাতের জন্যে

নিশ্চয়?'

'হতে পারে,' অনিশ্চিত শোনাল ডাক্তারের গলা। 'চার-পাঁচ ঘণ্টা আগে মারা গেছে।'

কিন্তু জেসের মৃত্যু কি করে ঘটেছে, পরিষ্কার বুঝতে পারছে রানা। খুন। চরম নৃশংস, পৈশাচিক আরেকটা খুন। জ্ঞানহীন, মারাত্মক আহত আর কটের সঙ্গে হাত-বাঁধা শিশুর মত অসহায় লোকটাকে শ্বাসরোধ করে মেরে ফেলেছে কেউ।

কেবিন থেকে গজ পঞ্চাশেক দূরে বরফের কবরে সমাহিত করা হলো হতভাগ্য পাইলট জেস ওয়েন্সকে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় লোহার মত কঠিন হয়ে গেছে ওর দেহ। কেবিনের দরজা দিয়ে শক্ত দেহটাকে অনেক কসরৎ করে বাইরে আনা হলো। টর্চের ম্লান আলোয় কবর খোঁড়া হলো। কবর খুঁড়তে ব্যারিকে সাহায্য করল মুষ্টিযোদ্ধা। কঠিন পিচ্ছিল বরফে পিছলে গেল গাঁইতি আর কোদাল। মাত্র আঠারো ইঞ্চি গভীর একজন মানুষ শোয়ানোর মত গর্তটা খুঁড়তেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হলো দুজন শক্তসমর্থ লোককে।

জেস ওয়েন্সের কবর ঘিরে মাথা নিচু করে দাঁড়াল সবাই। পকেট থেকে বাইবেল বের করল রেভারেন্ড স্টিফেন্স নিউবোল্ড। বিড়বিড় করে কিছু পড়ল বাইবেলের পাতা থেকে। ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি লাগছে ওর। শ্লোকগুলো পরিষ্কার বোঝা গেল না।

কবর দেবার কাজ শেষ হলে নীরবে কেবিনে ফিরে এল আবার সবাই। আরও বেড়েছে কেবিনের তাপমাত্রা, কিন্তু বরফের মতই শীতল হয়ে গেছে যেন সবাই। কারও মুখে কোন কথা নেই। নীরবতার মাঝেই কোনমতে শেষ হলো নাস্তা। খাবার ধরন দেখেই বোঝা গেল, রুচি নেই কারোই। শ্যারিন তো কিছুই খেলো না। তার কফির মগটা পর্যন্ত ভরাই রয়েছে, দুই চুমুক মুখে তুলেছে মাত্র।

'বড় বেশি অভিনয় করে ফেলছ তুমি, সুন্দরী,' শ্যারিনের দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে ভাবছেন ডাক্তার ব্রাউন। 'তবে বেশিক্ষণ অপরাধ চাপা দিয়ে রাখতে পারবে বলে মনে হয় না।' জেসকে কবর দিতে যাবার সময় এক ফাঁকে ডাক্তারকে পাইলটের মৃত্যুর আসল কারণ জিজ্ঞেস করেছে রানা, আরও নিশ্চিত হতে চেয়েছে। ডাক্তারও ঠিকই বুঝেছেন শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে লোকটাকে।

বোঝা গেছে এখন, মেয়েটাই যত নষ্টের মূল। সে-ই ঘুমের ওষুধ খাইয়েছে যাত্রীদের। মেয়েটাই শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে পাইলটকে—ভাবছেন ডাক্তার। কিন্তু কেন? কেন মুখ বন্ধ করতে চেয়েছে সে জেসের? রেডিও ভাঙল কেন? বাইরের দুনিয়াকে বিমান দুর্ঘটনার কথা কেউ যেন জানাতে না পারে, সেজন্যে? কিন্তু সেক্ষেত্রে নিজে বাঁচবে কি করে সে? জানত ট্রাক্টর এবং একটা রিমোট স্টেশন আছে এখানে? জানত জাহাজ ভেড়ে এমন কোন উপকূলে পৌছার জন্যে ট্রাক্টর রয়েছে? কি করে?

ভাবনার পোকা মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে ডাক্তারের। আড়চোখে আবার শ্যারিনের দিকে তাকালেন তিনি। বোবা শূন্য দৃষ্টিতে চুলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে

মেয়েটা। ভবিষ্যতে কি করবে ভাবছে? জেসকে মারার পরিকল্পনাটা তার চমৎকার। লোকটা মরবে কি মরবে না, এজন্যেই বুঝি জানতে চেয়েছিল সে? নাকি জানতে চেয়েছিল লোকটার স্বাভাবিক মৃত্যুর সম্ভাবনা আছে কিনা? নাহ্, চমৎকার হিসেব আর বুদ্ধি মেয়েটার, আর দারুণ অভিনেত্রী। রাতে পাইলটের পাশে ছাড়া শোবে না। কেন বাবা, তোমার এত দরদ কেন? খুন করার জন্যে না?

ঘরের এক কোণে বসে ভাঙা রেডিওটা খুলছে কেভিন পোর্টার। সারানো যায় কিনা দেখছে। অন্যেরা সবাই চুল্লিটাকে ঘিরে বসে আছে। পাণ্ডুর অসুস্থ মনে হচ্ছে লোকগুলোকে। বেলা এগারোটা, বাইরে ফিকে হয়ে এসেছে অন্ধকার। স্কাই-লাইটের ফাঁক দিয়ে আসা আলোর সঙ্গে আগুনের লালচে আভা মিশে এক অদ্ভুত ভৌতিক আলোছায়ার সৃষ্টি করেছে ঘরের ভেতরে। গরম পোশাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা লোকগুলোকে কেমন যেন অপার্থিব লাগছে। গা ছমছমে পরিবেশ।

'এভাবে গুম হয়ে থেকে তো লাভ নেই, ডাক্তার সাহেব,' নীরবতা ভাঙল রানা। 'এভাবে বসে থেকে কি হবে? যাবার ব্যবস্থা করতে হয়।'

'অ্যাঁ,' চমকে মুখ তুললেন ডাক্তার। 'কিছু বললেন?'

কথাগুলো আবার বলল রানা।

'হ্যাঁ, তা তো ঠিকই বলেছেন,' অনিশ্চিত শোনাল ডাক্তারের গলা। 'কিন্তু যাবেন কি করে? কোথায়?'

'কোথায় গেলে প্লেন কিংবা জাহাজ পাব, আপনিই ভাল বলতে পারবেন। আর যাব···কেন, ট্রাক্টর আছে না একটা?'

'প্লেন তো নয়. জাহাজ পাবেন হয়তো। সেজন্যে পশ্চিম উপকূলে যেতে হবে আপনাদের। সে তো অনেক দূর, কয়েকশো মাইল।'

'কয়েকশো মাইলের ভয়ে এখানে বসে থাকলে কোনদিনই যেতে পারব না আর। ট্রাক্টরটা চলবে কিনা বলুন।'

'খেটেখুটে ইঞ্জিনটা চালু করা যেতে পারে। কিন্তু একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে। ভাল ট্রাক্টরটা নিয়ে গেছে ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার—এই স্টেশনের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড। তিন সপ্তাহের আগে ফিরবে বলে মনে হয় না।'

'তিন সপ্তাহ তো আর বসে থাকা যাবে না। ঝরঝরে ট্রাক্টরে করেই যেতে হবে আমাদের,' লেনিনগ্রাদের কথা ভাবল রানা। ডেস্ট্রয়ারের তাড়া খেয়ে পালিয়েছেন কমান্ডার রাইকভ। কোথায় কখন ভেসে উঠতে পারেন, কে জানে। ভেসে উঠলেও উদ্ধার পার্টি পাঠাতে পারবেন না, কারণ তাঁকে নাক গলাতে বারণ করেছে মস্কো। অর্থাৎ, কোন সাহায্য আসছে না কোথাও থেকে। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় বসে থাকার কোন মানেই হয় না।

'আচ্ছা, ডাক্তার ব্রাউন,' প্যাকিং বাক্সের ওপর বসে রয়েছে ওয়াকার, সামনে ঝুঁকল। 'খাবার কি পরিমাণ আছে স্টকে? এতগুলো লোক, আর কদিন চলবে বলে মনে হয়?'

'ভাল কথাই মনে করেছেন,' বললেন ডাক্তার। 'আমরা এখন মোট চোদ্দজন। পাঁচ দিন চলতে পারে। রেশন করতে হবে এখন থেকেই।'

'ট্রাক্টরে করে উপকূলে পৌঁছতে কতদিন লাগবে?'

'ঠিক বলা যায় না। আদৌ পৌঁছতে পারব কিনা, তাই বা কে জানে! তবে দিন সাতেক লাগতে পারে। অবশ্য আবহাওয়া ভাল থাকলে, আর ইঞ্জিন ঠিকমত চললে।'

'আশাও দিচ্ছেন আবার নিরাশও করছেন। ডাক্তাররা সব এক রকম,' বলল ক্লেটন। 'ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ? অন্য ট্রাক্টরটার জন্যে অপেক্ষা করলে ক্ষতি কি?'

'তাই ভাবছেন?' গম্ভীর সিনেটর। 'তা মাঝের সময়টুকু কি করে বাঁচবেন, ভেবেছেন?'

'না খেয়ে চোদ্দদিনের বেশি বাঁচতে পারে মানুষ, আর আমাদের কাছে তো পাঁচ দিনের খাবার রয়েছেই। তবে আপনার বিশেষ অসুবিধে হবে। উপোস থেকে থেকে আপনার দুধ-মাখনের শরীরটা কেমন হবে সত্যিই দেখতে ইচ্ছে করছে,' খুশি খুশি গলায় বলল ক্লেটন।

'সিনেটর ভুল কিছু বলেননি, ক্লেটন,' বলল রানা। 'সাধারণ অবস্থায় অনেকদিন না খেয়ে থাকতে পারে মানুষ। কিন্তু এখানে বেঁচে থাকতে হলে শরীরে যথেষ্ট তাপ দরকার। আর তাপের জন্য দরকার খাওয়া। ঠাণ্ডায় সাংঘাতিক দ্রুত ক্ষয় হয় শক্তি। কুমেরু, সুমেরু আর হিমালয় অভিযানের সময় কত লোক যে মারা গেছে! শুধু খাবার শেষ হয়ে যাওয়ায়। আর এই কেবিনের তাপ সম্পর্কেও বেশি নিশ্চিত হবেন না। গতরাতের কথা মনে নেই?'

'ডাক্তার ব্রাউন,' রানার কথা শেষ হতেই বলে উঠল ওয়াকার, 'আচ্ছা, আপনাদের কাছে আর কোন রেডিও নেই, না?'

'আছে একটা, ছোট। ওই ট্রাক্টরে।'

'ওটার রেঞ্জ কদ্দূর? আপনার লোকদের সঙ্গে কথা বলা যায় না?'

'ওকেই জিজ্ঞেস করুন,' স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে ব্যস্ত পোর্টারকে দেখিয়ে দিলেন ডাক্তার।

একটা স্ক্রু ঘোরাতে ঘোরাতে কথা বলল পোর্টার। নিরুৎসুক কণ্ঠ। 'ওটার ভরসা করতে পারলে কি আর এই ভাঙা জিনিস নিয়ে বসতাম? ওটা ছোট্ট ট্রান্সমিটার—ব্যাটারিতে চলে, আট ওয়াট। রেঞ্জ খুবই কম।'

'কম মানে কতখানি?' পীড়াপীড়ি করছে ওয়াকার।

'ঠিক করে বলা অসম্ভব,' স্ক্রু ঘোরানো বন্ধ করে ফিরে চাইল পোর্টার। 'রেডিও-ওয়েভ অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। খেয়াল করেছেন নিশ্চয়, কোন কোনদিন বি. বি. সি. একশো মাইল দূরে থেকেও ধরা যায় না। আবার কোনদিন হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও একেবারে পরিষ্কার, কথা শুনে মনে হয় সামনেই বসে আছে লোকটা। এর অনেক কিছুই নির্ভর করে সেট আর আবহাওয়ার ওপর। ওই রেডিওটা শ'খানেক মাইল কভার করতে পারে। ভাল আবহাওয়ায় শ'দেড়েক মাইল দূর থেকেও সিগন্যাল ধরতে পেরেছি। তবে এখন আকাশের যা অবস্থা…ঈশ্বরই জানে! বিকেলে ওটা নাড়াচাড়া করে দেখব একবার। জানি, খামোকা সময় নষ্ট।'

৮

'ধরুন আপনার বন্ধুরা রেডিওর রেঞ্জেই রয়েছেন এখন? শ'দুয়েক মাইলের ভেতরেই তো থাকার কথা, না?'

'হ্যাঁ, তাই। পেট্রোল বেশি নেই ওদের। বাধ্য না হলে বেশি ঘোরাঘুরি করবে না, কিংবা দূরে যাবে না।' ঘুরে নিজের কাজে মন দিল আবার পোর্টার।

'আচ্ছা, ডাক্তার সাহেব,' ব্রাউনকে জিজ্ঞেস করল ওয়াকার, 'এখানে তো পেট্রোল মজুত আছে, না? ফিরে এসে এখান থেকে তো নিতে পারে পেট্রোল, মানে, আমি বলছিলাম, দরকার পড়লে আর কি?'

'তা পারে। আটশো গ্যালন পেট্রোল আছে এখানে,' সুড়ঙ্গের দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ডাক্তার।

'ও,' কেমন যেন চিন্তান্বিত মনে হলো ওয়াকারকে। 'কিছু মনে করবেন না, একটু বেশি কথা বলছি। আসলে সম্ভাবনাগুলো খতিয়ে দেখতে চাই। একটা ব্রেনের চেয়ে চোদ্দটা ব্রেন অনেক বেশি সঠিক সমাধান দিতে পারবে। এমন কোন ব্যবস্থা কি নেই আপনাদের মাঝে, যাতে বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত খবর না পেলে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়তে পারে?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার। নেই।

'তার মানে একটাই পথ খোলা আছে,' হতাশা ঝরল মার্টিনের গলায়। 'হয় এখানে থেকে না খেয়ে মরো, নয়তো পালাও!'

'বাহ্, বেশ গুছিয়ে বলেছেন কিন্তু কথাটা,' বলে উঠল সিনেটর। 'আচ্ছা, মিস্টার রানা, পুরো ব্যাপারটা তলিয়ে দেখার জন্যে একটা কমিটি গঠন করলে কেমন হয়?'

'এটা আপনার ওয়াশিংটন নয়, সিনেটর,' শান্তকণ্ঠে বলল রানা, 'ওসব কমিটি আর মীটিং করে কিচ্ছু হবে না। এখানে যা বাস্তব সত্য সেটাই মেনে চলতে হবে আমাদের।'

'তাই, না?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল সিনেটর। 'কিন্তু মিস্টার রানা, আপনার মনে রাখা উচিত, পুরো ব্যাপারটাতেই আমাদের সবার স্বার্থ জড়িত রয়েছে।'

'দেখুন সিনেটর,' রানার হয়ে বললেন এবার ডাক্তার, 'জাহাজডুবি হয়ে মরার সময় অন্য কোন জাহাজের ক্যাপ্টেন যদি পানি থেকে তুলে আপনাকে বাঁচাতে চায় সে কি আপনার পরামর্শ নিয়ে কাজটা করবে? নাকি সে যা ভাল বুঝবে তাই করবে?'

'ঠিক বুঝতে পারছেন না আপনারা, ডাক্তার ব্রাউন। এটা কোন জাহাজ নয়...'

'থামুন তো,' বাধা দিল ওয়াকার। 'মিস্টার রানা ঠিকই বলেছেন। আমাদের চলেই যেতে হবে এখান থেকে।' ডাক্তারের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, যাবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছেন নিশ্চয়?'

'গতরাতেই। রিক আর আমি যাব আপনাদের সাথে। পোর্টার এখানে থাকবে, তার জন্যে সপ্তাহ তিনেকের খাবার রেখে যাব। বাকি খাবার নিয়ে কালই রওনা হয়ে যাব আমরা।'

'আজই নয় কেন?'

'কারণ ট্রাক্টরটার মেরামত দরকার। তাছাড়া যাত্রী অনেক বেশি, একটা কেবিন মত বানাতে হবে। ট্রাক্টরের পেছনে যে কেবিন রয়েছে এখন, ওটার ছাত ক্যাম্বিসের। কাঠ দিয়ে বদলে নিতে হবে ওটা। শোবার তাক বানাতে হবে, স্টোভ বসাতে হবে। সময় দরকার।'

'ওতে চড়েই যাচ্ছি তাহলে আমরা?'

'তো আর কিসে? হ্যাঁ, প্লেন থেকে দরকারী মালপত্রগুলোও নিয়ে আসতে হবে।'

'আর কখনও যে ওগুলো ফিরে পাব, ভাবতেই পারিনি,' মিসেস ডুলানী খুশি হলো কিনা, কণ্ঠস্বরে বোঝা গেল না।

'কিছু কিছু ফিরে পাবেন,' বললেন ডাক্তার ব্রাউন।

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল ডুলানী।

'সহজ। একটা এটাচি-কেসে যা আঁটে, তাই নিতে পারবেন। অবশ্য কাপড়চোপড় কিছু নিতে চাইলে, যতটা সম্ভব পরে নিতে পারেন। বোঝা একেবারেই বাড়ানো যাবে না।'

'কিন্তু হাজার হাজার পাউন্ড দামের কাপড় রয়েছে আমার সুটকেসে। একটা কোটের দামই...'

'আপনার জীবনের দাম কত, মিসেস?' হেসে জিজ্ঞেস করল ক্লেটন। 'এক কাজ করি বরং? ওই পোশাকগুলো নিয়ে আপনাকেই ফেলে যাই? কিংবা আরেক কাজ করতে পারেন। সমস্ত পোশাক গায়ের ওপর চাপিয়ে প্লেনে থেকে যেতে পারেন।'

'হাসি-মস্করার একটা সীমা থাকা উচিত,' ডুলানীর চোখ মুখ কঠিন।

'ওই আমার দোষ। রেখে ঢেকে কথা বলতে পারি না,' কৃত্রিম হতাশা মুষ্টিযোদ্ধার কণ্ঠে। রানার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, 'কোনভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি, মিস্টার রানা?'

হাঁ-হাঁ করে উঠল মার্টিন, 'তোমাকে এখানেই থাকতে হবে, ডেরি। বরফের ওপর পা পিছলে পড়ে ঠ্যাং ভাঙলে...'

'তুমি থামো তো!' ধমক দিল ক্লেটন। আবার ফিরল রানার দিকে, 'কি বলেন, মিস্টার রানা?'

'ধন্যবাদ। তা একটা ব্যাপার—কতদিন একসঙ্গে থাকতে হবে আমাদের, কে জানে। ওসব মিস্টার-ফিস্টারে অনেক ঝামেলা। তার চেয়ে যার যার নাম ধরে ডাকলে কেমন হয়? যেমন আমি, শুধু রানা; আপনি, ক্লেটন...'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন আপনি,' জবাবটা দিল ওয়াকার। একটা পারকা পরছে সে। 'আমাদের কোন আপত্তি নেই। এতে অনেক সহজ হতে পারব।'

'আপনিও আসছেন নাকি আমাদের সঙ্গে?' জানতে চাইল রানা।

'আসি। সারাদিন এখানে বসে থাকার চাইতে কিছু কাজ করলে সময় কাটবে ভাল।'

'আপনার হাত আর কপালে কিন্তু আবার ওষুধ লাগানো দরকার,' বললেন ডাক্তার।

'একবার লাগিয়েছেন, ওতেই সেরে যাবে। চলুন, যাই।'

আকাশ পরিষ্কার। বাতাস স্তব্ধ। তুষারপাতও নেই। কিন্তু ঠাণ্ডা তেমন কমেনি। দুপুর, আবছা আলোয় চারদিকে দৃষ্টি বেশ ভালই চলছে। তেরো-চোদ্দশো গজ দূরে আবছাভাবে বিমানটাকে দেখা যাচ্ছে। একটা ডানা এদিকে ফেরানো। আর ঘণ্টাখানেক পরেই দুপুরের আলো মিলিয়ে যাবে, তখন আর দেখা যাবে না ওটাকে। বিমানটাতে আবার যেতে হবে। গতরাতের মত অনেক ঘুরে আঁকাবাঁকা পথে যাবার আর কোন মানে হয় না। কেবিন থেকে বেরিয়ে এসে আগে বিমানে যাওয়াই স্থির করল রানা। আলো থাকতে থাকতে যাওয়াই সুবিধে।

ক্লেটন আর ওয়াকারকে কাজে লাগিয়ে দিল রানা। কেইনগুলো তুলে এনে কেবিন থেকে সরাসরি বিমান পর্যন্ত আবার গাঁথার নির্দেশ দিল। এতে রাস্তা অনেক কমে যাবে।

খুব দ্রুত কাজ শেষ করে ফেলল ক্লেটন আর ওয়াকার।

পরের কয়েক ঘণ্টা আবহাওয়া কেমন থাকবে, পরীক্ষায় মন দিলেন ডাক্তার। কুকুর আর স্লেজ আনতে গেল ব্যারি। ওয়াকার আর ক্লেটনকে নিয়ে বিমানের ভেতরে এসে ঢুকল রানা।

কবরের অন্ধকার আর শীতলতা বিমানের ভেতরে। পুরো বিমানটার গায়েই তুষারের পুরু প্রলেপ। জানালা-দরজাগুলোও ঢেকে গেছে, ওগুলোর অস্তিত্ব পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে না। ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়ায় কেবিনের ম্লান নীল আলোটাও জ্বলছে না এখন আর।

তিনজনের হাতেই টর্চ।

'গড!' কেঁপে উঠল ক্লেটন। ঠাণ্ডায় নয়। টর্চের আলো পড়েছে কো-পাইলটের ওপর। 'কি সাংঘাতিক! রানা, একে কি এখানেই ফেলে যাব?'

'মানে?'

'সেকেন্ড অফিসারকে তো কবর দিলাম। একে...'

'দরকার নেই। সেকেন্ড অফিসারের চেয়ে এর কবর আরও ভাল হবে। আগামী ছয় মাসের মধ্যেই বরফের তলায় পুরো চাপা পড়ে যাবে প্লেনটা। চিহ্নও থাকবে না আর। চলুন, কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি বাইরে চলুন।'

টর্চের আলোয় পথ দেখে এগিয়ে গেল ওরা। আগে আগে চলেছে ওয়াকার। কেবিনে ঢুকে প্রথমেই নিজের সীটের পাশে ফেলে রাখা ছোট সুটকেসটার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। সুটকেসটা খুলতে খুলতে বলল, 'রানা, একটা রেডিও আছে আমার কাছে। ছোট, কিন্তু কাজ দেবে।'

'আগে বলেননি কেন?'

'বলিনি...' সুটকেস খুলে রেডিওটা বের করল ওয়াকার। হাতে তুলে নিয়ে নব ঘোরাল। কোন সাড়া নেই। কানের কাছে নিয়ে ঝাঁকুনি দিল বার কয়েক। আবার

নব ঘোরাল। চোখ মুখ কালো হয়ে গেছে ওয়াকারের।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল রানা।

'গেছে। ঝাঁকুনি খেয়ে বালবের বারোটা বেজে গেছে মনে হয়। এক হাজার ডলারে কিনেছিলাম, মাত্র দুদিন আগে। খুবই ভাল জিনিস ছিল।'

'এক হাজার ডলার!' শিস দিয়ে উঠল রানা। 'সঙ্গে নিয়ে নিন। পোর্টারের কাছে বাড়তি বালব থাকতে পারে।'

'থাকবে না। একেবারে লেটেস্ট মডেল এটা।'

'তবুও নিন। যদি পাওয়া যায়!' কান পেতে কি শুনল রানা। রোল্টার চিৎকার চিনতে পারল। 'ওই যে, রিক এসে গেছে। আসুন, যা যা নেবার, গুছিয়ে নিই।'

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেবিনে নিয়ে যেতে দু'বার যাতায়াত করতে হলো ওদের। আবার বাতাস বইতে শুরু করেছে। গ্রীনল্যান্ডের আবহাওয়ার কোন স্থিরতা নেই, এখন এরকম, কয়েক মিনিট পরেই আরেক রকম। দক্ষিণমুখো বইছে বাতাস, নাকেমুখে এসে ঝাপটা মারছে। রানার মনে হলো, কোন ধরনের অশুভ বার্তা নিয়ে এসেছে এই বাতাস।

হাড়ের ভেতরটা পর্যন্ত যেন কাঁপছে ওদের। থরথর করে কাঁপছে ওয়াকার। নাকের ডগা আর একটা গাল ফ্রস্টবাইটের আক্রমণে সাদা হয়ে গেছে। কেবিনে ঢুকেই হাত থেকে দস্তানা টেনে খুলে ফেলল সে। ফ্যাকাসে হয়ে গেছে হাতের চামড়া।

'আধ ঘণ্টায়ই এই অবস্থা!' রানার দিকে তাকিয়ে বলল ওয়াকার।

'আরও কম সময়ে এর চেয়েও খারাপ হতে পারে।'

'তাহলে সাত দিন সাত রাত খোলা আকাশের নিচে কি করে কাটাব আমরা! অসম্ভব! নির্ঘাত মারা পড়ব। তাছাড়া মেয়েদের কথা ভাবুন, বৃদ্ধা গিলবার্ট, সিনেটর, শরাফী...' কথা শেষ না করেই মুখ কোঁচকাল ওয়াকার। হাতে রক্ত চলাচলের যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। বার দুয়েক হাত ঝাড়া দিয়ে আবার বলল, 'আসলে আত্মহত্যা করতে চলেছি আমরা, রানা।'

'আসলে একটা বাজি ধরতে যাচ্ছি,' শুধরে দিল রানা। 'এখানে না খেয়ে বসে থাকাটাই বরং আত্মহত্যার সামিল। আমরা চেষ্টা করছি বাঁচতে।'

মৃদু হাসল ওয়াকার। 'কথা ঠিকই বলেছেন...'

ট্রাক্টরের কাজ শুরু করার আগে দুপুরের খাওয়া সেরে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন ডাক্তার। রাজি হলো রানা।

এক বাটি করে মাংসের ঝোল আর খানকয়েক বিস্কুট দিয়ে লাঞ্চ সারা হলো। হিমশীতল আবহাওয়ায় শরীরে উত্তাপ আর শক্তির জন্যে এই খাবার সাংঘাতিক রকম কম। কিন্তু উপায় নেই। উপকূলে পৌঁছতে হলে এখন থেকেই রেশন করা দরকার।

দ্রুত নেমে যাচ্ছে তাপমাত্রা। তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে আবার। বাতাসের গতি বাড়ছে। কেবিন থেকে বেরোলেন ডাক্তার, সঙ্গে রানা এবং পুরুষেরা সবাই। মেয়েরা রয়ে গেল কেবিনে।

ট্রাক্টর শেডে সবাইকে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। এগিয়ে গিয়ে ট্রাক্টরের ওপরে বিছানো তেরপল ধরে টানাটানি শুরু করলেন। ঠিক ছিঁড়ল না, ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়ল যেন তেরপলটা। আবছা অন্ধকারে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না ট্রাক্টর। আলো জ্বালতে হলো।

'যাদুঘর থেকে তুলে এনেছেন নাকি?' কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে ওয়াকার। 'নাকি সেই তুষার যুগ থেকেই পড়ে আছে এটা এখানে!'

'একটু পুরানোই জিনিসটা,' স্বীকার করলেন ডাক্তার। 'তবে এটাই এখন আমাদের একমাত্র সম্বল। রাশিয়া বা আমেরিকার মত দরাজ দিল নয় ব্রিটিশ সরকার, জানেনই তো।'

'এর আগে দেখিনি এই মডেল। কোন্ দেশী?'

'ফরাসী। সিত্রোঁ টোয়েন্টি হর্স পাওয়ার। দেখতে ছোট, কিন্তু বেশ ভারী। তবে তুষার ফাটল পেরোতে পারে ভালই। বেশি বড় ফাটল হলে অবশ্য—সে যাই হোক, এই আছে আমাদের।'

চুপ করে গেল জন ওয়াকার। দুনিয়ার সেরা ট্রাক্টর কোম্পানিগুলোর একটার প্রধান কর্মকর্তার এরপর আর কিই বা বলার থাকে? তবে দেখে তেমন হতাশ মনে হলো না তাকে। পরের কয়েক ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রম করে গেল সে, সঙ্গে রুটিন।

কাজ শুরু করার পাঁচ মিনিটের ভেতরই আবার থেমে যেতে হলো। বাতাস আর তুষারের জন্যে কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ব্যবস্থা করলেন ডাক্তার। তিনদিকে বরফের দেয়াল, একদিক খোলা। অ্যালুমিনিয়মের খুঁটি গেড়ে তাতে ক্যানভাসের চাদর টাঙানো হলো। কিন্তু বাতাসের আক্রমণ থেকে পুরোপুরি রেহাই পাওয়া গেল না। পুরু পোশাক ভেদ করেও চামড়ায় বিঁধছে বাতাসের তীক্ষ্ণ দাঁত। ঠাণ্ডায় টিস্যু কাগজের মত শক্ত খচখচে হয়ে উঠেছে গায়ের জবড়জঙ্গ পোশাক। কাজ করতে ভীষণ অসুবিধে।

ক্যানভাসের পর্দার আড়ালে একটা স্টোভ এনে বসিয়ে দিল ব্যারি। একটু তাপ!—গায়ে লাগুক আর নাই লাগুক, চিন্তা করতেও ভাল লাগে। বাতাসের মাঝেও ব্যবহারের উপযোগী দুটো ব্লো-টর্চ আনা হয়েছে, কাজ চলছে খুব ধীরে। মাঝে মাঝেই গিয়ে স্টোভের আগুনে হাত সেঁকে নিচ্ছে সবাই। একনাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে ওরা ক'জন। বল্গা হরিণের চামড়ার ভারী পোশাক পরে কাজ করতে অসুবিধে হচ্ছে ব্যারির, কিন্তু উপায় নেই।

ট্রাক্টরে রাখা ট্রান্সমিটারটা খুলে নিয়ে সেই যে কেবিনে ঢুকেছে পোর্টার, আর বেরোচ্ছে না। ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে করে হাল ছেড়ে দিয়েছে। আর সি এ যন্ত্রটা নিয়ে পড়েছে এখন আবার। গভীর মনোযোগে কাজ করে চলেছে, সারাবার চেষ্টা করছে।

ট্রাক্টরের পেছনে ক্যানভাসের হুড। ওটা খুলতে খুবই কষ্ট হলো। চার মাস একটানা বরফে পড়ে থেকে থেকে লোহার মত শক্ত হয়ে গেছে ক্যানভাস। নাটগুলো ব্লো-টর্চের আগুনে গরম করে খুলে ক্যানভাস সরাতে এক ঘণ্টা খরচ হয়ে

গেল।

এর পরের কাজ আরও কঠিন। পনেরোটা তক্তা পরপর বসিয়ে তৈরি করতে হবে কাঠের হুড। পেছনের খালি জায়গা বন্ধ করতে হবে ক্যানভাস দিয়ে। অসহ্য ঠাণ্ডা আর আবছা অন্ধকারে কাঠের তক্তা এনে লোহার ফ্রেমে বল্টু দিয়ে আটকানো, সে এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তক্তা দিয়ে শুধু মেঝে ঢাকার মত সহজ কাজটা করতেই এক ঘণ্টার বেশি লেগে গেল। মাঝরাতের আগে কাজ শেষ করা যাবে না এভাবে এগোলে, আন্দাজ করল রানা। হঠাৎই মনে পড়ল কথাটা। এত কষ্ট করার কি দরকার? কেবিনে বসে তক্তাগুলো জোড়া লাগানোর কাজটা করলেই তো পারে। পরে জোড়াগুলো এনে শুধু লোহার ফ্রেমে জায়গামত বসিয়ে দিলেই হলো।

এরপর দ্রুত এগিয়ে চলা। কেবিনের উষ্ণতা আর আলোয় বসে কাজ করে পাঁচটা নাগাদই শেষ হয়ে গেল তক্তা জুড়ে বেড়া বানানোর কাজ। আর বেশি বাকি নেই, এই চিন্তায় কাজের ক্ষমতা আর উদ্দীপনা আরও যেন বেড়ে গেল সবার। একদল মানুষ, এদের বেশির ভাগই কায়িক পরিশ্রমে অনভ্যস্ত। তবু, অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছে ওয়াকার আর ক্লেটন। হাঁপ ধরে যাচ্ছে, কিন্তু জিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন না ডাক্তার ব্রাউন। কাজের ফাঁকে ফাঁকেই উঠে গিয়ে আবহাওয়ার অবস্থা পরীক্ষা করে আসছেন। ছোটখাট বৃদ্ধ ফিলিস্তিনীও পিছিয়ে নেই। তার ধৈর্য দেখে সত্যিই অবাক হলো রানা। চোখে ভারী লেন্সের রিমলেস চশমা এঁটে অক্লান্ত পরিশ্রম করছে লোকটা। সিনেটর ম্যাক্সওয়েল, রেভারেন্ড নিউবোল্ড আর টম মার্টিনও তাদের সাধ্যমত করছে।

আরও বেড়েছে ঠাণ্ডা। কেবিনে বসেই থর থর করে কাঁপছে ওরা। ঘরের কাজ শেষ। বাইরে বেরোতে হবে এবার। ট্রাক্টরের কেবিনের ফ্রেমে কাঠের বেড়া লাগাতে হবে।

অকল্পনীয় ঠাণ্ডা, ঝড়ো বাতাস আর তুষারপাতের মধ্যে কাজটা প্রথমে অসম্ভবই মনে হলো। অনেক কাজ আছে যেগুলো দস্তানা পরে করা যাচ্ছে না, খুলতে হচ্ছেই। ফলে রানা আর ব্যারির হাতের অবস্থা কাহিল। অনবরত ধাতুর সংস্পর্শে ঠাণ্ডার ছ্যাঁকা লেগে আঙুলের চামড়া ফেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বেরিয়েই জমে যাচ্ছে, তার ওপর জমা হচ্ছে পেঁজা তুলোর মত বরফ।

ফ্রেমের বাইরের দিকটা কাঠের বেড়ায় ঢেকে ভেতরে ক্যানভাসের আস্তরণ লাগানো হলো। চারটে ঘুমোবার তাকও বসানো হলো তিন দিকের দেয়াল ঘেঁষে। স্টোভ বসানোর বন্দোবস্ত করছে, এমন সময় রানার নাম ধরে বাইরে থেকে ডেকে উঠলেন সুসান গিলবার্ট।

তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল রানা। 'এখানে কি করছেন?' উৎকণ্ঠা ঝরল তার কণ্ঠে। 'ঠাণ্ডায় ক্ষতি হবে তো। যান, জলদি কেবিনে যান।'

'আজ নাহয় কাল, ঠাণ্ডা তো সহ্য করতেই হবে। তা, দু'এক মিনিটের জন্যে একটু কেবিনে আসবে, রানা?'

'কেন?' একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞেস করল রানা।

'শ্যারিন…শ্যারিনের কথা বলছিলাম…'

'কি হয়েছে তার?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'নতুন কিছু না। কিন্তু পিঠের ব্যথায় বড় কষ্ট পাচ্ছে মেয়েটা।'

'তা আমি কি করব?' বুঝতে পারছে না রানা। 'ডাক্তার ব্রাউনকে বলুন। আমি তো আর ডাক্তার নই।'

আসলে ডাক্তারকে সহ্য করতে পারছে না মেয়েটা, কিংবা লজ্জাও হতে পারে। ডাক্তারও অবশ্য ওর সঙ্গে ভাল ব্যবহার করছে না। সে যাই হোক, ডাক্তারকে কিছুতেই পিঠ দেখাবে না সে।'

'আমাকে দেখাবে ভাবছেন কেন? আমিও তো পুরুষ।'

'তোমাকে দেখানোর কথা বলছি না আমি। যদি একটু বলে কয়ে রাজি করাতে পারো… কেন যেন মনে হচ্ছে তোমার কথা ফেলতে পারবে না সে।'

'আপনার তাই মনে হয়?' মৃদু হাসল রানা।

'সামনেই প্রশংসা করে ফেলছি, রানা,' হাসলেন সুসান। 'কিন্তু কি যেন একটা রয়েছে তোমার মধ্যে, ঠিক বলে বোঝাতে পারব না। আমি বলছি রানা, তুমি জোর করলে পিঠ দেখাতে রাজি হবে শ্যারিন।'

এক মুহূর্ত সুসানের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। অন্ধকারে অভিনেত্রীর মুখ দেখা যাচ্ছে না, শুধু আবছা একটা অবয়ব। কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর বলল, 'ঠিক আছে, চলুন।' বলে ট্রাক্টরের দিকে ফিরে ডেকে বলল, 'রিক, আমি আসছি পাঁচ মিনিট।' সুসানের দিকে ফিরল। 'চলুন।'

চুলো ঘিরে বসে আছে মেয়েরা। ইনস্ট্রুমেন্টস টেবিলে কি একটা কাজে মগ্ন ক্যাপ্টেন। আর সি এ রেডিও নিয়ে এখনও কাজ করে চলেছে পোর্টার।

কেবিনে ঢুকে সোজা চুলোর দিকে এগিয়ে গেল রানা। ফোস্কা পড়া রক্তাক্ত হাত দুটো চুলোর আগুনে গরম করে নিল। পাশেই সুসান। রানার হাতের অবস্থা দেখে চোখ বড়বড় হয়ে গেছে তার। প্যাকিং বাক্সে বসে শ্যারিনও দেখল। সেদিকে তাকাল রানা। হাসল। 'কি হলো, পিঠ দেখাচ্ছেন না কেন? রোগ হলে ডাক্তারকে না দেখালে চলে নাকি?'

সুসান গিলবার্ট ঠিকই অনুমান করেছেন, বার তিনেক বলতে হলো, কিন্তু রানার কথায় শেষ পর্যন্ত ডাক্তারকে পিঠ দেখাতে রাজি হলো শ্যারিন। ঘরের এক কোণে একটা কম্বল টাঙিয়ে পর্দা করে দিল রানা। ওর ভেতরে সুসানের সামনে শ্যারিনের পিঠের জখমটা দেখলেন ডাক্তার। সত্যিই খারাপ অবস্থা। পিঠের বাঁ দিকে ওপরের অংশে কয়েক ইঞ্চি পর্যন্ত বিচ্ছিরি রকম ফুলে আছে। নীল হয়ে গেছে জায়গাটা। কাঁধের হাড়ের ঠিক নিচে জখম বেশি, কেটেও গেছে খানিকটা। ভোঁতা কোন পাতলা ধাতব কোন জিনিসের আঘাতে এই জখম হয়েছে, অনুমান করলেন ডাক্তার।

'গতকাল এটা দেখালেন না কেন?' ঠাণ্ডা গলায় প্রশ্ন করলেন ব্রাউন।

'আমি…আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি,' কাঁপা কণ্ঠে বলল শ্যারিন।

বিরক্ত করতে চাওনি, না?—ভাবলেন ডাক্তার। নাকি নিজেকে ধরিয়ে দিতে

চাওনি? আঘাতটা কোন্ ঘরে পেয়েছ? প্যান্ট্রিতে? দাঁড়াও, আগে প্রমাণটা নিজের চোখে দেখে নিই। তারপর তোমাকে প্যাঁদানি দিতে পারব আচ্ছামত। মিথ্যুক, খুনী কোথাকার!...ভাবছেন, কিন্তু হাত ঠিকই চলছে তাঁর।

'খুব খারাপ?' ঘাড় বাঁকিয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল শ্যারিন। চোখের কোণে পানি। জীবাণুনাশক ওষুধ জোরে জোরে ক্ষতস্থানে ঘষছেন ডাক্তার কোনরকম মায়া দয়া না করে। সাংঘাতিক ব্যথা পাচ্ছে মেয়েটা।

'খারাপই। তা কি করে ব্যথা পেলেন?'

'বুঝতে পারছি না,' অনিশ্চিত শোনাল শ্যারিনের গলা। 'সত্যিই, কিচ্ছু জানি না আমি।'

'আমি বোধহয় জানতে পারব,' গম্ভীর ডাক্তার।

'জানতে পারবেন? কি করে?' বিষণ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল শ্যারিন। 'আর জেনেই বা কি হবে?'

'হবে, হবে...' গলায় রহস্য ঢাললেন ডাক্তার। মনে মনে বললেন, দারুণ অভিনয় জানো তুমি সুন্দরী! দ্রুত হাত চালালেন ব্রাউন।

শ্যারিনের জখমে ওষুধ লাগানো শেষ করেই সোজা দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। স্নো-মাস্ক আর গগলসটা হুক থেকে তুলে নিয়ে পরলেন। চোখ তুলে চাইল পোর্টার। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

'আমি আসছি, কেভিন,' ফিরে বললেন ডাক্তার। 'আবহাওয়ার অবস্থাটা দেখে আসি।'

প্রবল তুষারপাত শুরু হয়েছে। ঝড়ো বাতাসে ঘন হয়ে ভাসছে বরফ-কণা। টর্চের আলোর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তুষারের পর্দা। কয়েক হাত দূরের জিনিসও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না।

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকে এগিয়ে চলেছেন ডাক্তার। পেছন থেকে এসে পিঠে ঝাপটা মারছে বাতাস। এক-একটা কেইনের মাঝের দূরত্ব বেশি না। তবুও টর্চের আলোয় এক সঙ্গে দুটো কেইন দেখা যাচ্ছে, তার বেশি না। ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছেন ডাক্তার। পিচ্ছিল বরফ, ঠাণ্ডা আর বাতাস বাধা দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু কেইন দেখে দেখে বিমানের কাছে পৌঁছে যেতে বেশি কষ্ট হলো না তাঁর।

বিমানের ভাঙা উইন্ডব্রেকারের নিচে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। টর্চের আলো ওপরের দিকে ফেলে একবার দেখে নিলেন ঠিক কোথায় আছে জানালার ফ্রেমের তলার দিকটা। তারপর টর্চটা পকেটে রেখে ওপরের দিকে হাত বাড়িয়ে লাফ দিলেন। বার চারেকের চেষ্টায় ফ্রেমের ধারটা ধরে ফেললেন। অনেক চেষ্টায়, অনেক কসরৎ করে কোনমতে এসে কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকলেন।

প্রথমেই প্যান্ট্রিতে এসে ঢুকলেন ডাক্তার। বেশ বড়সড় একটা রেফ্রিজারেটর। ওটার সামনে একটা ছোট টেবিল, হিঞ্জের ওপর বসানো। একপাশে জানালা। জানালার নিচে একটা বাক্সের ওপর তরল পদার্থ গরম করার একটা ইলেকট্রিক প্যান জাতীয় কিছু। কিন্তু এসব জিনিসের প্রতি মনোযোগ নেই ডাক্তারের। ঘরের

চারপাশের দেয়ালে আলো ফেলে ফেলে পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু না, কোথাও নেই জিনিসটা। ধাতব কোন কিছু বেরিয়ে নেই দেয়ালে, যাতে আঘাত লেগে শ্যারিনের পিঠে জখম হতে পারে। তার মানে বিমানটা ভেঙে পড়ার সময় এঘরে ছিল না স্টুয়ার্ডেস। তাহলে কোথায় ছিল? আপন মনেই মাথা নাড়লেন ডাক্তার।

সরু প্যাসেজ বেয়ে এসে রেডিওরুমে ঢুকলেন তিনি জিনিসটা কোথায় পাওয়া যেতে পারে, আগেই অনুমান করে নিয়েছেন ধাতব রেডিও ক্যাবিনেটের বাঁ দিকের কোণ ঘেঁষে বেরিয়ে আছে এক চিলতে পাতলা ধাতুর পাত, আগাটা সামান্য বেঁকে রয়েছে। কাছে গিয়ে ভালমত পরীক্ষা করলেন ডাক্তার আঁকশির মত বেঁকে রয়েছে ধাতুর পাতের আগাটা, তাতে হালকা খয়েরী রঙের একটা প্রলেপ। কয়েক গাছি ঘন নীল সুতোও আটকে আছে। খয়েরী প্রলেপটা কিসের, জানার জন্যে ফোরেনসিক বিশেষজ্ঞের দরকার নেই। আর নীল সুতো কোন কাপড় থেকে এসেছে, এটাও অনুমান করতে কষ্ট হলো না। আরও বুঝলেন তিনি, অ্যাক্সিডেন্টে ঝাঁকি খেয়ে নষ্ট হয়নি রেডিওটা। আসলে নিপুণ দক্ষ হাতে ভাঙা হয়েছে ওটাকে।

অন্ধকার ঠাণ্ডা একটি কফিনের মত মনে হচ্ছে বিমানের ভেতরটা ভাবনাগুলো একসঙ্গে এসে ভিড় করল ডাক্তারের মনে রেডিও ভাঙা, কাজেই কোনরকম বিপদ সঙ্কেত নিশ্চয় পাঠাতে পারেনি পাইলট। কিন্তু এই এলাকায় বিমান নিয়ে এসেছে কেন সে? নিশ্চয়ই বাধ্য হয়েছে। কে বাধ্য করেছে? কি করে? পিস্তল… পিস্তলের কথা মনে পড়তেই মনের পর্দায় ছবি ভেসে উঠল ডাক্তারের, পিস্তল হাতে পাইলটের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে শ্যারিন। আরও একটা কথা মনে পড়ল আচমকাই। বিমানের চাকা যখন বরফ ছোঁয়, পাইলট জ্যান্তই ছিল চালকশূন্য কোন বিমান এভাবে ল্যান্ড করতে পারে না। বিমান নামানোর পর মারা গেছে চালক।

হঠাৎই টান টান হয়ে উঠল ডাক্তারের স্নায়ুগুলো। রেডিওরুম থেকে বেরিয়ে এসে ঢুকলেন কন্ট্রোল কেবিনে। পাইলটের গায়ে টর্চের আলো ফেললেন। তেমনি বসে আছে মৃত লোকটা, লোহার মত কঠিন হয়ে গেছে দেহ। এগিয়ে গিয়ে লাশের শার্টটা তলার দিক থেকে টেনে ওপরে তুললেন ব্রাউন। ডাক্তার তিনি, জখম সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নন। পিঠের বামপাশে হৃৎপিণ্ড বরাবর ছোট গোল একটা গর্ত। কালো হয়ে আছে গর্তের ধারগুলো। নিচু হয়ে গর্তের কাছটা শুঁকে দেখলেন ডাক্তার। বারুদের গন্ধ এখনও রয়েছে। ঠিক এটাই আশা করেছিলেন তিনি। কিন্তু তবু মুখ শুকিয়ে গেল, গলা শুকিয়ে কাঠ। ধড়াস ধড়াস লাফাচ্ছে কলজেটা।

পাইলটের শার্টটা আবার নামিয়ে দিলেন ডাক্তার। থেঁতলে যাওয়া কো-পাইলটের মৃতদেহটা পরীক্ষা করার ইচ্ছে হলো না। তবে স্টুয়ার্ডেসের সেই ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সকে একবার দেখতে হবে। প্যাসেঞ্জার কেবিনে গিয়ে ঢুকলেন তিনি।

আগের জায়গায়ই মাথা নুইয়ে বসে আছে লোকটা। আরও কতযুগ

একইভাবে থাকবে, কে জানে! তুষারে সামান্যই নষ্ট হবে মৃতদেহ, এমনি করে একই জায়গায় বসে থাকবে ক্যাপ্টেন অনেক অনেক দিন!

বুকখোলা জ্যাকেট পরে আছে ক্যাপ্টেন। গোটাছয়েক বোতামের মাত্র একটা আঁটা। ওটা খুলতেই দু'দিকে সরে গেল জ্যাকেটের সামনের দুই পাশ। অদ্ভুত আকৃতির পাতলা একটা চামড়ার ফিতে চোখে পড়ল ডাক্তারের. ক্যাপ্টেনের বুকের মাঝে আড়াআড়ি সেঁটে রয়েছে। সাদা শার্টের বুকে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর খয়েরী দাগ। ছোট একটা ফুটো। শুঁকতে হলো না, পোড়া দাগ দেখেই যা বোঝার বুঝে নিলেন ডাক্তার। ক্যাপ্টেনের ঘাড়ের কাছটায় টিপে দেখলেন। ভারটেব্রা ভাঙা। ভেঙে দিয়েছে কেউ। না, কোন কিছুর আঘাতে নয়, খালি হাতে মুচড়ে। কেন? অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে, এইরকম বোঝানোর জন্যে?

চামড়ার ফিতের একটা দিক পিঠ ঘুরে এসেছে। অন্যটা বুকের ওপর দিয়েই এসে শেষ হয়েছে একটা চামড়ার খাপে। বাঁ বগলের তলায় রয়েছে খাপটা। একটা কালো বাঁট বেরিয়ে রয়েছে খাপ থেকে। পিস্তলটা তুলে আনলেন ডাক্তার। চ্যাপ্টা নল। টেপাটেপি করতেই ম্যাগাজিনটা খুলে এল। আটটা গুলিই রয়েছে। অর্থাৎ এটা ব্যবহারের সুযোগ পায়নি ক্যাপ্টেন। গুলি ভরে ম্যাগাজিনটা আবার জায়গামত বসিয়ে পিস্তলটা খাপে রাখতে গেলেন তিনি, তারপর কি মনে করে নিজের পারকার পকেটে পুরলেন।

ক্যাপ্টেনের পকেট হাতড়ে আইডেনটিটি কার্ড পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সিক্রেট সার্ভিসের লোক, M16 । পকেটে পাসপোর্ট রয়েছে, তাতে নাম লেখা: ক্যাপ্টেন ফিলিপ ব্রায়ার্স। মানিব্যাগে কিছু আমেরিকান আর ব্রিটিশ নোট। ব্যাগের ভেতরের দিকের পকেট থেকে বেরোল একটা ছোট্ট টুকরো কাগজ, পত্রিকার পাতা থেকে কেটে নেয়া সানডে টাইমস পত্রিকা, দিন পনেরো আগের। একজন মহিলার ছবির নিচে ছোট্ট খবর।

টর্চের আলোয় কাগজের লেখা পড়লেন ডাক্তার:…অজ্ঞাত আততায়ীর হাতে নিহত হয়েছেন প্রফেসর রবার্ট ব্রিমনের স্ত্রী। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, রাতের বেলা ঘেরাও করে একদল লোক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে প্রফেসরের বাড়ি। মিসেস ব্রিমনের পোড়া লাশ পাওয়া গেছে ধ্বংসস্তূপের মধ্যে। কিন্তু পোস্টমর্টেম রিপোর্ট বলছে, পুড়ে মরেননি তিনি, গুলি খেয়েছেন। সাব-মেশিন গানের গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে বুক। প্রফেসরের লাশ পাওয়া যায়নি। আশঙ্কা করা হচ্ছে কিডন্যাপ করা হয়েছে তাঁকে। জোর পুলিসী তদন্ত চলছে। কারা এভাবে নিরীহ একজন…

কি ভেবে কাগজটাও ভাঁজ করে পারকার পকেটে রাখলেন ডাক্তার। এ রহস্যের সমাধান করতে হলে শ্যারিনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। এই সময় কেবিনের দরজায় আওয়াজ হলো খুট করে। চমকে আলো ফেললেন ডাক্তার দরজায়। স্যাঁৎ করে সরে গেল ছায়ামূর্তিটা। টর্চ হাতে দ্রুত ছুটে এলেন ডাক্তার, কিন্তু ধরতে পারলেন না। তার আগেই উইন্ডব্রেকার গলে বাইরের বরফে নেমে গেল মূর্তিটা। ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একই ভাবে রেডিওটা নিয়ে কাজ করছে পোর্টার. ডাক্তার কেবিনে ঢুকতেই চোখ তুলে তাকাল। তারপর আবার কাজে মন দিল। চুলোর পাশে জড়ো হয়ে বসে আছে চারজন মহিলা। গায়ে পারকা, তাতে বরফের কণা লেগে আছে—আগুনে হাত সেঁকছে শ্যারিন।

'কি ব্যাপার. মিস ক্যাম্পবেলের খুব ঠাণ্ডা লাগছে মনে হচ্ছে?' কর্কশ কণ্ঠে বললেন ডাক্তার।

'ঠাণ্ডা না লাগার কোন কারণ নেই, ডাক্তার ব্রাউন.' ডাক্তার ব্রাউন. শব্দ দুটোর ওপর জোর দিলেন সুসান গিলবার্ট। 'পনেরো মিনিট ধরে বাইরে ছিল মেয়েটা।'

'বাইরে? কেন?'

'ট্রাক্টরের কাজে সাহায্য করেছে ওদের।'

'ও আবার কি সাহায্য করল?'

'কফি সাপ্লাই করেছি.' বলল শ্যারিন। 'নিশ্চয় কোন দোষ হয়নি?'

'না না, দোষ হবে কেন? খুব ভাল কাজ করেছেন,' বলে মাস্ক খুলে হাত দিয়ে মুখ ঘষতে লাগলেন ডাক্তার। তারপর পোর্টারকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঢুকলেন টানেলে।

বিমানে গিয়ে কি কি দেখেছেন সব পোর্টারকে খুলে বললেন ডাক্তার। চোখ বড় বড় হয়ে গেল রেডিওম্যানের। ভুরু কোঁচকাল, তারপর বলল. 'নাহ্. কিচ্ছু মাথায় ঢুকছে না! কি যে শুরু হলো! এদিকেও সব উদ্ভট কাণ্ড কারখানা…'

'এদিকে আবার কি হলো?'

'রেডিওর কিছু স্পেয়ার খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু তাই নয়। পার্টসগুলোর পাশে রাখা এক্সপ্লোসিভগুলোও ঘাঁটাঘাঁটি করেছিল কেউ।'

'এক্সপ্লোসিভ!' হঠাৎই মনে হলো ডাক্তারের, ট্রাক্টরের তলায় জেলিগনাইট রেখে বিস্ফোরণ ঘটাতে চাইছে না-তো কেউ! পোর্টারের চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কটা খোয়া গেছে?'

'মজাটা তো, স্যার, ওখানেই, একটাও খোয়া যায়নি। গুনে দেখেছি আমি। জিনিসগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করে গেছে শুধু কেউ… ফিউজ এক্সপ্লোসিভ…সব।'

'বিকেলে কে কে ঢুকেছিল টানেলে?'

'সবাই ঢুকেছে,' শ্রাগ করল পোর্টার। 'বাথরুমে যাওয়া তো কারও আটকাতে পারি না।' থেমে কি ভাবল সে। তারপর বলল, 'আর দেরি করা উচিত না। হারামজাদীকে ধরে এক্ষুণি…'

'দাঁড়াও, আর একটু প্রমাণ বাকি আছে, নিয়ে নিই…তারপর…' দাঁতে দাঁত চাপলেন ব্রাউন।

টানেল থেকে বেরিয়ে সোজা স্টুয়ার্ডেসের কাছে এসে দাঁড়ালেন ডাক্তার। 'একটা কথা ভুলে গিয়েছিলাম, মিস ক্যাম্পবেল। প্লেনের প্যান্ট্রিতে নিশ্চয় খাবার আছে? কতটা আছে?'

'প্যান্ট্রিতে?' চোখ তুলে তাকাল শ্যারিন। 'সামান্য। শুধু বিকেলের নাস্তার জন্যে তো…খুব বেশি খাবার সঙ্গে নেয়ার দরকার ছিল না।'

হুঁ, তবে খুব বেশি কফির দরকার ছিল, ভাবলেন ডাক্তার।

'যেটুকু আছে, সেটুকুও নষ্ট করা উচিত নয় চলুন না আমার সঙ্গে, খাবারটা নিয়ে আসি?'

'পরে গেলে হয় না?' সুসানের গলায় প্রতিবাদের সুর। 'দেখছেন না শীতে কেমন কাবু হয়ে গেছে মেয়েটা? তাছাড়া পিঠে ব্যথা…'

'কাবু তো আমরাও কম হচ্ছি না,' সুসানের সঙ্গে এভাবে কথা বলার ইচ্ছে ছিল না ডাক্তারের, তবু বলে ফেললেন। শ্যারিনের দিকে ফিরলেন, 'আসবেন নাকি, মিস ক্যাম্পবেল?'

এক বিন্দু কমেনি তুষারপাত, বাতাস আরও বেড়েছে। পিচ্ছিল বরফে ভালমত হাঁটতে পারছে না শ্যারিন। প্রায় ধরে ধরেই বিমানের কাছে আনতে হলো তাকে। উইন্ডব্রেকারের নিচে দাঁড়িয়ে ওপরে টর্চের আলো ফেললেন ডাক্তার। নির্দেশ দিলেন, 'উঠুন। আগে আপনি।'

'আ…আমি!' ডাক্তারের দিকে ঘুরে দাঁড়াল শ্যারিন। অবাক হয়েছে। 'কি করে উঠব?'

'কেন, একটু আগে যেভাবে উঠেছেন,' কঠিন গলায় বললেন ডাক্তার। 'লাফান, লাফিয়ে উঠে পড়ুন।'

'একটু আগে যেভাবে…' কথাটা শেষ না করেই ডাক্তারের মুখের দিকে তাকাল শ্যারিন। অন্ধকারে দেখা গেল না মুখ। ফিসফিসিয়ে বলল, 'কি বলছেন আপনি…!' বাতাসে অস্পষ্ট হয়ে গেল কথা।

'শিগ্‌গির লাফ মারুন,' হিসিয়ে উঠলেন ডাক্তার।

ফিরে দাঁড়াল শ্যারিন। ওপরের জানালার দিকে তাকাল। লাফ দিল। জানালার ফ্রেমের নিচ থেকে অন্তত ইঞ্চি ছয়েক দূরে রইল তার আঙুল। আবার চেষ্টা করল। এবারেও সেই একই অবস্থা। তৃতীয়বারের চেষ্টায় কোনমতে ফ্রেমের তলায় আঙুল পৌঁছল। ধরার চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না এবারেও। বরফে আছড়ে পড়ল সে। অস্ফুট আর্তনাদ করে অসহায়ভাবে তাকাল ডাক্তারের দিকে।

টর্চের আলোয় মেয়েটার মুখে বেদনার অভিব্যক্তি দেখলেন ডাক্তার। 'চমৎকার অভিনয়,' ভাবলেন তিনি।

'আমি পারব না,' আহত কণ্ঠে বলে উঠল শ্যারিন। 'আমাকে দিয়ে আসলে কি করাতে চান? কি করেছি আমি?' থেমে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে রইল এক মুহূর্ত। কোন জবাব না পেয়ে বলল, 'আমি…আমি আর এখানে থাকব না… কেবিনে ফিরে যাচ্ছি…।' উঠে দাঁড়াল সে।

'পরে,' শ্যারিন চলে যাবার চেষ্টা করতেই তার হাত চেপে ধরলেন ডাক্তার। 'আপনি আমার সঙ্গে প্লেনে উঠছেন। দাঁড়ান এখানে।' উঠে কন্ট্রোল কেবিনে ঢুকলেন তিনি। তার পর নিতান্ত অভদ্রভাবেই শ্যারিনের বাড়ানো হাত চেপে ধরে টেনে তুললেন। 'চলুন, প্যান্ট্রিতে চলুন আগে।'

'আজব এক জিনিস ড্রাগস, না, মিস ক্যাম্পবেল?' বললেন ডাক্তার।
মুখ থেকে মাস্কটা টেনে একপাশে সরাল শ্যারিন, কোন জবাব দিল না
'আমার কথা বুঝতে পারছেন না নিশ্চয়?' অন্ধকারে মুচকে হাসলেন ডাক্তার। 'পারবেন একটু পরেই।'
শ্যারিনকে প্যান্ট্রিতে নিয়ে এলেন ডাক্তার। টর্চের আলোয় একটা টুল দেখিয়ে বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্টের আগে এই টুলটাতেই বসেছিলেন, না?'
এবারেও কোন জবাব দিল না শ্যারিন। হাঁ করে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইল।
'তারপর নিশ্চয় ওই দেয়ালে ছিটকে পড়েন,' পেছনের ধাতব দেয়াল দেখিয়ে বললেন ডাক্তার। 'কিসে ব্যথা পেয়েছেন? মানে, কিসে লেগে পিঠ কেটেছেন, দেখান তো?'
দেয়াল আর ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ওপর ধীরে ধীরে একবার চোখ বুলিয়ে আনল শ্যারিন। তারপর বলল, 'এসব জিজ্ঞেসের জন্যেই আমাকে এখানে নিয়ে এসেছেন?'
'কোথায় দেখান,' কঠিন গলায় বললেন ডাক্তার।
'জানি না,' এক পা পিছিয়ে গেল শ্যারিন। 'আর এখন এটা জেনেই বা কি হবে? ড্রাগসের কথা কি বলছিলেন, বলুন।'
হাত ধরে টেনে শ্যারিনকে রেডিওরুমে নিয়ে এলেন ডাক্তার। টর্চের আলো ফেললেন রেডিও ক্যাবিনেটের ওপর। স্টুয়ার্ডেসকে ক্যাবিনেটের একপাশে বেরিয়ে থাকা ধাতুর ফালিটা দেখিয়ে বললেন, 'এখানে, এই যে খয়েরী রঙ দেখতে পাচ্ছেন, কিসের দাগ এটা, মিস ক্যাম্পবেল? রক্ত, না? আর এই নীল সুতো? কার কাপড়ের? আসলে প্লেনটা অ্যাক্সিডেন্ট করার সময় এখানেই ছিলেন আপনি, পিঠে এই ফালিটার খোঁচা খেয়েছেন, কিন্তু তার আগে কোথায় ছিলেন? আর পিস্তলটাই বা কি করেছেন?' টর্চের আলোয় শ্যারিনের চোখ দুটোকে কেমন প্রাণশূন্য মনে হলো ডাক্তারের। 'কি…বুঝতে পারছেন না আমার কথা? ঠিক আছে, আমিই বুঝিয়ে দিচ্ছি। অ্যাক্সিডেন্টের আগে কন্ট্রোল কেবিনে ছিলেন আপনি। পিস্তলটা পাইলটের দিকে তাক করে রেখেছিলেন…পরে তাকে খুন করেছেন কো-পাইলটকেও। কিন্তু কারণটা কি, মিস? তারপরে সেকেন্ড অফিসারকেও খুন করেছেন। কোন কারণে বিমানে খুন করতে পারেননি, আমাদের কেবিনে শ্বাসরোধ করে মেরেছেন।'
'শ্বাসরোধ!' শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে কষ্টই হলো স্টুয়ার্ডেসের।
'শ্বাসরোধ,' মাথা ঝাঁকালেন ডাক্তার। 'গত রাতে কেবিনে তার পাশে শোয়ার এত আগ্রহ ছিল এজন্যেই বুঝি?'
'আপনি পাগল!' থরথর করে কাঁপছে শ্যারিন, শীতে নয়। গাঢ় বাদামী চোখ দুটোয় থির থির করছে ভয়। 'আসলেই পাগল আপনি!'
'পাগল, না?' শ্যারিনকে ধরে কন্ট্রোল কেবিনে নিয়ে এলেন ডাক্তার। পাইলটের শার্টটা আবার ওপরের দিকে তুললেন। মেরুদণ্ডের ওপরে গুলির গর্তটা দেখিয়ে বললেন, 'এটা কি? বলবেন তো কিছুই জানেন না…' শ্যারিনের চাপা

ভয়ার্ত আর্তনাদে চমকে থেমে গেলেন ডাক্তার। তাঁর গায়ের ওপরই হুমড়ি খেয়ে পড়ল স্টুয়ার্ডেস। হাত থেকে খসে পড়ল টর্চটা।

শ্যারিনকে ধরে আস্তে করে মেঝেতে শুইয়ে দিলেন ডাক্তার। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে টর্চটা খুঁজে বের করলেন। দুরদুর করছে বুক। সুইচ টিপলেন ডাক্তার। ঠিকই আশঙ্কা করেছেন, আলো জ্বলল না। বালবটা নষ্ট হয়ে গেছে। ডাক্তারের সহজাত প্রবৃত্তির বশে এরপর অন্ধকারেই শ্যারিনকে পরীক্ষা করলেন। আঙুল দিয়ে জোরে চাপ দিলেন স্টুয়ার্ডেসের বুকের নিচে পাকস্থলীর সামান্য ওপরে। কোন প্রতিক্রিয়া নেই মেয়েটার, সত্যিই জ্ঞান হারিয়েছে।

অন্ধকার কেবিনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন ডাক্তার ব্রাউন। নিজের বোকামির জন্যে নিজের ওপরই চটে গেছেন। না বুঝে নিরীহ স্টুয়ার্ডেসের সঙ্গে যে অভদ্র ব্যবহার করেছেন, তার জন্যে নিজেকেই ক্ষমা করতে পারছেন না এখন। আগেই বোঝা উচিত ছিল, মেয়েটার পক্ষে নয় ফুট উঁচুতে লাফিয়ে উঠে ভাঙা উইন্ডব্রেকার দিয়ে ভেতরে ঢোকা একেবারেই অসম্ভব। তাছাড়া ক্যাপ্টেনের ঘাড় কে ভেঙেছে? মেয়েটার হাতে অত জোর নেই যে একজন মানুষের ঘাড় ভেঙে দিতে পারে। আর এখনকার এই জ্ঞান হারানো? এটা তো অভিনয় নয়...।

খুট করে একটা শব্দ হতেই চমকে পিছন ফিরে চাইলেন ডাক্তার। শিউরে উঠলেন নিজের অজান্তেই। ভাঙা জানালায় একটা মুখ। স্নো গগলস আর মাস্ক পরা, তার ওপর অন্ধকার। আবছা মত মুখটা দেখা যাচ্ছে। চিনতে পারলেন না তিনি।

কোনরকম চিন্তাভাবনা না করেই পকেট থেকে পিস্তল বের করলেন ডাক্তার। গুলি করার আগেই জানালা থেকে অদৃশ্য হলো মুখটা। ছুটে এসে জানালা দিয়ে নিচে উঁকি দিলেন ডাক্তার। দৌড়ে যাচ্ছে একটা মূর্তি, আবছা দেখা যাচ্ছে। এক মুহূর্ত দ্বিধা করলেন ডাক্তার, তারপর বাইরে বেরিয়ে এলেন দ্রুত। কোন সন্দেহ নেই, ছুটে যাচ্ছে যে, ওই লোকটাই খুনী। যেমন করে হোক, ধরতেই হবে ওকে। চলার ধরন, উচ্চতা আর স্বাস্থ্য দেখে লোকটাকে হঠাৎই চিনে ফেললেন তিনি।

মূর্তিটাকে অনুসরণ করে ছুটে চলেছেন ডাক্তার। চরম ভুল করলেন তিনি—তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনায় খেয়ালই করলেন না, কেবিনের দিকে নয়, উল্টো দিকে ছুটছে লোকটা।

ছয়

উইন্ডব্রেকারের কাছে কন্ট্রোল কেবিনের ভেতরে একটা উঁচু জায়গায় সার্চ লাইটটা বসিয়েছে রানা, ভেতরের দিকে মুখ করে। উজ্জ্বল আলো কেবিনের ভেতর

শোরগোল তুলেছিলেন সুসান গিলবার্ট। অনেকক্ষণ হয়ে গেছে ডাক্তার

শ্যারিন কেবিন থেকে বেরিয়েছে. কিন্তু ফিরে আসছে না। ব্যাপারটা রানার কাছেও ভাল লাগেনি। ব্যারিকে নিয়ে ওদের খুঁজতে এসেছে সে। ব্যারির সঙ্গে এসেছে তার কুকুর রোল্টা।

ব্যারিকে নিচে রেখে বিমানে উঠেছে রানা। ভেতরটা তন্ন তন্ন করে খুঁজেছে. কিন্তু ডাক্তার ব্রাউন নেই। কন্ট্রোল কেবিনে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে স্টুয়ার্ডেস। ব্যারিকে ডেকে ব্যাপারটা জানিয়েছে রানা। তার পরামর্শেই রোল্টা আর একটা সার্চ লাইট নিয়ে ডাক্তারকে খুঁজতে চলে গেছে ব্যারি। রানার অনুমান. আশপাশেই কোথাও পাওয়া যাবে ব্রাউনকে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না. শিগগিরই জ্ঞান ফিরে পেল শ্যারিন। রানাকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠল, 'খুন. ওকে কেউ খুন করেছে. মিস্টার রানা।' আর্তনাদের মত শোনাল স্টুয়ার্ডেসের কণ্ঠ। আঙুল তুলে পাইলটের দেহটা দেখিয়ে দিল। হঠাৎই মনে পড়ল ডাক্তারের কথা. 'কিন্তু আপনি···ডাক্তার ব্রাউন কোথায়?' রানার হাতের স্নো মাস্কটার দিকে তাকাল একবার শ্যারিন। 'আমার দোষ দিচ্ছিলেন ডাক্তার··· কোথায়···?'

'আমারও তো একই প্রশ্ন. ডাক্তার ব্রাউন কোথায়?'

'এখানেই তো ছিল···প্লেনের ভেতরে···।'

'নেই। খুঁজে দেখেছি আমি।'

'নেই···?'

'না নেই। ওঁকে খুঁজতে গেছে রিক ব্যারি।···তা আপনার এই অবস্থা কেন?'

'ওকে গুলি করে মারা হয়েছে···' পাইলটের দেহটা আবার দেখাল শ্যারিন। 'মেরুদণ্ডের ওপর গুলির ফুটো···ডাক্তার ব্রাউন দেখিয়েছেন। দেখে কি যে হলো···আচমকা মাথা ঘুরে গিয়ে···।'

'বেশি ভয় পেলে কিংবা চমকে গেলে হয় এরকম,' গলায় দরদ ঢালল রানা। 'ঠিক হয়ে যাবে···।'

'কিন্তু মিস্টার রানা,' গভীর বেদনা শ্যারিনের কণ্ঠে। 'কে ক্যাপ্টেন হ্যারিসনকে এমনভাবে···ওর তো কোন শত্রু ছিল না!'

'কি জানি। ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সেরও তো একই অবস্থা,' হাত তুলে বিমানের পেছন দিক ইঙ্গিত করল রানা। 'ওর কোন শত্রু ছিল কিনা, কে জানে।'

আবার অজানা ভয় ফুটল শ্যারিনের চোখের তারায়। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সও···আপনি···আপনিও জানেন মিস্টার রানা···!'

'জানি। হ্যাঁ. ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সকেও খুন করা হয়েছে। খুন করা হয়েছে সেকেন্ড অফিসার আর ফ্লাইট ইঞ্জিনিয়ারকেও।'

'কে!' ফিস ফিস করেই বলল শ্যারিন, 'কে করল?'

'আর যেই করুক, আপনি নন, আমি জানি।'

'না না, আমি নই,' থর থর করে কাঁপছে শ্যারিন। 'কিন্তু তাহলে···আমি রেডিওরুমে এলাম কি করে?···মানে আমার পিঠে জখম···।'

'ঘুমের ওষুধ খাওয়ানো হয়েছিল আপনাকে এবং যাত্রীদেরকে। প্যান্ট্রি থেকে

আপনাকে তুলে আনা হয়েছিল রেডিওরুমে. জেস ওয়েসকে হুমকি দেয়া হয়েছিল. ওদের কথামত কাজ না করলে আপনাকে গুলি করা হবে।'

'কিন্তু আমার পিঠের জখম···আর···আর প্যান্ট্রিতেই বা গেলাম কি করে?'

'প্যান্ট্রিতেই তো ছিলেন আপনি। মনে করার চেষ্টা করুন। যাত্রীদের কফি সরবরাহ করে প্যান্ট্রিতে গিয়েই কফি খেয়েছিলেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ. খেয়েছিলাম. মনে পড়ছে···।'

'ঘুমিয়ে পড়ার পর আপনাকে তুলে নিয়ে আসা হয় সম্ভবত। আপনাকে গুলি করার ভয় দেখিয়ে ওয়েসকে দিয়ে কোন কাজ আদায় করিয়ে নেয় খুনী। খুব সম্ভব ওকে দিয়েই ল্যান্ড করায় প্লেন। আমার ধারণা. রেডিওটা অ্যাক্সিডেন্টে ভাঙেনি. ওটাকে ভাঙা হয়েছে। আর রেডিও ক্যাবিনেটের একপাশে বেরিয়ে থাকা ধাতুর ফলাটাও খুঁচিয়ে জাগানো হয়েছে। ওটা দিয়ে জখম করা হয়েছে আপনাকে। ব্লাউজ থেকে সুতো ছিঁড়ে আটকে গেছে। সন্দেহটা আসলে আপনার ওপরই ফেলতে চেয়েছে ওরা।'

'ওরা?'

'ওরা। একজন লোকের কাজ নয় এটা। কমপক্ষে দু'জন একজন জেস ওয়েসের কাছে ছিল. অন্যজন কন্ট্রোল কেবিনে। ···আচ্ছা মিস শ্যারিন. জেস ওয়েসের সঙ্গে আপনার ঠিক কি সম্পর্ক ছিল বলুন তো?'

সরাসরি রানার দিকে তাকাল শ্যারিন। বাদামী দুই চোখের তারায় বেদনার ছায়া। 'কি সম্পর্ক ছিল জিজ্ঞেস করছেন?' বাঁ হাতের দস্তানাটা টান মেরে খুলে ফেলল মেয়েটা। আঙটিটা খুলে নিল আঙুল থেকে। রানার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল. 'ভাল করে দেখুন।'

আঙুটিটা আলোর কাছে নিয়ে এল রানা। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। আঙটির সোনার বেড়টাতে দুটো অক্ষর খোদাই করা: জে. ডব্লিউ. আঙটিটা আবার শ্যারিনকে ফিরিয়ে দিতে দিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কয় মাস আগে?'

'দুই মাস আগে কথা পাকা হয়েছিল আমাদের। এটাই ছিল আমার শেষ ফ্লাইট. এরপর চাকরি ছেড়ে দিতাম। আগামী বড়দিনে বিয়ের কথা ছিল আমাদের.' দুই চোখের কোণ বেয়ে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়ল শ্যারিনের। রানার দিক থেকে দৃষ্টি ফেরাল। দু'হাতে মুখ ঢেকে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটা।

কিছুই বলতে পারল না রানা। কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ রইল। তারপর ধীরে ধীরে ডান হাতটা বাড়িয়ে শ্যারিনের কাঁধে রাখল।

ধীরে ধীরে কমে এল কান্নার বেগ। মুখ তুলল শ্যারিন। আস্তে করে রানার হাতটা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে বলল. 'ধন্যবাদ ' চোখ মুছে নিয়ে জিজ্ঞেস করল. 'কেবিনেই তো ফিরে যাব···'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে নিচে থেকে ব্যারির উত্তেজিত ডাক শোনা গেল. 'মেজর রানা, মেজর···'

উঁকি দিল রানা. 'কি. কি হলো? ডাক্তারকে পেয়েছ?'

'পেয়েছি। তাঁর লাশ।'

প্রচণ্ড তুষারঝড়ের মাঝে কঠিন বরফে কোনমতে কবর খোঁড়া হলো। জেস ওয়েন্সের পাশেই কবর দেয়া হলো ডাক্তার ব্রাউনকে। তারপর ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে কেবিনে ফিরে এল ওরা।

অস্বস্তিকর পরিবেশ কেবিনের ভেতরে। থমথমে নীরবতা। শুধু কোলম্যান ল্যাম্পটার হিসহিসানি শোনা যাচ্ছে, আর বাইরে বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠছে অ্যানিমোমিটার কাপের একঘেয়ে খড় খড় শব্দ।

রানা আর ব্যারিকে সুড়ঙ্গে ডেকে নিয়ে গেল পোর্টার।

'কি ব্যাপার, পোর্টার?' পেছনে ব্যারি দরজা বন্ধ করতেই জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু কন্ডেন্সার আর বালব হারিয়ে গিয়েছিল।'

'তারপর?'

'দুটো বালব পেয়েছি। ল্যাভেটরির কাছে। ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা হয়েছে।'

'হুঁ,' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'শুধু রেডিও ভেঙেই ক্ষান্ত হয়নি। ওটা যাতে আর ঠিক করা না যায় সেদিকেও খেয়াল রেখেছে।' ব্যারির দিকে ফিরে বলল, 'আর দেরি নয়, রিক। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রওনা হয়ে পড়ব আমরা। আর হ্যাঁ, এখন থেকে সাবধান। প্রতিটি লোকের ওপর নজর রাখতে হবে। ডাক্তার ব্রাউনও গেলেন, এবার কার পালা, কে জানে!'

'মিস্টার রানা,' গলা নামিয়ে বলল পোর্টার। 'এতক্ষণ জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি। ডাক্তার ব্রাউনকেও কি খুন করা হয়েছে?'

'হ্যাঁ,' থমথমে গম্ভীর রানার গলা। 'ওঁকে বোকা বানিয়ে প্লেন থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেছে খুনী। তারপর তাঁর কানের ওপর পিস্তলের বাড়ি মেরে অজ্ঞান করে ফেলে চলে এসেছে। ব্যাপারটাকে এমনভাবে সাজাতে চেয়েছে যেন আমরা বুঝি পথ হারিয়ে মারা পড়েছেন ডাক্তার। অনড় হয়ে বরফের ওপর পড়ে থাকা…এই ঠাণ্ডায়…ডাক্তারের দেহটা জমে যেতে বেশিক্ষণ লাগেনি।'

'কে, কে মিস্টার রানা!' ফুঁসছে পোর্টার। 'আপনি জানেন?'

'জানি না। তবে জানব। আপনাদের সাহায্য দরকার পড়বে। বড় নিষ্ঠুর, বড় হুঁশিয়ার ওরা। কাজেই আমাদেরও হুঁশিয়ার থাকতে হবে। কিন্তু বুঝতে দিলে চলবে না। ওদের কাছে খানিকটা বোকা সেজে থাকতে হবে আমাদের।' ঠিক কি করতে হবে ব্যারি আর পোর্টারকে বুঝিয়ে দিল রানা।

চুলোটাকে ঘিরে বসে আছে নয়জন যাত্রী। সবারই মুখ-চোখ থমথমে। সুপ রান্নায় ব্যস্ত সুসান গিলবার্ট। অন্যেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে তাঁর কাজ।

সুড়ঙ্গের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি মেলে সবাইকে লক্ষ্য করছে রানা। কে কে খুনী হতে পারে, অনুমান করার চেষ্টা করছে। এমন অনিশ্চিত অবস্থায় এর আগে পড়েনি কখনও সে।

বিচিত্র উদ্ভট পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভারী পোশাক পরা কিছু মানুষ, শীতে কাতর, নিরীহ চেহারা। কিন্তু আসলে সবাই ওরা নিরীহ নয়

ডেরেক ক্লেটনের কথাই ধরা যাক. সত্যিই কি ও নিরীহ সাধারণ মানুষ? বিশাল সুগঠিত দেহ। কথাবার্তা আর চাল-চলনেই বোঝা যায় সুশিক্ষিত রুচিশীল। নিজেকে মুষ্টিযোদ্ধা বলে পরিচয় দিচ্ছে. কিন্তু সত্যিই মুষ্টিযোদ্ধা কিনা বোঝার উপায় নেই। তার বক্তব্যের একমাত্র সাক্ষ্য তার বলবান শরীর।

এরপর আছে ডেরেকের ম্যানেজার টম মার্টিন। নিউ ইয়র্কের কোন মুষ্টিযোদ্ধার ম্যানেজার বলে ভাবাই যায় না ওকে। কেমন যেন ভাঁড় ভাঁড় মনে হয়।

রেভারেন্ড স্টিভেনস নিউবোল্ডের মাঝে পাদ্রীসুলভ সমস্ত গুণাগুণই রয়েছে। নম্র. ভীরু ভীরু রক্তশূন্য মুখ। কিন্তু এতেই কি মানুষ চেনা যায়? ওই রেভারেন্ড ছদ্মবেশ ধরেনি. কে বলতে পারে?

জন ওয়াকার। তার মত বিচক্ষণ. বুদ্ধিমান আর কৌশলী ব্যবসায়ীর অভাব নেই আমেরিকায়। সুগঠিত শরীরের কোথায় যেন একটা অসামঞ্জস্য রয়েছে, বোধহয় চেহারায়। পোড় খাওয়া ব্যবসায়ীর মত মনে হয় না তাকে।

মুস্তাফা শরাফী। ছোটখাট ফিলিস্তিনী লোকটারও কেমন যেন কৌতুকাভিনেতার মত ব্যবহার। কথা বলার সময় চশমা বের করে. কথা শেষ হলেই আবার খাপে পুরে পকেটে ভরে। কখনও বক বক করে কথার তুবড়ি ছোটায়. কখনও একেবারে চুপ. শামুকের মত গুটিয়ে ফেলে নিজেকে। উল্টোপাল্টা কথা বলতে বলতে কখনও চমকে উঠে থেমে যায়. কখনও রহস্যজনক ভাবে মুচকে হাসে. কখনও হাসে বেদনার হাসি। তার সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন যেন অদ্ভুত। পাগলাটে খাপছাড়া ব্যবহার। ম্যানিয়াকরা অনেকটা এমনই হয়।

সিনেটর ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল। এক নজরে সব সন্দেহের বাইরে রাখা যায় তাকে। কিন্তু এটাই আসলে সন্দেহজনক। একজন বুদ্ধিমান খুনী নিজেকে সন্দেহের বাইরে রাখার মতই ছদ্মবেশ নেয়। লোকটা সত্যিই যে সিনেটর, কি প্রমাণ আছে তার?

মেয়েদেরকেও সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না, শ্যারিন ছাড়া। তারা যে নিরপরাধ নয়, এর সপক্ষে কোন প্রমাণ মেলেনি এখনও।

সেই একই রকম কানে আসছে অ্যানিমোমিটার আর কোলম্যান ল্যাম্পের একঘেয়ে শব্দ। বিচিত্র এক নিস্তব্ধতা ঘরের ভেতরে। নিঃশব্দে সুড়ঙ্গের দরজা খুলে ভেতরে এসে ঢুকল ব্যারি। হাতে একটা চকচকে উইনচেস্টার রাইফেল। ট্রিগারে আঙুল।

'দুঃখিত,' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে বলল রানা। 'ব্যাপারটা খারাপই লাগছে, কিন্তু উপায় নেই,' ব্যারির হাতের রাইফেলটা দেখিয়ে বলল, 'ওটা রিকের। সীলমাছ শিকার আর ভালুকের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সঙ্গে এনেছিল। এভাবে কাজে লেগে যাবে, ভাবেনি। ভাবেনি ভয়ঙ্কর এক অবস্থায় আত্মরক্ষার জন্যে কাজ দেবে রাইফেলটা। আপনারা জানেন, শ্বেত-ভালুক সাংঘাতিক জীব। শিকারীর নিশানা ভাল না হলে এই জানোয়ার শিকার করা অসম্ভবই বলা যায়। সুতরাং সাবধান! কেউ কোন চালাকির চেষ্টা করবেন না। দয়া করে মাথার ওপর হাত তুলে ফেলুন···সবাই।'

কেউ হাত তুলল না। রানা মজা করছে মনে করে হাসতে শুরু করেছে দুয়েক জন। পারকার পকেটে হাত ঢুকাল রানা। ধীরে ধীরে বের করে আনল হাতটা। কোলম্যান ল্যাম্পের আলোয় চকচক করে উঠল ওয়ালথারের নল। সেফটি ক্যাচ অফ করার মৃদু শব্দ হলো কট। যাত্রীদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে আধপাক ঘুরিয়ে আনল পিস্তলের মুখ। 'এবার আশা করি বুঝতে পারছেন, তামাশা করছি না আমরা।'

'এই জঘন্য ব্যবহারের মানে?' রাগে লাল হয়ে গেছে সিনেটরের মুখ। এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে আসতে চাইল রানার দিকে। কিন্তু এক পা এগিয়েই যেন দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে থেমে গেল। বদ্ধঘরে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হলো উইনচেস্টারের প্রচণ্ড শব্দে। নিজের ডান পায়ের সামনে গর্তটার দিকে তাকিয়ে আছে সিনেটর। চোখে অবিশ্বাস। ডান পায়ের দুই ইঞ্চি সামনে মেঝেতে ঢুকে গেছে বুলেট। ধীরে ধীরে আবার পিছিয়ে গেল সিনেটর। ধপ করে বসে পড়ল প্যাকিং বাক্সের ওপর, আগের জায়গায়। মাথার ওপর হাত তুলল। তার সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল অন্যেরাও।

'হ্যাঁ, বুঝতে পারছি আপনারা মজা করছেন না,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ক্লেটন। 'কিন্তু সামান্য পরিচয়েই আপনার সম্পর্কে যা ধারণা পেয়েছি···শুধু শুধু কোন কাজ করার মানুষ তো আপনি নন, রানা?'

'ব্যাপার হলো, আমরা জানতে পেরেছি, আপনাদের মাঝে দু'জন খুনী রয়েছে, নিষ্ঠুর, নৃশংস। তারা দু'জনই পুরুষ, কিংবা একজন পুরুষ একজন মহিলা। আর ওই দু'জনের কাছেই পিস্তল রয়েছে, দুটো ভিন্ন ক্যালিবারের। ওদুটো আমি চাই।'

'আরে!' ভুরু কোঁচকালেন সুসান গিলবার্ট। নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছেন। 'তোমরা সবাই পাগল হয়ে গেলে নাকি!'

'আপনার হাত নামাতে পারেন, মিস গিলবার্ট,' বলল রানা। 'আমরা পাগল হইনি। আপনার মতই মাথা ঠিক আছে। আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না তো? প্লেনে গিয়ে কিংবা কবর দুটো খুঁড়ে ভাল করে দেখে এলেই আর অবিশ্বাস থাকবে না। পাইলটের পিঠে বুলেটের কালো গর্ত পরিষ্কার দেখতে পাবেন। ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সের বুকে দেখবেন বুলেটের চিহ্ন। জেস ওয়েন্স মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণে মারা যায়নি। গলা টিপে খুন করা হয়েছে তাকে। আর ডাক্তার ব্রাউন? না, তিনি পথ হারাননি। বরফের দেশে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে যিনি এসেছিলেন, আর যেভাবেই হোক, বরফে পথ হারিয়ে মরতে তিনি পারেন না। তাহলে? তাঁর ডান কানের একটু ওপরে আঘাতের চিহ্ন দেখবেন পরিষ্কার। পিস্তলের বাঁটের বাড়ি মেরে বেহুঁশ করে ফেলে রাখা হয়েছিল ডাক্তারকে তুষারঝড়ের মাঝে।···দেখবেন নাকি?'

সহসা কথা ফুটল না প্রবীণ অভিনেত্রীর মুখে। কেউই কিছু বলল না। যাত্রীদের চেহারায় কেমন একটা হতভম্ব ভাব। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতিটি মুখের দিকে একে একে তাকাল রানা। কিন্তু নেই। কারও চেহারায় কিছু বুঝতে পারার মত সামান্যতম চিহ্নও নেই।

'রানা,' রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেছে সুসানের মুখ। গলা কাঁপছে। 'তোমাকে

অবিশ্বাস করছি না। কিন্তু…' শ্যারিনের দিকে নজর ফেরালেন. 'শ্যারিন. তুমিও জানতে নাকি?'

'একটু আগে জেনেছি। ডাক্তার ব্রাউনের ধারণা ছিল আমিই ওসব খুনখারাপি করেছি.' বলল শ্যারিন।

'তুমি কখন জেনেছ. রানা?'

'গতরাতেই। আপনারা প্লেন থেকে নেমে যাবার পর।'

'কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলোনি!'

'তখন বলার সময় হয়নি।'

'গড! ওহ্ গড! আমাদের…আমাদের মাত্র এই ক'জনের মাঝে দু'জন খুনী!' দ্রুত আটজন যাত্রীর ওপর নজর বোলালেন সুসান। রানার দিকে তাকালেন। 'ব্যাপারটা একটু গুছিয়ে বলবে. রানা?'

গুছিয়ে বলল রানা. তবে কিছু রেখে ঢেকে। সব কথা জানানোর সময় এখনও হয়নি। পুরো ব্যাপারটাই গোপন রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রথমে. কিন্তু ভেবে দেখেছে সেটা ঠিক হবে না। সবাইকে কথাটা জানিয়ে রাখলে তার জন্যে সুবিধে হবে। নির্দোষরা সকলেই এখন সকলকে সন্দেহ করবে নিজেদের জীবন বাঁচানোর জন্যে। সতর্ক থাকবে প্রতিটি মুহূর্ত। খুনীদের পক্ষে নতুন কোন অপরাধ করা কঠিন হয়ে পড়বে। আর এই ঘোলা পানিতে মাছ শিকার সোজা হয়ে যাবে রানার জন্যে।

'বাঁ দিক থেকে একজন একজন করে উঠে দাঁড়াবেন.' বলল রানা। 'আপনাদের দেহ তল্লাশী করা হবে। একটা কথা জানিয়ে রাখছি আপনাদের. বেপরোয়া লোক নিয়ে এর আগেও কারবার করেছি আমি। কাজেই কোনরকম বোকামি নয়। নিজের প্রশংসা করছি. কিছু মনে করবেন না: পিস্তল ছোঁড়ায় ইচ্ছে করলে বিশ্বরেকর্ড সৃষ্টি করতে পারতাম আমি। কেউ গোলমাল করার চেষ্টা করলে পাকস্থলীতে বুলেট ঢুকে যাবে. কিন্তু ডাক্তারের সাহায্য পাওয়া যাবে না। কাজেই…' চোখের ইঙ্গিতে বাকি কথাটুকু শেষ করল রানা।

'আপনার কথা অবিশ্বাস করব না,' গম্ভীর, চিন্তিত জন ওয়াকার। 'ট্রাক্টর কোম্পানির পরিচালক, লোক চরিয়ে খাই। চোখ দেখে মানুষ চিনতে ভুল করি না আমি।'

'গুড, ভেরি গুড,' পোর্টারের দিকে তাকাল রানা। ইঙ্গিতে কাজ শুরু করতে বলল।

ডেরেক ক্লেটনকে দিয়ে শুরু করল পোর্টার। এসব কাজে তেমন দক্ষ নয় রেডিওম্যান, ওর হাত চালানো দেখেই বোঝা গেল। চোখে মুখে রাগের চিহ্ন। যার কাছে পিস্তল পাওয়া যাবে, তার কপালে দুঃখ আছে, বুঝল রানা। মুষ্টিযোদ্ধার কাছে পাওয়া গেল না অস্ত্রটা। ক্লেটনের পরের জন, টম মার্টিনকে উঠে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত করল পোর্টার।

টম মার্টিনের দেহ তল্লাশী চলছে, এই সময় বলে উঠলেন সুসান, 'আমাকে বাদ দেবার কারণটা জানতে পারি?'

'আপনাকে?' মার্টিনের দিক থেকে চোখ ফেরাল না রানা। 'ছেলেমানুষী প্রশ্ন

না-ই বা করলেন।'

'ছেলেমানুষী করছি না,' নরম কাঁপা গলায় বললেন অভিনেত্রী। 'যথেষ্ট সম্মান দেখিয়েছ আমাকে, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি চাই আর সবার মত আমাকেও সার্চ করা হোক। নইলে মনে খুঁতখুঁতি থেকে যাবে।'

সুসান গিলবার্টের অস্বস্তি দূর করা হলো। পুরুষদের দেহ তল্লাশী করল পোর্টার আর মেয়েদের শ্যারিন। তীব্র প্রতিবাদ করল মিসেস ডুলানী, তবে রেহাই পেল না। কিন্তু কারও কাছেই পাওয়া গেল না পিস্তল।

'এদের জিনিসপত্রগুলো আনো এইবার,' পোর্টারকে বলল রানা। 'কাপড়চোপড়, সুটকেস, কিচ্ছু বাদ দেবে না।'

'বৃথা সময় নষ্ট করছেন আপনি, রানা,' শান্ত কণ্ঠে বলল ওয়াকার। 'একটা বাচ্চা ছেলেও এমন বোকামি করবে না। গিয়ে দেখুনগে, স্লেজ কিংবা ট্রাক্টরের কোথাও লুকানো আছে ও দুটো। বরফে গর্ত করে লুকিয়ে রাখাও অসম্ভব নয়। দরকারের সময় তুলে নেবে আবার।'

'আপনিও বোকামি করছেন, ওয়াকার,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'জানেন না হয়তো, বরফে অকেজো হয়ে যায় আগ্নেয়াস্ত্র। আর স্লেজ এবং ট্রাক্টরের কথা বলছেন,' মিছে কথা বলল সে, 'ওসব জায়গায় আগেই খুঁজেছি।'

'বেশ, দেখুন তাহলে। সন্দেহমুক্ত হোন,' বলেই প্রায় ছুটে গিয়ে সকলের জিনিসপত্র জড়ো করল সে। পাঁজাকোলা করে নিয়ে এসে ফেলল রানার পায়ের কাছে। 'দেখুন, খুঁজে দেখুন। এই যে—এই সুটকেসটা আমার। আর এটা—এটা রেভারেন্ডের। এই যে তাঁর নাম লেখা আছে।—আর এই এটা—এটা কার?' যাত্রীদের দিকে তাকাল সে।

'আমার,' ঠাণ্ডা গলা ডুলানীর।

রানার পেছন দিকে তাকিয়ে আছে ওয়াকার। ভুরু কুঁচকে গেছে। 'আরে—আরে ও কি!'

'পুরানো চালাকি,' হাসল রানা। 'ভুলে যাচ্ছেন ওয়াকার, রিকের রাইফেল...'

'গোল্লায় যাক রিকের রাইফেল,' চেঁচিয়ে উঠল ওয়াকার। 'ওই দেখুন!'

লোকটার গলায় এমন কিছু রয়েছে যে ফিরে চাইল রানা। কিছুই দেখল না প্রথমে। একটু ওপরের দিকে দৃষ্টি সরে স্কাইলাইটের কাঁচে পড়তেই চমকে উঠল। আগুন! আগুনের আলো প্রতিফলিত হচ্ছে কাঁচে। একটা মুহূর্ত স্থির চেয়ে রইল রানা। পরক্ষণেই ঘুরে ছুটল দরজার দিকে। দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এল।

আলোয় আলোকিত হয়ে গেছে পুবের আকাশ। প্রায় পৌনে এক মাইল দূর থেকেও বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে কানে এল আগুনের শোঁ শোঁ আওয়াজ। দুটো ডানা সহ বিমানের সামনের অংশটা জ্বলছে। বিমানের জ্বালানীতে আগুন লেগেছে, দাউ দাউ জ্বলছে লাল আগুন। সময় পেরোল। আকাশের অনেকখানি ওপরে উঠে গিয়েছিল লেলিহান শিখা, নেমে এল ধীরে ধীরে। আরও কয়েক সেকেন্ড পর একটা আগুনের গোলায় পরিণত হলো বিমানের সামনের অংশটা। ধাতু জ্বলে লাল হয়ে গেছে। আবার কেবিনে এসে ঢুকল রানা। আস্তে করে দরজাটা নামিয়ে দিয়ে ফিরে

তাকাল।

একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্যারি। যাত্রীদের পোশাক আশাক আর সুটকেস তল্লাশী প্রায় শেষ করে এনেছে পোর্টার। রানা ঢুকতেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে তাকাল সবকজন যাত্রী আর পোর্টার। কিন্তু ব্যারির মাঝে কোন ভাবান্তর নেই। একইভাবে যাত্রীদের দিকে রাইফেল তাক করে ধরে রেখেছে।

ব্যারির পাশে এসে দাঁড়াল রানা। 'গত একআধ ঘণ্টার ভেতর কেউ নিরুদ্দেশ হয়েছিল, জানো রিক?'

'খেয়াল রাখিনি। তাড়াহুড়ো, উত্তেজনা—ওদিকে ডাক্তার নিখোঁজ··· ফিরে এসে তাঁকে কবর দেয়া—নাহ্, রানা,' এদিক ওদিক মাথা দোলাল ব্যারি, 'বলতে পারব না।'

'কি হয়েছে, মিস্টার রানা?' জানতে চাইল ক্লেটন।

'আগুন লেগেছে। প্লেনে।'

'কেউ নিরুদ্দেশ···আপনি বলতে চাইছেন, এটাও দুর্ঘটনা নয়?'

দুর্ঘটনা যে নয়, এটা হয়তো তুমি আমার চেয়ে ভালই জানো বাপধন, ভাবল রানা। মুখে বলল, 'দুর্ঘটনা নয়।'

'আপনাদের সমস্ত প্রমাণট্রমাণ গেল তাহলে,' বলল ওয়াকার।

'গেল,' চিন্তিতভাবে পোর্টারের কাজ দেখছে রানা।

কাজ শেষ করে উঠে দাঁড়াল পোর্টার। হতাশভাবে মাথা নাড়ল এদিক ওদিক।

মুচকে হাসল ওয়াকার। 'এবার জিনিসপত্রগুলো সরিয়ে রাখতে পারি তো, মিস্টার রানা?'

'রাখুন।'

'পোর্টার,' বলল রানা। 'জেলিগনাইটগুলো সব এখনও ঠিক রয়েছে কিনা, দেখে আসুন তো।'

রানার চোখের দিকে তাকাল পোর্টার। কোনরকম প্রশ্ন না করে ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল। অদৃশ্য হয়ে গেল সুড়ঙ্গের দরজার ওপাশে। মিনিট দুয়েক পরেই ফিরে এল আবার। গম্ভীর থমথমে মুখ। 'দুটো স্টিক আর দুটো ফিউজ নেই।'

'যা ভেবেছিলাম,' মাথা নাড়ল রানা। গম্ভীর। 'আমাদের অলক্ষ্যে কেউ একজন স্টিক আর ফিউজ দুটো নিয়ে সরে পড়েছিল।'

'আগেরবার নিল না কেন?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল পোর্টার, 'শুধু নাড়াচাড়া করে ফেলে রেখে গেল বিস্ফোরকগুলো!'

'ইচ্ছে করেই করেছে। আপনাকে বুঝিয়েছে, তার আসলে ওগুলোর কোন দরকার নেই। এর ফলে আর ওগুলোর দিকে তেমন খেয়াল রাখবেন না। চুরি করতে পারবে সে সহজেই, যদি দরকার পড়ে। তখনও জানত না সে দরকার পড়বে কিনা।'

'হা-রাম-জা-দা!' দাঁতে দাঁত চাপল রেডিওম্যান।

'বিস্ফোরক, ফিউজ···এসব কি বলছেন!' রানার দিকে তাকাল সিনেটর। ফ্যাকাসে মুখ। গোঁফে আঙুল ঘষছে।

'প্লেনে আগুন লাগানোর জন্যে জেলিগনাইট আর ফিউজ চুরি করেছে কেউ। সেই ''কেউ'' আপনিও হতে পারেন,' খেপে উঠে কিছু বলতে যাচ্ছিল সিনেটর, হাত নেড়ে থামাল রানা। 'কিংবা আপনার সহযাত্রীদের কেউ। তবে এটা জেনে রাখুন, যে-ই ওসব জিনিস চুরি করেছে, খুনের জন্যেও সে-ই দায়ী। সে কিংবা তার সহকারীই চুরি করেছে রেডিওর বালব আর কন্ডেন্সারগুলো...'

'...এবং চিনি,' বলে উঠল পোর্টার। 'এইমাত্র দেখে এলাম। গড! চিনি চুরি করে কার কি লাভ!'

'চিনি!' বলেই মুস্তাফা শরাফীর ওপর চোখ পড়ল রানার। ছোটখাট লোকটির সামান্য একটু চমকে ওঠা নজর এড়াল না তার। সঙ্গে সঙ্গেই চোখ ফিরিয়ে নিল ফিলিস্তিনী।

'তিরিশ পাউন্ডের মত চিনি ছিল,' বলল পোর্টার, 'আমাদের শেষ সম্বল। পুরোটাই গেছে।'

'হুঁ,' শরাফীর দিকে তাকাল আবার রানা। আগুনের দিকে চেয়ে চুপচাপ বসে আছে বুড়ো লোকটা। নির্বিকার।

সংক্ষেপে শেষ হলো রাতের খাওয়া। সুপ, বিস্কুট আর কফি। পাতলা সুপ, একটা করে বিস্কুট আর চিনি ছাড়া কফি, সবই অখাদ্য মনে হলো রানার।

নিঃশব্দ, বিচিত্র পরিবেশ কেবিনের ভেতরে। খাবার সময়ে শুধু দুয়েকটা প্রয়োজনীয় কথা, ব্যস। খেতে খেতেই সকলের ওপর নজর রেখেছে রানা। বিচিত্র ব্যবহার করছে সবাই। পাশের লোকটিকে কোন কথা জিজ্ঞেসের জন্যে হয়তো মুখ খুলছে কেউ, পরক্ষণেই কিছু না বলে মুখ বন্ধ করছে আবার। অদ্ভুত এক অস্বস্তির চিহ্ন ফুটেছে প্রতিটি লোকের চেহারায়। কে জানে, পাশের লোকটিই হয়তো খুনী। কিংবা তার পাশের জন।

খাওয়া শেষ হতেই উঠে গিয়ে পারকা পরে ফেলল রানা। হাতে দস্তানা পরে একটা সার্চলাইট তুলে নিল। ইঙ্গিতে পোর্টার আর ব্যারিকে অনুসরণ করতে বলে দরজার দিকে এগোল। কয়েক পা এগিয়ে থমকে দাঁড়াল ক্লেটনের প্রশ্নে।

'কোথায় চললেন, রানা?'

ফিরে চাইল রানা। 'সেটা আপনার না জানলেও চলবে।'

'এই রিক, তোমার রাইফেলটা নিয়ে যাও সঙ্গে,' ডেকে বললেন সুসান গিলবার্ট।

অভিনেত্রীর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল রানা, 'ওটা নেবার আর দরকার নেই, সুসান। আমার পকেটে পিস্তল আছে। তাছাড়া সবাই এখন সবার ওপর লক্ষ্য রাখছে। সুবিধা করতে পারবে না খুনীরা।'

'আমি সেজন্যে বলছি না, রানা,' শঙ্কা ফুটেছে সুসানের চোখের তারায়। 'ফিরে এসে যদি দেখো ওটা কেউ দখল করে বসেছে...!'

'করবে না, ডিয়ার ম্যাডাম,' হাসিটা লেগে রয়েছে রানার ঠোঁটে। 'আমাকে বা ব্যারিকে এখন কিছুতেই চটাবে না খুনী। জানে, আমরা দু'জন ছাড়া সবাই

অচল। এক মাইল পথও পেরোতে পারবে না। আপনারা বরং প্রত্যেকে হুঁশিয়ার থাকুন। একজন লোক কমাতে পারলে রেশন বেঁচে যাবে, এই কথাটা ওদের উর্বর মস্তিষ্কে খেলতে পারে এখন।' কথাটা বলে খুশি মনেই কেবিন থেকে বেরিয়ে এল রানা।

থেমে এসেছে বাতাসের গতি। অ্যানিমোমিটারও আর তেমন শব্দ করছে না। তুষারপাত থেমে গেছে, আকাশে তারাও দেখা যাচ্ছে একটা-দুটো। গ্রীনল্যান্ডের আবহাওয়ার আকস্মিক বিচিত্র পরিবর্তনের প্রমাণ পেল রানা আবার।

'আবহাওয়া তো বেশ ভালই মনে হচ্ছে,' বলল রানা।

'বেশি খুশি হয়ো না,' চিন্তিত ব্যারি। আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। 'সকাল হতে হতেই বদলে যাবে আকাশের অবস্থা। আগামী বারো ঘণ্টার ভেতরই প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়বে।'

আর কিছু না বলে ট্রাক্টর শেডের কাছে এগিয়ে গেল রানা। টর্চ আর সার্চ লাইটের আলোয় ট্রাক্টরের প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজল। নেই। স্লেজ গাড়িটাতেও পাওয়া গেল না পিস্তল দুটো। কিছুতেই অস্ত্র ফেলে দেয়নি খুনীরা। তাহলে? কোথায় আছে ওগুলো?

ভাবতে ভাবতে শেড থেকে বেরিয়ে এল রানা। পুব আকাশের দিকে তাকিয়ে তাজ্জব হয়ে গেল। আলোয় আলোকিত হয়ে উঠেছে দিগন্ত। বিশাল চাঁদ উঠেছে, পূর্ণচাঁদ। উঠেই যেন অবাক হয়ে গেছে। নিচে বরফ, দূর দিগন্তে চাঁদের রূপালী আলো কেমন এক ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছে। সূর্য অস্ত যাবার সময় সাগরের বুকে যেমন লাল আলোর প্রতিফলন ঘটে, একটা লম্বা লাল মোটা রেখা ঝিলিমিলি করে পানিতে, তেমনি এক ধরনের প্রতিফলন ঘটেছে বরফে। লাল নয়, রূপালী। স্তব্ধ হয়ে সেই অপরূপ সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে রইল রানা। আজ বুঝল, গ্রীনল্যান্ডের মত বরফের দেশেও কেন জন্ম হয় কবির।

'আপলাভনিক,' নীরবতা ভাঙল ব্যারি। 'কালই তো আপলাভনিক রওনা হচ্ছি আমরা, না রানা?' আপনমনেই বলল, 'কিন্তু তার আগে একটা রাত…আজকের রাতটা ভালমত ঘুমিয়ে নিতে হবে।'

'কবিরা এরই নাম দিয়েছে বোধহয় পান্থজনের চাঁদ,' বিড়বিড় করে বলল রানা বাংলায়।

'কি বললে?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল ব্যারি।

'অ্যাঁ…ও, বলছিলাম কি, একেই বলে ট্র্যাভেলার্স মুন।'

'ঠিকই বলেছ,' সায় দিল ব্যারি। 'ট্র্যাভেলার্স মুন।'

শীতকালে এই বরফের রাজ্যে দিনের কোন মূল্য নেই ভ্রমণকারীদের কাছে। তারা রাতের এই চাঁদকেই পথের উপযুক্তদিশারী মনে করে। দিনের বেলা বিশ্রাম করে, আর রাতে চাঁদের আলোয় পথ দেখে চলে। বাতাস প্রায় স্তব্ধ। তুষারপাত একেবারেই নেই। আরও পরিষ্কার হয়ে গেছে আকাশ।

'কিছুদিন আপনাকে একাই থাকতে হবে, পোর্টার,' রেডিওম্যানের কাঁধে হাত রাখল রানা। 'পারবেন তো?'

'ও নিয়ে ভাববেন না,' শান্ত পোর্টার। 'তাছাড়া কাজ তো আছেই, সময় কেটে যাবে।'

'হ্যাঁ, সময় কেটে যাবে। ওই আর সি এ রেডিওটা যদি সারাতে পারেন, তাহলে তো অলৌকিক কাণ্ডই ঘটিয়ে ফেলবেন।'

'আমার সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

রেডিও সরানো গেলে কি করতে হবে বিস্তারিত জানাল রানা পোর্টারকে।

আবার কেবিনে ফিরে এল ওরা। যাত্রীরা যে যেখানে বসেছিল সেখানেই আছে, একচুল নড়েনি কেউ। তিনজনকে ঢুকতে দেখে চোখ তুলে তাকাল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না।

'আপনাদের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন,' কোনরকম ভণিতা ছাড়াই বলল রানা। 'যতটা পারেন গায়ে পোশাক চাপান। এখুনি রওনা হব আমরা।'

কি বলতে গিয়েও থেমে গেল ব্যারি।

এক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা শুরু হলো। পনেরো দিন স্টার্ট দেয়া হয়নি সিত্রোঁর ইঞ্জিন চালু করার জন্যে অনেক সাধ্য-সাধনা করতে হলো রানা, ব্যারি আর পোর্টারকে। শেষ পর্যন্ত চালু হলো ইঞ্জিন, বিকট শব্দে চমকে উঠল সবাই। অবাক চোখে ট্রাক্টরটার ওপর আরেকবার চোখ বোলাল যাত্রীরা, হতাশ হয়ে পড়েছে। কানের পর্দায় বাড়ি মারছে সিত্রোঁর ঝরঝরে ইঞ্জিনের বিচিত্র, বিকট, কর্কশ শব্দ। একমিনিটে মাথা ধরে যাওয়ার উপক্রম।

এসব ব্যাপারে খেয়াল দেয়ার সময় নেই রানার। সে ভাবছে, কাঠের আড়ালে শীতের আক্রমণ থেকে কতটা রেহাই পাবে যাত্রীরা। তার নিজের কপালে অবশ্য এই আড়ালটুকুও জুটবে না। প্রায় সারাক্ষণই বসে থাকতে হবে ইঞ্জিনের কাছে।

পোর্টারকে বিদায় জানাল সবাই। একে একে রানা, ব্যারি, শ্যারিন আর সুসানের সঙ্গে হাত মেলাল পোর্টার। অন্য সবাইকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল। দৃষ্টিকটু লাগল ঠিকই, কিন্তু পাত্তা দিল না রেডিওম্যান।

কেবিনের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল পোর্টার। ধীরে ধীরে পিছিয়ে ট্রাক্টর বের করে নিয়ে এল ব্যারি। তারপর স্লেজটা বের করতে গেল।

ভূতুড়ে শীতল চাঁদের আলোয় শুরু হলো যাত্রা। কেবিনের দক্ষিণ ঘুরে পশ্চিমমুখো হয়ে উপত্যকার খোঁজে রওনা হলো ওরা। সামনে তিনশো মাইল বরফে ঢাকা পথ। কেবিনের দিকে ফিরে চাইল ব্যারি। আর কি জীবনে পোর্টারের সঙ্গে দেখা হবে? ভাবছে সে।

রানা ভাবছে অন্য কথা। পোর্টারকে একা ফেলে রেখে আসা কি উচিত হলো? কিংবা সামনের অজানা ঘোর বিপদের মাঝে রিক ব্যারিকে টেনে আনা? ওর পাশেই বসে আছে এস্কিমো। গাড়ি চালাতে চালাতে আবছা চাঁদের আলোয় আড়চোখে ওর দিকে তাকাল রানা। ঠিক এস্কিমো বলে মনে হয় না ব্যারিকে। গালের উঁচু হনু না থাকলে বরং স্ক্যান্ডিনেভীয় নাবিক বলেই ভুল হত। এই বলে মনকে প্রবোধ দিল রানা, পোর্টারকে কেবিন পাহারা দেবার জন্যে থাকতেই হবে।

আর ব্যারিকে মানা করেও ঠেকাতে পারত না সে, আসতই। পাথরের মত নিশ্চল বসে রয়েছে ব্যারি। ওর চোখ দুটো সজাগ। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলাচ্ছে সামনে আর আশপাশের বরফের ওপর। বুঝে নিতে চাইছে কোথায় ওত পেতে রয়েছে অজানা ভয়ঙ্কর বিপদ। বরফে বিপদের অস্তিত্ব খুঁজে বের করা ওর কাছে স্বাভাবিক, সহজাত। ব্যারিকে সাহায্য করার জন্যে রয়েছে তার প্রিয় কুকুর রোল্টা। মানুষ হয়ে জন্মালে বরফের ওপর ডক্টরেট নিতে পারত বিশাল কুকুরটা। ক্রমশ সাগরে নেমে যাওয়া আপলাভনিকের তুষার-ঢাকা উপত্যকা যদি কেউ চিনে বের করতে পারে, তো ও-ই পারবে।

ঠিকই বলেছে ব্যারি, দ্রুত নামতে শুরু করেছে তাপমাত্রা। শূন্যের নিচে তিরিশ ডিগ্রী নেমে গেছে ইতোমধ্যেই। তবে আর কোন অসুবিধে নেই। বাতাস এখনও বন্ধ। আকাশে তারা ঝিকমিক করছে। বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে চাঁদের কোমল আলো। সামনে যতদূর চোখ যায়, মসৃণ সমতল বরফে ঢাকা ধরণী। ঝরঝরে হলেও চমৎকার কাজ করছে ইঞ্জিনটা। কোন গোলমাল নেই। তবে একঘেয়ে প্রচণ্ড কান ফাটানো শব্দটা অসহ্য। তারপর ঠাণ্ডার অবনতি বিরক্তিকর করে তুলছে তুষারযাত্রাটাকে।

কাঠের খাড়া উঁচু কেবিনের পেছনে কিছুই দেখা যায় না। কি ঘটছে না ঘটছে কিছুই বোঝার উপায় নেই। স্লেজটা আর কুকুরগুলো কিভাবে চলছে জানা যাচ্ছে না। উপায় বের করল ব্যারি। ধীর গতিতে চলছে ট্রাক্টর। প্রতি দশ মিনিট পরপর লাফিয়ে নেমে এসে পেছনের অবস্থা দেখছে সে।

কাঠের কেবিনে বসে বসে কাঁপছে একদল মানুষ। কেবিনের নিচে জ্বালানী তেল রাখার জায়গা, কাজেই স্টোভ জ্বেলে রাখাও বিপজ্জনক। ট্রাক্টরের পেছনে বাঁধা ভারী মালবাহী স্লেজটা ঠিকমতই আসছে। যাবতীয় রসদ আর মাল রয়েছে ওটাতে। একশো কুড়ি গ্যালন পেট্রোল, খাবারদাবার, বিছানা আর স্লিপিং ব্যাগ, তাঁবু, দড়ি, কুড়ুল, কোদাল, ট্রেইল-ফ্ল্যাগ, রান্নার সরঞ্জাম, কুকুরগুলোর জন্যে সীলের মাংস, বরফের ফাটল পেরোনোর উপযোগী সেতু তৈরির জন্যে তক্তা, ক্যানভাসের চাদর, ব্লো-টর্চ, ল্যাম্প, ওষুধপত্র, রেডিও সনডে বেলুন, ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার এবং আরও নানা টুকিটাকি জিনিস। বেলুনগুলো নিতে আপত্তি করেছিল রানা, কারণ এর জন্যে ভারী হাইড্রোজেন সিলিন্ডার বয়ে নিতে হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওগুলো নিতে বাধ্য করেছে ব্যারি, বুঝিয়েছে। রাজি না হয়ে পারেনি রানা। এই বরফের রাজ্যে ওই বেলুন অপরিহার্যই বলা চলে।

সব শেষে আসছে কুকুরে টানা স্লেজটা। খালি। রোল্টার গলায় চেন নেই, গাড়ির সঙ্গে জোড়া হয়নি ওকে। কখনও সঙ্গী কুকুরগুলোর পাশে থেকে হম্বিতম্বি করে, কখনও ট্রাক্টরের আগে আগে পথ দেখিয়ে ছুটছে ও। রাতের গহীন সাগরে সৈন্যবাহিনী জাহাজের পাশে প্রহরী ডেস্ট্রয়ারের কাজ করছে যেন কুকুরটা।

প্রথম বিশ মাইল সহজেই পেরিয়ে এল ওরা। মাস চারেক আগে যখন এসেছিল ডাক্তার ব্রাউনের বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রী দলটা, আধ মাইল পরপর কিছু ট্রেইল-ফ্ল্যাগ পুঁতে পুঁতে এগিয়েছিল। উজ্জ্বল কমলা রঙের অ্যালুমিনিয়মের খুঁটিগুলো চাঁদের

আলোয় দূর থেকেও নজরে আসছে। খুঁটির মাথায় ফ্ল্যাগগুলো বরফে জমে টিনের পাতের মত শক্ত হয়ে গেছে। পতাকার সঙ্গে লম্বালম্বিভাবে জমেছে তুষার, শক্ত হয়ে খুঁটির মত বেরিয়ে রয়েছে বাইরের দিকে। অদ্ভুত দৃশ্য। চলতে চলতে মোট বিশটা ফ্ল্যাগ দেখতে পেল ওরা। মাঝে মাঝে অদৃশ্য হয়েছে খুঁটি। ব্যারি হিসেব করল বারোটা খুঁটি নেই। ঝড়ে উড়ে গেছে হয়তো। বিশ নম্বরেরটাই শেষ, এরপর অনেকখানি পথ পেরিয়ে এসেও আর খুঁটির হদিস মিলল না।

'গোলমাল শুরু হলো নাকি, রিক?' বলল রানা।

'মনে হচ্ছে,' গম্ভীর মুখে বলল এস্কিমো। 'ঠাণ্ডাও বাড়ছে, টের পাচ্ছেন?' বলতে বলতে পেছনের ব্র্যাকেট থেকে ম্যাগনেটিক কম্পাসটা খুলে নিল রিক। ড্যাশবোর্ডের নিচে রাখা একটা স্পূল থেকে তার খুলে নিয়ে লাফিয়ে নিচে নামল। ট্রাক্টর থামিয়ে তাকে সাহায্য করতে রানাও নামল। উত্তর মেরু এখান থেকে হাজার মাইলেরও বেশি দূরে। সামান্য ভুলভ্রান্তি বাদ দিলে খারাপ কাজ করবে না এখানে চুম্বক কম্পাস। ট্রাক্টরের বিশাল ধাতব দেহটার নিজস্ব আকর্ষণ ক্ষমতা এড়ানোর জন্যে কম্পাস নিয়ে একটু দূরে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল ব্যারি। যতটা সম্ভব নিখুঁত রিডিং চায় সে। নতুন আরেকটা মতলব এসেছে তার মাথায়। রানাকে জানালে সে-ও একমত হলো ব্যারির সঙ্গে। ঠিক হলো, মালবাহী স্লেজে কম্পাস নিয়ে থাকতে হবে একজনকে। ওখান থেকে লাইন এনে লাগানো হবে ড্যাশবোর্ডে, তাতে লাল আর সবুজ আলোর ব্যবস্থা থাকবে। পেছনে স্লেজে বসে এই আলোর সঙ্কেতের সাহায্যে কম্পাসে রিডিং অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেয়া হবে চালককে। এটা কোন নতুন আবিষ্কার নয়। পঞ্চাশ বছর আগে মেরু অভিযানের সময়ও এই পদ্ধতি ব্যবহার করেছে অভিযাত্রীরা।

ব্যারিকেই স্লেজে তুলে দিল রানা। তারপর কেবিনের পেছনে ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল। বিচিত্র দৃশ্য। মাথার ওপরে ঝোলানো অল্প পাওয়ারের বালবের ম্লান আলোয় বড় করুণ বড় অসহায় মনে হচ্ছে যাত্রীদের শীতে কাতর ফ্যাকাসে মুখগুলো। দাঁতে দাঁত চেপে বসে আছে ওরা। কিন্তু এদের মাঝেই লুকিয়ে রয়েছে দু'জন খুনী, ভাবতেই মনটা বিষিয়ে উঠল রানার।

'বেশিক্ষণ থামব না এখানে,' সকলের দিকে নজর বুলিয়ে নিয়ে বলল রানা, 'এখুনি রওনা হব আবার। একজন কাউকে দরকার, চারদিকে খেয়াল রাখতে হবে চলার সময়। কে আসছেন?'

সঙ্গে সঙ্গেই রাজি হয়ে গেল ক্লেটন আর ওয়াকার, দু'জনেই আসতে চায়।

'এক সঙ্গে দু'জন এলে শক্তির অপচয় হবে আমাদের,' আপত্তি জানাল রানা। 'তাছাড়া সমর্থকদের আগেই দুর্বল করে ফেলতে চাই না। পরে আপনাদের দু'জনকেই আরও বেশি দরকারী কাজে লাগতে হতে পারে। তাই আমি বলছি কি, মিস্টার শরাফী, আপনিই বরং আসুন।'

অসুস্থ আর রক্তশূন্য ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে শরাফীকে। কিন্তু তবু নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সায় দিল লোকটা।

'ওয়াকার আর আমি বোধহয় সন্দেহের প্রথম সারিতেই রয়েছি, তাই না,

মাসুদ রানা?' ক্ষোভ কিংবা রাগ কিছুই প্রকাশ পেল না ক্লেটনের গলায়। শান্ত কণ্ঠস্বর।

'আপনাদের নিচের সারিতে রাখার মত প্রমাণ মেলেনি এখনও,' রানাও শান্ত ভাবেই বলল। শরাফীকে নামতে সাহায্য করল সে। তারপর তাকে নিয়ে ঘুরে এসে উঠল ড্রাইভিং সীটে। পাশে বসল শরাফী।

একটা ব্যাপারে আশ্চর্যই হলো রানা। হঠাৎই যেন কথা বলার জন্যে খুব বেশি রকম আগ্রহী হয়ে উঠেছে শরাফী। লোকটার কথাবার্তা ও চালচলনের অনেক কিছুই খাপ খাওয়াতে পারছে না রানা। কোথায় যেন একটা গোলমাল রয়ে গেছে। কোথাও যেন একটা বিরাট দুঃখ রয়েছে তার, রয়েছে অপরিসীম হতাশা।

'আপনার আমেরিকা যাবার ব্যাপারটা ওলটপালট হয়ে গেল, না মিস্টার শরাফী?' প্রশ্ন করল রানা। ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দের জন্যে জোরে কথা বলতে হচ্ছে।

'আমেরিকা আমার মিড স্টপেজ ছিল,' দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে বৃদ্ধ লোকটির। 'আসলে প্যালেস্টাইনে যেতাম আমি।'

'ওখানেই থাকেন আপনি?' আরবীতে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাঁ করে চেয়ে রইল শরাফী, কিছুই বুঝল না। আবার প্রশ্নটা করল রানা ইংরেজীতে। উত্তর এল সাথে সাথেই।

'জীবনে এই প্রথম যাচ্ছিলাম,' ইঞ্জিনের শব্দের মাঝ দিয়ে শোনা গেল তার অস্পষ্ট কথা।

'নতুন করে জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন নাকি নিজের দেশে?'

'আর নতুন জীবন। আগামীকাল আমার ঊনসত্তর বছর পুরো হবে,' কেমন একটু বেপরোয়া কণ্ঠে কথা বলল শরাফী। 'নতুন জীবনের আর সময় কোথায়? বরং বলতে পারেন, পুরানো জীবনটাকেই শেষ করতে যাচ্ছি।'

'তবুও তো সেখানে বাস করতেই চলেছেন। ঊনসত্তর বছর বয়সে একটা নতুন দেশ দেখতে যাচ্ছেন, তাই বা কম কি?'

'আমার দুর্ভাগ্য, রানা,' হতাশা ঝরছে শরাফীর কণ্ঠে। 'সারাটা জীবন ব্রিটেনে কাটিয়ে আজ শেষ বয়েসে স্ত্রী হারিয়ে দেশছাড়া...' চমকে থেমে গেল ফিলিস্তিনী বৃদ্ধ।

'স্ত্রী হারিয়ে দেশছাড়া!' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল রানা। অবাক চোখে তাকাল শরাফীর দিকে।

'কয়েকদিন আগে মারা গেছে আমার স্ত্রী,' কথায়ই বোঝা গেল কিছু একটা গোপন করতে চাইছে বৃদ্ধ। 'আর দেশ ছাড়া বলব না তো কি? জন্মের পর থেকে এই বুড়ো বয়েস পর্যন্ত যেখানে কাটালাম, সেটা তো নিজের দেশের মতই হয়ে গেছে।'

'তা ঠিক!' আপন মনেই মাথা ঝাঁকাল রানা। লোকটাকে এখনও ঠিক বুঝতে পারছে না সে। 'কিন্তু ব্যাপারটা কেমন যেন।'

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' রানার কথায় বাধা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠল শরাফী। 'আমি নাহয় বিদেশী, চলে যাচ্ছি নিজের দেশে—কতজন যে ব্রিটিশ হয়েও

দেশছাড়া হচ্ছে, তার ইয়ত্তা আছে? আমার এক বন্ধুর কথাই ধরুন না. ···রবার্ট হ্যানসন···আমার মতই বয়েস হবে। সারাটা জীবন ব্রিটেনে কাটাল। শেষ বয়েসে, দেশ ছেড়ে আমেরিকায় পাড়ি জমাল—এই কিছুদিন আগে মারা গেছে তার স্ত্রী, দুর্ঘটনায়।'

'দুর্ঘটনায়?'

'দুর্ঘটনায়,' কথাটা বলতে বলতে কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল শরাফী। নিজের স্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেছে হয়তো। 'ভদ্রলোক ব্রিটিশ, বিজ্ঞানী। পরমাণু নিয়ে গবেষণা করতে করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে ফেলল। অথচ দেশের লোকই ভুল বুঝল তাকে।' চুপ করল বৃদ্ধ।

'কেন?'

'কেন আবার। কলম্বাসকে কেন পাগল বলেছিল তৎকালীন স্পেনের কিছু বিখ্যাত প্রফেসর? অহঙ্কার, বুঝেছেন, স্রেফ অহঙ্কার। গুমরের ঠেলায় মাটিতে পা পড়ে না তাদের। নিজেদের চেয়ে কারও ঘিলু বেশি থাকতে পারে, স্বীকারই করতে চায় না।'

'আপনার বন্ধুর সঙ্গে কে দেমাক দেখিয়েছিল?'

'ওই ওরাই, মানে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা কিছু প্রফেসর, বিজ্ঞানী। তাদের কাছে নিজের আবিষ্কার নিয়ে গিয়েছিল রবার্ট। ব্যাটারা পাত্তাই দেয়নি। অবজ্ঞার হাসি হেসেছে। উল্টোসিধে বলে স্রেফ হাঁকিয়ে দিয়েছে ওকে।'

'তারপর?' শরাফীর দিকে তাকাল রানা। কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

'অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসররা আবিষ্কারের ফরমুলা রবার্টকে ফিরিয়ে দেবার দিন সাতেক পরে এক সন্ধ্যায় ওর বাড়িতে এসে হাজির হলো এক বিদেশী। অচেনা। সরাসরি এক প্রস্তাব রাখল সে।'

'প্রস্তাব?'

'ফরমুলাটা কিনে নিতে চাইল এক লক্ষ পাউন্ডের বিনিময়ে। দশ লক্ষ পর্যন্ত দাম বলল লোকটা। চাইলে আরও টাকা দিতে রাজি আছে এমন ভাবও দেখাল। কিন্তু কিছুতেই রাজি হলো না রবার্ট। শেষে তাকে ভেবে দেখার জন্যে এক দিন সময় দিয়ে চলে গেল লোকটা।'

'ফরমুলাটা বিক্রি করেছিল রবার্ট?'

'শুনুনই না আগে। পরদিন আবার গিয়ে ইউনিভার্সিটিতে হাজির হলো রবার্ট। আগের সন্ধ্যার ঘটনা সবিস্তারে জানাল প্রফেসরদের। ওরা তো হেসেই খুন। জলদি গিয়ে ফরমুলা বেচে দেবার পরামর্শ দিল।' থামল শরাফী। সামনের বরফ ঢাকা চাঁদের আলোর দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল। তারপর বলল, 'জানেন, অনেক খুঁজে-পেতে ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ পর্যন্ত গিয়ে ধরনা দিয়েছিল রবার্ট।'

'ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ! কেন?'

'পরের দিন আবার এসেছিল অচেনা লোকটা। কিন্তু ফরমুলা বেচেনি রবার্ট। তাকে প্রলোভন ও হুমকি দিয়ে আরও দু'দিন ভাবার সময় দিয়ে বিদায় হয়েছিল লোকটা। প্রথমে পুলিস, তারপর M16 পর্যন্ত গিয়েছিল রবার্ট। কিন্তু কোন

প্রোটেকশন পায়নি। । কেউ বিশ্বাসই করেনি ওর কথা, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যোগাযোগ করে জেনেছে রবার্টের সবকিছু বোগাস। শুনে সবাই মিলে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে ওর সব কথা। দু'দিন পরে ঠিকই এল অচেনা লোকটা। এবারে আর একা নয়। দলবল সহ। রবার্টের বাড়ি ঘেরাও করল ওরা। পেছনের দরজা দিয়ে কোনমতে জান নিয়ে পালাল রবার্ট···।'

'কিন্তু তাঁর স্ত্রী মারা পড়লেন। না?'

'আপনি জানলেন কি করে?' ভুরু কুঁচকে রানার দিকে তাকাল শরাফী।

'অনুমান।'

'হ্যাঁ, ঠিকই অনুমান করেছেন,' মাথা ঝাঁকাল শরাফী। 'গুলি খেয়ে মারা গেল রবার্টের স্ত্রী। তারপর···'

এই সময় ব্যারির সিগন্যালে বাধা পড়ল শরাফীর কথায়। প্রতি বিশ মিনিট পরপর ব্যারির সঙ্গে পালা করে জায়গা বদল করছে রানা। রাতের দীর্ঘ মুহূর্তগুলো কাটছে ধীরে ধীরে। ঠাণ্ডাও বাড়ছে ক্রমেই। আকাশের তারাগুলো কেমন যেন কাঁপছে থির থির করে। চাঁদের আলোও কেমন ঘোলাটে হয়ে এসেছে। তার মানে ডুবে যেতে বেশি দেরি নেই। অন্ধকার নামবে আর কিছুক্ষণ পরেই। মেরু রাত্রির ভয়ঙ্কর কালো অন্ধকার। আলোর সঙ্কেত পেয়ে ট্রাক্টর থামাল রানা। ব্যারি আসতে চায় এবার। আবার চলার আগে কিছু খেয়ে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল রানা। বিশ্রামও দরকার। কেবিনে বসেই খাওয়ার পালা সারা হলো। চিনি ছাড়া কালো কফি আর খানকয়েক বিস্কুট। খেতে খেতেই সকলকে জানাল রানা, ঘণ্টাতিনেক বিশ্রাম নিয়ে নিতে পারে তারা। ঠাণ্ডা আর অবসাদে চোখ লাল হয়ে উঠেছে ওদের, দেখতে পাচ্ছে সে।

রানার পাশে বসেই খাওয়া সারল শরাফী। লোকটার মাঝে একটা অস্থিরতা আর চঞ্চলতা নজর এড়াল না তার।

শরাফী কফি খাওয়া শেষ করতেই তার সঙ্গে কিছু গোপন আলাপ আছে, বলল রানা। বাইরে বেরোনোর অনুরোধ করল। রানার দিকে একটু অবাক হয়েই তাকাল বৃদ্ধ, তারপর মাথা ঝাঁকাল। ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে ধরল রানা। নেমে গেল শরাফী।

পনেরো সেকেন্ড পর রানাও নেমে এল। শরাফীকে নিয়ে এগিয়ে ট্রাক্টর থেকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াল। শরাফীও দাঁড়িয়ে পড়েছে। ঘুরে বৃদ্ধের মুখে টর্চের আলো ফেলল রানা। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল, মিট মিট করে চাইল শরাফী। এক মুহূর্ত। তার পরেই আলোটা সরিয়ে আনল আবার রানা।

'মিস্টার শরাফী,' ধীরে সুস্থে বলল রানা। 'জীবনের ওপর আপনার বিতৃষ্ণা জন্মেছে, বুঝতে পারছি। কেন, জানি না। জানালে বাধিত হব। আর একটা ব্যাপার, চিনি চুরি করেছেন কেন?'

পারকা, আইস-মাস্ক, দু-দুটো ওভারকোট, জ্যাকেট, গোটা তিনেক সোয়েটার, স্কার্ফ আর দুটো প্যান্ট পরা ছোট্ট মানুষটি কেমন এক অসহায় দৃষ্টিতে তাকাল রানার দিকে।

'কি হলো?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা, 'কথা বলছেন না কেন?'

'চুরি করেছি,' নিচু লজ্জিত গলায় জানাল শরাফী, 'কিন্তু কেন করেছি, সত্যিই কি জানার দরকার আছে?'

'আছে। এরকম একটা বাজে কাজ আপনাকে মানায় না। আপনার দুর্ভাগ্য, কেবিনে চিনি চুরির কথা উঠেছিল যখন, আপনার মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। চমকে উঠেছিলেন। আর একটু আগে কফি খাচ্ছিলেন, ওতে সবার অলক্ষ্যে কিছু মেশাচ্ছিলেন, দেখতে পেয়েছি। পরে কেবিন থেকে আপনাকে বের করে দিয়ে তলানীটুকু জিভে ঠেকিয়ে দেখেছি, অসম্ভব মিষ্টি, মুখে তোলা দায়। তা বালবগুলোও কি আপনিই চুরি করেছেন?'

'না,' স্থির শান্ত শোনাল শরাফীর গলা। কণ্ঠে অপরাধবোধের চিহ্নও নেই। 'বিশ্বাস করুন, ওসব জিনিস ছুঁইওনি আমি। কয়েক মুঠো চিনিই সরিয়েছিলাম কেবল। পুরো তিরিশ পাউন্ড নয়, শুধু কয়েক মুঠো।'

'বিশ্বাস কি আপনাকে?'

'আমাকে সার্চ করুন। আমার ব্যাগ খুলে দেখুন।'

'কিন্তু চিনির ওপর এই লোভ কেন?' আপন মনেই বলতে বলতে শরাফীর কাছে ঝুঁকে এল রানা। একটানে লোকটার মাস্ক তুলে দিল ওপরে। আরেকবার টর্চের আলো ফেলল মুখে। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় নীল হয়ে গেছে মুখটা। গালের হনু দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। ঠাণ্ডায় ঠক ঠক করে দাঁতে দাঁত বাড়ি খাচ্ছে।

শরাফীর নাকের কাছে নিজের নাক নিয়ে এল রানা, 'শ্বাস নিন, ছাড়ুন।'

জোরে একবার শ্বাস নিয়ে ফেলল শরাফী। অ্যাসিটোনের মিষ্টি গন্ধ নিঃশ্বাসে। কোন সন্দেহ নেই, পুরানো বহুমূত্র রোগ। নির্বাক কয়েকটা মুহূর্ত পেরিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল রানা, 'কতদিন ধরে চলছে এটা?'

'তিরিশ বছর।'

'বড় বেশি বাড়িয়ে ফেলেছেন ইদানীং, না?'

'আমার ডাক্তারও ওই কথা বলবেন এখন,' হাসিটা বড় করুণ দেখাল শরাফীর, 'আমিও জানি।'

'রোজ কবার ইঞ্জেকশন নিতে হয়?'

'দু'বার। সকালে চা খাবার আগে, আর সন্ধ্যায়।'

'কিন্তু আপনাকে তো ইঞ্জেকশন নিতে দেখলাম না একবারও!'

'সব সময়ই সঙ্গে থাকত আগে, এবারে নেই। নিতে ভুলে গিয়েছি। গ্যান্ডারে তাড়াহুড়ো করে এক ডাক্তারখানায় গিয়ে একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে প্লেনে চেপেছি, সেটাই শেষ। কার্ড রয়েছে সঙ্গে, ওটা দেখিয়ে যে কোন ডাক্তারখানা থেকেই ইঞ্জেকশন নিতে পারি।'

'এখানে তো কোন ডাক্তারখানা পাবেন না,' সহানুভূতি ঝরল রানার গলায়। 'তার ওপর বেশি করে চিনি খাচ্ছেন, যা খাওয়া আপনার জন্যে হারাম। বিষ।'

'খাচ্ছি, আরও খাব। ওই বিষ খেয়ে মরেই যাব। কেউ তো আর নিষেধ করে না এখন, বাধা দেয় না। আর বেঁচে থেকেই বা কি লাভ, বলুন?' গড়গড়িয়ে বলে

ফেলল বৃদ্ধ।

লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবল রানা। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল, 'জীবনের ওপর আপনার বড় বিতৃষ্ণা, মিস্টার শরাফী, বুঝতে পারছি। আরও বুঝতে পারছি সাংঘাতিক কিছু একটা ঘটেছে আপনার জীবনে—যাকগে, এখন আসুন, কেবিনে যাই।' ঘুরে দাঁড়াল রানা।

সাত

শরাফীকে নিয়ে আবার ট্রাক্টরের কেবিনে ফিরে এল রানা। ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে উঠে গেল ওপরে। তারপর হাত বাড়িয়ে টেনে তুলল বৃদ্ধকে। সবাই কফি খাচ্ছে। এই একটা জিনিসই প্রচুর রয়েছে সঙ্গে। চিনি ছাড়া কফি, কিন্তু এই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় গরম তরল পদার্থটুকু অমৃতের মত লাগছে ওদের কাছে।

'তাড়াতাড়ি সারুন,' তাড়া লাগাল রানা। ব্যারিকে ডেকে বলল, 'রিক, ইঞ্জিন স্টার্ট দাও। পাঁচ মিনিটের ভেতরই রওনা হব আমরা।'

'পাঁচ মিনিট!' প্রতিবাদ করল ডুলানী, 'বেশ মজার মানুষ তো আপনি, সাহেব? মজা করছেন, নাকি কথা মনে থাকে না আপনার? এই তো বললেন, তিন ঘণ্টা থাকবেন এখানে। এখন আবার বলছেন পাঁচ মিনিট।'

'তখন মিস্টার শরাফীর অসুখের ব্যাপারটা জানতাম না,' অল্প কথায় তাড়াতাড়ি বোঝাতে চাইল রানা। 'যে-কোন সময় মারা যেতে পারেন উনি। দুটো জিনিস এখন তাঁর প্রাণ বাঁচাতে পারে। বেশি বেশি প্রোটিন আর ক্যালরি রয়েছে এমন খাবার এবং প্রচুর ইনসুলিন। অ্যাকিউট ডায়াবেটিসে ভুগছেন উনি। রোগটা সাংঘাতিক রকম বেড়ে গেছে এখন। ওই সব দরকারী ওষুধ-পথ্য আমাদের কাছে নেই। কাজেই যতটা সম্ভব দ্রুত ছুটতে হবে। উপকূলে পৌঁছতে হবে তাড়াহুড়ো করে। তুষার ঝড় বা এমনি কোন বাধা না এলে, কিংবা ইঞ্জিন না বিগড়ালে থামছি না আমরা। কারও কোন আপত্তি আছে?'

কেউ কোন আপত্তি করলেও শুনবে না রানা, কিন্তু তবু ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা রাখল সে। তার আন্তরিক ইচ্ছে, কেউ প্রতিবাদ করুক। তাহলে মনে চেপে রাখা ধিকিধিকি ক্রোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে পারে। যারা এতগুলো লোকের এই অবস্থার জন্যে দায়ী, তাদের লোক এখানে, এই কেবিনেই রয়েছে। তাদের চোখ উপড়ে নেয়ার জন্যে নিশপিশ করছে হাত। কিন্তু ওরা কারা, জানাই নেই এখনও।

কারও কাছ থেকেই কোন প্রতিবাদ এল না। প্রতিবাদ করার অবস্থাও নয় এখন। ঠাণ্ডা আর ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়েছে ওরা। ক্রমেই কমে আসছে শরীরের তাপ। কথা বাড়ানোর ইচ্ছে নেই কারোই।

আপত্তি করল না কেউ, কিন্তু অনুরোধ এল দুটো। দুটোই এল জন ওয়াকারের কাছ থেকে।

'রানা, মানে, বলছিলাম কি,' বলল ওয়াকার, 'মিস্টার শরাফীর প্রয়োজনীয় প্রোটিন পুরোপুরি দিতে না পারলেও কিছুটা তো অন্তত পারব আমরা। ওর ভাগের রেশনটা বাড়িয়ে দিলে কেমন হয়? যদিও তেমন কিছু বাড়বে না, তবু? আমরা সবাই যদি নিজেদের ভাগের খাবারের চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দিই তাঁকে...'

'কিছুতেই নেব না আমি,' প্রতিবাদ করল শরাফী। 'ধন্যবাদ, ওয়াকার, কিন্তু আপনার প্রস্তাব কিছুতেই...'

'বেশ ভাল প্রস্তাব,' শরাফীর কথায় কান না দিয়ে বলল রানা। 'আমিও এরকম কিছু ভাবছিলাম।'

'ঠিক আছে,' মৃদু হাসি ফুটল ওয়াকারের মুখে। 'তাহলে ধরে নিচ্ছি আমাদের সবাই-ই এই প্রস্তাবে রাজি। দ্বিতীয় অনুরোধটা হলো, আমি আর ক্লেটন, দুজনেই ট্রাক্টর চালাতে পারব। আমাদের দুজনের যে-কোন একজনকে— না না প্রতিবাদ করবেন না,' হাত তুলল সে, 'ধরেই নিন আমি খুনী। বরফে চলাচলের নিয়মকানুন জানি না, সিত্রোঁটা সামলানো আমার জন্যে কঠিন, তুষারখাতে পড়ে যেতে পারি ভুল করে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমাকে ট্রাক্টর চালাতে দিলে কোন ক্ষতি নেই। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যেই অতিরিক্ত সাবধান হব আমি। উপকূলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোই আসল কথা—রাজি আছেন?'

'রাজি,' বলল রানা। তার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ উঠল। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়েছে ব্যারি। ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে বলল রানা, 'আসুন, নেমে আসুন। আপনার ট্রাক্টর ড্রাইভিঙের ইন্টারভিউ হয়ে যাক।'

আবার যাত্রা শুরু হলো। বাতাসের নাম গন্ধও নেই। নীলাভ কালচে আকাশের রঙ, মেঘের চিহ্ন নেই। দূরের আকাশে তেমনি থির থির কাঁপছে তারাগুলো। চাঁদ ডুবে গেছে। পরিবেশটাকে কেমন অবাস্তব অপার্থিব বলে মনে হচ্ছে। গভীর রাত বললে ভুল হবে না, অথচ ক্রোনোমিটার ঘোষণা করছে সকাল সাড়ে সাতটা। আশ্চর্য এক দেশ!

বাতাস নেই ঠিকই, কিন্তু বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎই তুষার পড়তে শুরু করল। হালকা পেঁজা তুলোর মত তুষার। নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে জমাট বরফের ওপর। দৃষ্টি শক্তি বাধা পাচ্ছে না তেমন। সিত্রোঁর শক্তিশালী হেডলাইট ঠিকরে পড়ছে তিনশো গজ দূর পর্যন্ত, চিকমিক করে লক্ষ-কোটি হীরের মত জ্বলছে তুষারকণা। ট্রাক্টরের দুপাশে অনেক বেশি গাঢ় হয়ে উঠেছে অন্ধকার। তাপমাত্রা নেমে যাচ্ছে। অবিরাম ছুটছে ট্রাক্টর।

ভাগ্য ওদের সহায়ই বলতে হবে। মিনিট পনেরো পরেই দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘন অন্ধকার থেকে ছুটে এল রোল্টা, স্লেজের পাশ দিয়ে ছুটতে ছুটতে চেঁচাতে লাগল। ব্যারির মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাইছে।

ট্রাক্টরের ড্যাশবোর্ডে লাল আর সবুজ আলোর সঙ্কেত দেখিয়ে থামতে বলল ব্যারি। থেমে গেল ট্রাক্টর। রানার পাশে এসে দাঁড়াল ব্যারি। বলল, 'একটু দাঁড়াও এখানে। আমি আসছি।'

রোল্টার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল এস্কিমো। ফিরে এল মিনিট তিনেক পরেই। হাসি ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। 'একটা ফ্ল্যাগ!'

সুখবর। ঠিক পথেই চলেছে ওরা, বুঝতে পারল রানা। ওই পতাকাটার পরে যদি আরও কিছু পতাকা পাওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিন্তে এগিয়ে যেতে পারবে ওরা। রানা আর ব্যারি কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে নিতে পারবে। ওয়াকার ততক্ষণ চালাতে পারবে ট্রাক্টর।

পতাকাটা একটা সারির প্রথম বলেই প্রমাণিত হলো। এরপর ঘণ্টাখানেক ব্যারি, ওয়াকার, ক্লেটন আর রানা পালা করে ট্রাক্টর চালাল। তাদের পাশে বসে পালা করে চারদিকে নজর রাখল সিনেটর ম্যাক্সওয়েল, রেভারেন্ড নিউবোল্ড এবং মুষ্টিযোদ্ধার ম্যানেজার মার্টিন। ওদের কাজটা শুনতে সহজ মনে হলেও আসলে ড্রাইভিঙের চাইতে অনেক কষ্টকর। একঘেয়ে, ক্লান্তিকর। প্রচণ্ড শীতে থর থর করে কাঁপছে, কিন্তু কোন প্রতিবাদ করল না তিনজনের কেউই। পালা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কেবিনে ঢুকল।

আটটার অনেক পরে ব্যারি আর ওয়াকারের হাতে ট্রাক্টর চালানোর ভার দিয়ে কেবিনে এসে ঢুকল রানা। ভেতরে এসে সবচেয়ে কঠোর নিয়মটা নিজেই ভেঙে বসল। চলার সময়ে ট্রাক্টরে আগুন জ্বালানো একেবারেই নিষেধ, তার ওপর নিচে যদি তেলের ট্যাঙ্ক থাকে, তাহলে তো কথাই নেই। কিন্তু প্রয়োজনের সময়ে নিয়ম না ভেঙে উপায় নেই। এই মুহূর্তে তার নিজের আরাম আয়েশের জন্যে একটুও মাথা ব্যথা নেই রানার, খাবার তৈরির জন্যেও নয়, স্টোভ জ্বালল সে মুস্তাফা শরাফীর জন্যে। উত্তাপ দরকার এখন অসুস্থ লোকটার।

উপযুক্ত খাদ্য দেয়া যাচ্ছে না শরাফীকে। নেই। তাছাড়া সামান্যতম দৈহিক পরিশ্রম করতে দেয়া যাবে না তাকে। কেবিনে ঢুকে আগে একটা স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে শরাফীকে ভরল রানা। তারপর তুলে দিল একটা তাকে। কিন্তু এতে তেমন লাভ হবে না। প্রচণ্ড এই ঠাণ্ডা থেকে বাঁচতে হলে হাত-পা নড়ানো একান্ত প্রয়োজন। নইলে ঠাণ্ডা আরও জেঁকে ধরবে দেহকে। স্টোভ জ্বালানো ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে আছে শরাফীর শরীর। প্রচুর প্রতিবাদ জানাল, কিন্তু কান দিল না রানা।

সবাই হঠাৎ যেন অতিরিক্ত মনোযোগী হয়ে পড়েছে শরাফীর প্রতি। নিঃস্বার্থ দরদ দেখাচ্ছে না ওরা, বরং এর ভেতর লুকিয়ে রয়েছে একটা চাপা স্বার্থপরতা। আসলে মানসিক যন্ত্রণা থেকে রেহাই পেতে চাইছে ওরা। আর যে দুজন খুনী, তারা তো নিজেদের ধরিয়ে না দেবার জন্যেই শরাফীর সেবা করবে।

একটা উপসর্গও কিন্তু দেখা দিয়েছে এই সেবাপরায়ণতার মাঝ দিয়ে। প্রবল মানসিক চাপ আর অস্বাচ্ছন্দ্য ছোট ছোট দলে ভাগ করে ফেলেছে যাত্রীদের। পরস্পরকে কথার তীর মেরে ঘায়েল করার শহুরে প্রবণতা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া কথাও বলতে চাইছে না কেউ।

সুসান গিলবার্ট আর শ্যারিন জেনে গেছে ওরা আর সন্দেহভাজন নয়, তাই নিজেদের মাঝে একান্তে কথা চলছে ওদের। দুজনের মাঝে নিজেদের সীমাবদ্ধ করে

নিয়েছে ডেরেক ক্লেটন আর টম মার্টিন। আশ্চর্য, চব্বিশ ঘণ্টা আগে যা কল্পনাও করা যায়নি, ফিসফিস করে হালকা কথাবার্তা চলছে ভারনন ডুলানী আর মার্থা হফম্যানের মাঝে। পরিস্থিতি কোন্ দিকে টেনে নিয়ে চলেছে ওদের, সবাই বুঝতে পারছে এখন। সকলেই জানে, সুসান আর শ্যারিন অপরাধী নয়, আর এই চিন্তাটাই অন্যদের কাছ থেকে আলাদা করে রাখল দুজনকে, তাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই। শরাফীর তো কথা বলার মত অবস্থাই নেই। সিনেটর, ওয়াকার আর রেভারেন্ড নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, অন্য কারও দিকে নজর দেবার মত মনের অবস্থা কিংবা ইচ্ছে আদৌ দেখা যাচ্ছে না ওদের মাঝে।

ক্যানভাসের পর্দার কাছে বসে রয়েছে ক্লেটন। স্টোভটা ঠিকমত জ্বলছে কিনা পরীক্ষা করছে রানা।

'দারুণ জিনিস তো!' হঠাৎ শোনা গেল ক্লেটনের গলা, 'রানা, দেখে যান!'

পর্দার কাছে এসে বসল রানা। 'কি?'

'ওই দেখুন,' পর্দা সামান্য ফাঁক করে হাত তুলে দেখাল ক্লেটন।

দেখল রানা। দূরে, উত্তর-পশ্চিম কোণে দিগন্তরেখার অনেক উঁচুতে বিশাল নিরাকার একগুচ্ছ আলোকমালা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। গম্বুজাকৃতি মেরু আকাশের অন্ধকারে বহুদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে ওই আলো। কোন নির্দিষ্ট একটা রং নয়, বেশ কয়েকটা রঙের মিশ্রণে রঙীন হয়ে উঠেছে ওই আলোকমালা। ভাষায় এর সঠিক বর্ণনা দেয়া অসম্ভব।

'অরোরা বোরিয়ালিস,' বলল রানা। 'নর্দার্ন লাইটসও বলে অনেকে। এই প্রথম দেখলেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল ক্লেটন। 'দেখার মত জিনিস!'

'এটুকু দেখেই বলছেন? এ তো কিছুই না, সবে শুরু হয়েছে। একটু পরেই দেখবেন কত রকমের রশ্মি, রেখা, জ্যোতিচ্ছটা, রামধনু আর আরও কত কিছু। মেরুর এই সৌন্দর্য দেখলে জীবনে ভোলা যায় না।'

'প্রায়ই এরকম দেখা যায় নাকি এখানে?'

'আবহাওয়া ভাল থাকলে প্রায়ই দেখা যায়। প্রথমবার তো, তাই এত ভাল লাগছে। বাসি হয়ে গেলে আর অতটা ভাল লাগে না।'

'বলেন কি? এত চমৎকার জিনিস, আর আপনি বলছেন ভাল লাগবে না! আপনার ভাল লাগছে না এখন?'

'যদি এটা শখের তুষাযাত্রা হত, ভাল লাগত কিনা বলতে পারছি না। তবে এখন যে পরিস্থিতি, তাতে অরোরা বোরিয়ালিস আমাদের ক্ষতিই করছে।'

'মানে?'

'কেন, ডাক্তার ব্রাউন কি বলেছিলেন, ভুলে গেছেন? যতক্ষণ ওই বোরিয়ালিস থাকবে, কোন ধরনের রেডিও সিগন্যাল ধরতে পারার আশা নেই।'

'রেডিও সিগন্যাল?' ভুরু তুলল ক্লেটন। 'আর সি এ যন্ত্রটা তো শেষই হয়ে গেছে। আর ওটা ভাল থাকলেই বা কি লাভ হত আমাদের?'

'কেবিনেরটা নষ্ট হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু উপকূলের রেডিওগুলো তো নষ্ট

হয়নি। এখন আপলাভনিকের রেডিওগুলোও আমাদের সিগন্যাল ধরতে পারবে না।'

'কিন্তু রেডিও কোথায়?'

'কেন, ট্রাক্টরের রেডিওটার কথা ভুলে গেছেন এরই মধ্যে? ছোট রেডিওটা?' রেডিওর কথা ক্লেটনকে মনে করিয়ে দিল রানা ইচ্ছে করেই। ক্লেটন যদি খুনীদের একজন হয় তো আপলাভনিকে পৌঁছানোর আগেই ধ্বংস করে দিতে চাইবে ওটা।

আড়চোখে ক্লেটনের দিকে তাকাল রানা। পর্দার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে আসা বোরিয়ালিসের আলোয় কোন পরিবর্তন দেখা গেল না মুষ্টিযোদ্ধার চেহারায়। বড় বেশি হালকা চালচলন তার। মৃদু মাথা নোয়ানো, ঠোঁট কামড়ানো, চোখের স্বাভাবিক দৃষ্টি, নাহ্, যদি খুনী হয়েই থাকে, পৃথিবীর সেরা অভিনেতা ক্লেটন।

হঠাৎই একটা কথা মনে হতেই ঘুরে শ্যারিনের দিকে তাকাল রানা। 'কয়েকটা কথা আছে আপনার সঙ্গে। একটু বাইরে আসবেন?'

অবাক হলো শ্যারিন, কিন্তু মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল। লাফিয়ে পেছনের চলন্ত স্লেজের ওপর নেমে এল রানা। শ্যারিনকে ঝাঁপ দিতে বলল। এক মুহূর্ত দ্বিধা করল স্টুয়ার্ডেস। তারপর চোখ বন্ধ করে ঝাঁপ দিল। শূন্যেই ওকে লুফে নিল রানা, আস্তে করে নামাল স্লেজে। কাঁধের জখমে ব্যথা পেয়েছে শ্যারিন, কিন্তু রানাকে বুঝতে দিল না।

একটা পেট্রোলের ড্রামে পাশাপাশি বসল দুজনে। বোরিয়ালিসের দিকে তাকিয়ে আছে শ্যারিন, রানাও তাকাল। হলুদ আর সবুজে মেশানো উজ্জ্বল রঙ, নিচের বরফে প্রতিফলিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ওপরের আকাশ আর এই বরফে ঢাকা পৃথিবীটা আচমকা এক পরীর রাজ্য হয়ে গেছে। অপরূপ ওই সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে শ্যারিন। ভাবনার অতলে তলিয়ে গেছে তার মন। পেছনে বরফের তলায় চিরদিনের জন্যে রেখে আসা মানুষটির কথা ভাবছে হয়তো।

আস্তে করে ডাকল রানা, 'মিস ক্যাম্পবেল।'

ধীরে ধীরে ফিরল শ্যারিন। বাদামী দুই চোখের তারায় বেদনার ছায়া। চোখের কোণে পানির রঙ হলুদে সবুজে মেশানো, অরোরা বোরিয়ালিসের প্রতিফলনে।

কোন কথা বলতে পারল না রানা। চুপ করে মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'কি বলছিলেন, বলুন?' আস্তে করে জিজ্ঞেস করল শ্যারিন।

'না, থাক। পরেই বলব।'

'না বলুন। আমার কিছু হয়নি,' দস্তানা দিয়ে চোখের কোণে জমে থাকা পানি মুছে ফেলল শ্যারিন।

'মিস ক্যাম্পবেল-

'শ্যারিন বলে ডাকলে কিছু মনে করব না আমি।'

স্টুয়ার্ডেসের চোখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল রানা। হাসল। পরিস্থিতিটা হালকা করার চেষ্টা করল। 'ঠিক আছে, নাম ধরে ডাকাই সহজ। তা শ্যারিন, শরাফীর ব্যাপারটা কেমন বুঝছেন?'

'অবস্থা খারাপই লোকটার,' গলা নামিয়ে বলল শ্যারিন। 'বাঁচবে তো?'

'জানি না। কপালজোরে যদি বেঁচে যায় তো অবাকই হব,' থামল রানা। আসল কথা পাড়ল। 'কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমাকে, শ্যারিন। কয়েকটা প্রশ্ন খচমচ করছে মনের ভেতরে। সাহায্য করতে পারেন কিনা দেখুন।'

'জিজ্ঞেস করুন। সাধ্যমত ঠিক জবাব দেবার চেষ্টা করব,' বলেই বোরিয়ালিসের দিকে চোখ তুলে তাকাল আবার। উজ্জ্বলতার চরমে পৌঁছে গেছে আলোকমালা। হলুদ হারিয়ে সোনালীকে জায়গা করে দিয়েছে, সবুজ হালকা থেকে গাঢ়তর হয়েছে। লাল আর নীল আলো দেখা যাচ্ছে এখন সবুজের ফাঁকে। নিচের তুষারকণার ওপর সেই আলো ছড়িয়ে পড়ে এক অসামান্য সৌন্দর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঠাণ্ডায় কাঁপছে শ্যারিন। 'উফ্, দারুণ শীত!'

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করল রানা। হিমেল ঠাণ্ডায় একে একে দীর্ঘ দশটা মিনিট পেরিয়ে গেল, কিন্তু যে অন্ধকারে ছিল, সেই অন্ধকারেই রয়ে গেল সে। কোথা থেকে কেমন করে যাত্রা শুরু করেছিল প্লেনটা, আবার প্রশ্ন করে করে শুনল সব। কোথাও সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়েছে কিনা জিজ্ঞেস করল স্টুয়ার্ডেসকে। কিছুই তেমন বলতে পারল না শ্যারিন। ধীরে ধীরে সেই সন্ধ্যায় প্লেনে খাবার পরিবেশনের কথা এসে পড়ল। কথা বলতে বলতে কি ভেবে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল শ্যারিন।

'কি হলো?' জানতে চাইল রানা।

রানার দিকে তাকাল শ্যারিন। 'সত্যিই, কি বোকা আমি! এখন বুঝতে পারছি...'

'কি বুঝতে পারছেন?' কাছে ঝুঁকে এল রানা।

'কফি! ওতেই ওষুধ মেশানো হয়েছিল।'

'কিন্তু গন্ধ?'

'সেজন্যেই তো বলছি কফিতে মেশানো হয়েছিল মিকিফিন। সব শেষে ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সকে কফি দিয়েছিলাম। ওই সবার পেছনে বসেছিল তো। কফির কাপটা হাতে নিয়ে নাক কুঁচকেছিল ভদ্রলোক। আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, কিছু পোড়ার গন্ধ পাচ্ছি কিনা। আমি কোন গন্ধ পাইনি তখন। তবে সবার নাক তো একরকম নয়। তাই তাড়াতাড়ি প্যান্ট্রিতে কিছু পুড়ছে কিনা দেখতে গেলাম। না, কিছু পোড়েনি। ফিরে এলাম আবার। আমাকে ডাকল ক্যাপ্টেন। এগিয়ে গেলাম। উঠে গিয়ে ওয়াশ-রুমের দরজাটা খুলল সে। ধোঁয়া বেরোতে শুরু করল। বাতাসে পোড়া গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল এবারে ভালমতই। কাগজ পোড়া গন্ধের মত। বিমানে আগুন, মারাত্মক ব্যাপার। তাড়াতাড়ি গিয়ে ক্যাপ্টেন হ্যারিসনকে ডেকে নিয়ে এলাম। ওয়াশ-রুমে ঢুকে দেখা গেল, তেমন খারাপ কিছু নয়। কাগজই পুড়ছে। সিগারেট খেয়ে পোড়া টুকরো ফেলেছিল হয়তো কেউ।'

'সবাই সীট থেকে উঠে গিয়ে দেখার জন্যে ভিড় করেনি?' গম্ভীর রানা।

'করেছিল। ক্যাপ্টেন হ্যারিসন যাত্রীদেরকে যার যার জায়গায় যাবার নির্দেশ দিলেন। এক জায়গায় বেশি লোক জড়ো হয়ে গিয়েছিল। প্লেনের ভারসাম্য নষ্ট হবার আশঙ্কা থাকে এতে।'

'অথচ এই ঘটনাটা একবারও বলেননি আপনি আমাকে। আশ্চর্য, মনেই পড়েনি আপনার!'

'দুঃখিত। আসলে...আসলে আমি এটাকে তেমন গুরুত্বই দিইনি। আর ব্যাপারটা ঘটেছিল প্লেন নামার অনেক আগে...।'

'আচ্ছা, পোড়া গন্ধ কতক্ষণ ছিল প্লেনের ভেতরে?'

'অনেকক্ষণ ছিল। এর পরের বার কফি খাবার সময়েও ছিল বদ্ধ কেবিনে।'

'তার মানে ওষুধ মেশানো হয়েছিল কাগজ পোড়ার গন্ধ বেরোনোর পরে। আপনি বলছেন, সবাই গিয়ে জড়ো হয়েছিল ওয়াশ-রুমের সামনে...।'

'সবাই নয়। অনেকেই।'

'ওই সময় কার কার প্যান্ট্রিতে যাবার সুযোগ বেশি ছিল? সামনের সীটের কেউ নিশ্চয়ই?'

'শুধু সামনের কেন, অনেকেরই সুযোগ ছিল। ওঁরা সব মাঝের প্যাসেজওয়ে পেরিয়ে ভিড় জমান।'

'ওরা...মানে কারা কারা?'

'তা তো বলতে পারব না। একথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'তাহলে কারা কারা ভিড়ের মাঝে ছিল না, জানতে পারতাম!'

মনে করার চেষ্টা করল শ্যারিন, তারপর হতাশভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল, 'নাহ, মনে করতে পারছি না। আসলে খেয়ালই রাখিনি। ক্যাপ্টেন হ্যারিসন ওঁদেরকে সীটে গিয়ে বসার জন্যে চাপাচাপি করেছিলেন...।'

'ঠিক আছে,' প্রসঙ্গ বদলাল রানা। 'ওয়াশ-রুমটা পুরুষদের জন্যে ছিল, না?'

'হ্যাঁ। ঘরটা প্লেনের সামনের দিকে, একপাশে।'

'ওই ঘটনার ঘণ্টাখানেক আগে কাউকে ওয়াশ-রুমে যেতে দেখেছিলেন?'

'এক ঘণ্টা! সিগারেটের পোড়া টুকরো অতক্ষণ...'

'সিগারেটের আগুন নয়। অন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কেন, ওটা কারও ইচ্ছাকৃত ব্যাপার, বিশ্বাস হয় না?'

'হয়,' বড় বড় চোখ তুলে তাকাল শ্যারিন। অবাক হয়েছে।

'আসলে কি জানেন, পেশাদার খুনীদের সঙ্গে টক্কর লেগেছে আমাদের। ওরা যা করেছে, বুঝেশুনে অনেক চিন্তাভাবনা করেই করেছে। সামান্য সিগারেটের আগুনের ওপর মোটেই নির্ভর করেনি ওরা। অন্য জিনিস ব্যবহার করেছে।'

'অন্য জিনিস!'

'অন্য এবং সহজ জিনিস। এর জন্যে একটা ছোট প্লাস্টিকের টিউব নিয়েছে খুনী। টিউবটার মাঝামাঝি জায়গাতে রয়েছে একটা প্লাস্টিকের দেয়াল। টিউবের দুই মাথায়ই ছিপি দিয়ে বন্ধ করার ব্যবস্থা রয়েছে। জিনিসটা নিশ্চয়ই পকেটে ছিল খুনীর। আর ছিল ছোট দুটো শিশিতে দুই রকমের অ্যাসিড। ওয়াশ-রুমে গিয়ে টিউবের দুটো কম্পার্টমেন্টে দুই রকমের অ্যাসিড ঢেলেছে সে। এবং দুই দিকেরই ছিপি ভালমত আটকে কিছু কাগজ জড়ো করে তার ওপর ফেলে রেখে এসেছে। দুদিক থেকে মাঝখানের প্লাস্টিকের দেয়াল খেতে খেতে এগিয়ে এসেছে অ্যাসিড।

এবং দুটো যেই মিশেছে, দপ্ করে আগুন ধরে গেছে কাগজে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আগুন লাগানোর কাজে হরদম এই জিনিস ব্যবহার হয়েছে! টিউবটা ফেলে রেখে আগুন লাগার আগে অন্তত কয়েক মাইল পেরিয়ে যাবার সময় পাওয়া যায়।'

'হুঁ,' মৃদু মাথা নাড়াতে নাড়াতে বলল শ্যারিন। 'আগুন লাগার কয়েক মিনিট আগে ওয়াশ-রুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা অদ্ভুত গন্ধ পেয়েছিলাম।'

'ঠিকই পেয়েছিলেন। তা ওয়াশ-রুমে কাউকে যেতে দেখেছেন তো?'

'নাহ্। প্যান্ট্রিতে খাবারের ব্যবস্থা করেছিলাম তখন।'

'প্যান্ট্রির কাছাকাছি, সামনের দুটো সীটে কে কে বসেছিল?'

'সুসান গিলবার্ট আর জন ওয়াকার। মিস গিলবার্টের কোন হাত নেই এতে, সীট ছেড়ে ওঠেননি তিনি দ্বিতীয়বার কফি দেবার আগে পর্যন্ত। আর মিস্টার ওয়াকার প্লেনে উঠেই একটু জিন চেয়ে নেন আমার কাছে। তারপর একটা খবরের কাগজ মুখে চাপা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন, কফি পর্যন্ত খাননি।'

'ঠিক দেখেছেন আপনি?'

'ঠিক দেখেছি, কেবিনে যতবারই যাওয়া আসা করেছি, দেখেছি মুখে একইভাবে খবরের কাগজ ঢাকা দেয়া আছে তাঁর।'

'কিন্তু খুনীরা দুজন,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। 'ওয়াকারের সহকারীই হয়তো অ্যাসিড টিউবটা রেখে এসেছে। প্যান্ট্রিতে গিয়ে কফিতে ওষুধও নিশ্চয় ও-ই মিশিয়েছে...' হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে যাওয়াতে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কখন কখন কফি এবং নাস্তা দেয়া হবে, জিজ্ঞেস করেছিল আপনাকে কেউ?'

দীর্ঘ এক মুহূর্ত রানার দিকে তাকিয়ে রইল শ্যারিন, ভাবছে। ওপরের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে কি যেন বোঝার চেষ্টা করছে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'ক্যাপ্টেন বায়ার্স জানতে চেয়েছিল, মনে আছে।'

'কিন্তু ও-তো মারা গেছে। আর কেউ?'

'আর মিসেস ডুলানী...' হঠাৎই উত্তেজিত মনে হলো শ্যারিনকে। 'আর হ্যাঁ, ক্লেটন! ডেরেক ক্লেটন!'

'ডেরেক ক্লেটন!' উত্তেজিত মনে হচ্ছে রানাকেও। শ্যারিনের একেবারে কাছে ঝুঁকে এসেছে রানা, 'ঠিক বলছেন তো?'

'ঠিকই বলছি। হেসে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এতো তাড়া কেন? বলেছিল, সারাক্ষণই নাকি খিদে পায় তার।'

তাহলে ডেরেক ক্লেটন আর মিসেস ভারনন ডুলানী, ভাবছে রানা। একজন পুরুষ এবং একজন মেয়ে!

অ্যামবুশ-২

প্রথম প্রকাশ: আগস্ট, ১৯৮৩

এক

'আপনার কি মনে হয় ক্লেটন আর ডুলানীই এসব খুনখারাপির জন্যে দায়ী?' জিজ্ঞেস করল শ্যারিন।

'এখনও জানি না,' বোরিয়ালিসের উজ্জ্বল রঙের দিকে তাকিয়ে অনিশ্চিত গলায় বলল রানা। 'হতে পারে। যে অবস্থায় পড়েছি, ওদের কাউকেই সন্দেহমুক্ত রাখতে পারছি না। আসলে খড়ের গাদায় সুচ খোঁজার মত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।...আচ্ছা, কেবিনে আপনার ধাক্কায়ই তো রেডিওটা পড়ে গিয়েছিল?' শ্যারিনকে সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়তে দেখে জিজ্ঞেস করল আবার, 'ওই সময় ওটার কাছাকাছি আর কেউ ছিল? কিংবা আপনার পেছনে?'

'নাহ্,' মাথা দোলাল শ্যারিন। হঠাৎ কি মনে পড়তে বলল, 'ক্লেটন...ও অবশ্য ছিল সুড়ঙ্গের দরজাটার কাছে।'

'না, তাহলে ও নয়। ওর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুড়ঙ্গের দরজা টেবিলের কাছ থেকে বেশ দূরে। আগেই কেউ টেবিলের হিঞ্জ আলগা করে রেখেছিল। কোনমতে দাঁড়িয়ে ছিল টেবিলটা। আপনি উঠে দাঁড়াতে শুরু করতেই কেউ ঠেলা মেরেছে দূর থেকে...।'

'দূর থেকে!'

'হ্যাঁ। দূর থেকে। টেবিলটার খানিক দূরে মেঝেতে একটা লম্বা হাতলওয়ালা ঘর পরিষ্কার করার ঝাড়ু পড়ে থাকতে দেখেছি।...তা টেবিলটা পড়ার শব্দ পেয়ে আপনি ঘুরে পেছনে বা আশপাশে কোনদিকে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল শ্যারিন।

'প্রথমেই কাকে দেখলেন?'

'জন ওয়াকার...'

'ও তো রেডিওটা বাঁচানোর জন্যে লাফিয়ে এসে পড়েছিল, তাই না? আচ্ছা, পেছনে দেয়ালের কাছে কাকে দেখেছেন, মানে কেউ ছিল?'

'হ্যাঁ, রেডিওটা বাঁচাতেই এগিয়ে এসেছিলেন ওয়াকার, হাতে ব্যথাও পেয়েছেন। দেখেছেনই তো,' থামল শ্যারিন। গলার স্বর খাদে নেমে গেল, 'তাই তো, এতক্ষণ মনে পড়েনি! হ্যাঁ, ছিল। দেয়ালের কাছে বসে ঝিমোচ্ছিল ও, অভিনয়ও হতে পারে।'

'কে?' তীব্র কণ্ঠ রানার।

'টম মার্টিন! ও যেখানে বসেছিল, ঝাড়ুর লম্বা হাতল দিয়ে টেবিলের পায়ার

নাগাল পাওয়া সম্ভব ছিল ওর পক্ষে।'

এসেই আবার চলে গেল মেরুদুপুর। গোধূলির আলোর মত আবছা একটুখানি আলো ফুটে উঠে কিছুক্ষণ পরেই আবার মিলিয়ে গেল। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। অসম্ভব ধীরে গড়াচ্ছে সময়।

রানার মনে হলো কয়েক যুগ পরে এল সাঁঝ। অসীম অনন্ত যাত্রার যেন আর শেষ নেই। কিন্তু তবু পেরোচ্ছে সময়। রাতও বাড়ছে। খুব ধীরে।

আটটা নাগাদ থামল ওরা। সকালের পর এই নিয়ে দুবার হলো। বিকেল চারটেয় একবার থেমেছিল অল্পক্ষণের জন্যে। তখন থেমেছিল পেছনের স্লেজে রাখা তেলের ব্যারেল থেকে ট্রাক্টরের ট্যাঙ্কে তেল নেয়ার জন্যে। এখন থেমেছে অন্য কারণে। রেডিও যোগাযোগ করা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখা দরকার। কোথা থেকে কে সিগন্যাল ধরবে, আদৌ কেউ ধরবে কিনা, জানে না রানা। কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যেতেই হবে। ওয়াকারকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিল সে।

জেনারেটরটা স্লেজে রাখা আছে। ওটা নামিয়ে নিল ওয়াকার। প্যাডেল চালিত জেনারেটর। যন্ত্রটা বরফের ওপর বসাতে তাকে সাহায্য করল রানা। সাইকেলের প্যাডেলের মত প্যাডেল, সাইকেলের সীটে বসে ঘোরানোর মত করেই ঘোরাতে হয়।

একটানা দশ মিনিট প্যাডেল ঘুরিয়ে গেল ওয়াকার। তারের সাহায্যে রেডিওতে শক্তি-সংযোগ করে নিয়ে একটানা চেষ্টা করে গেল রানা। কিন্তু বৃথা। কোন সিগন্যাল এল না। রেডিওটা ঠিক করে ফেলেছে পোর্টার, রানার মনে মনে যে একটু আশা ছিল না, তা নয়। কিন্তু হতাশ হলো। আয়োনোস্ফিয়ারে সাংঘাতিক আলোড়ন তুলে রেখে গেছে অরোরা বোরিয়ালিস। কখন ঠিক হবে, ঠিক নেই।

রানার পর চেষ্টা করে দেখল ব্যারি। কিন্তু তারও কপাল খুলল না। ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে, ভয়ঙ্কর শীত। শীতের দেশে যার জন্ম, শিরায় যার এস্কিমো-রক্ত বইছে, সেই ব্যারি পর্যন্ত কাঁপছে থর থর করে। এই শীতে একটা বিশেষ ধরনের পোশাক পরতে হয়। পোশাকটার বাইরে-ভিতরে দুদিকই রোমশ হয়। কিন্তু সে পোশাক নেই। তাই শীত এমন কাবু করে ফেলেছে ওদের।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নেয়া হলো। আবার চলতে শুরু করল ট্রাক্টর। শীতের প্রকোপে অতিষ্ঠ হয়ে গা গরম করার অন্য পথ নিল কেউ কেউ। ট্রাক্টরের পাশে পাশে ছুটতে লাগল। কিন্তু কয় মিনিট! ক্ষুধার্ত, অবসন্ন শরীর, ঘুমোতে পারছে না ঠিকমত। ছুটোছুটি সইবার মত শক্তি নেই শরীরে। তার ওপর ভারী পোশাক রয়েছে পরনে। পোশাকের তলায় দর দর করে ঘাম ঝরতে শুরু করে দৌড়াদৌড়ির ফলে। থেমে গেলেই ওই ঘাম জমে গিয়ে এক করুণ অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয়। মুখ গোমড়া করে শিগ্‌গিরই ফিরে গেল দৌড়বাজরা ট্রাক্টরের কেবিনে।

এভাবে আর চলা যায় না। থামার নির্দেশ দিল রানা। যা-ই হোক, কিছু খাবার আর বিশ্রাম দরকার এখন।

ক্রোনোমিটারে রাত বারোটা দশ। সামান্য কিছু সময় বাদ দিলে যাত্রা শুরু করার পর থেকে একটানা সাতাশ ঘণ্টা ট্রাক্টর চালিয়েছে ওরা।

ভীষণ ক্লান্তি। ঘুমে জড়িয়ে আসছে চোখ। কিন্তু তবু ঘুমানোর সাহস পেলো না কেউ। ঘুমাতে পারলও না অবশ্য, ঠাণ্ডার জন্যে। এতে ভালোই হলো বরং। এই ঠাণ্ডায় ঘুমোনো মানেই জমে গিয়ে নির্ঘাত মৃত্যু।

ছোট্ট কেবিন। কেবিন না বলে ওটাকে কাঠের বাক্স বললেই মানাবে ভাল। ঠিক মত হাত-পা ছড়িয়ে বসলে পাঁচজনের জায়গা হয়। অথচ ওতেই বারোজন লোক গাদাগাদি করে বসে গরম কফি খেয়ে চলেছে কয়েক মিনিট পরপর। সারা রাত ধরে আলো জ্বলল। কিন্তু ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না।

অসহ্য যন্ত্রণা। বাইরে মেরু-রাত, ভৌতিক জ্যোৎস্না। এ রাতের যেন শেষ নেই। ভেতরে কয়েকজন অসহায় মানুষের দাঁতে দাঁত বাড়ি খাবার অদ্ভুত মৃদু আওয়াজ আর ম্লান আলো পরিবেশটাকে কেমন যেন অসম্ভব, অপার্থিব করে তুলেছে। সবচেয়ে কষ্ট পেলেন বৃদ্ধা সুসান গিলবার্ট আর বৃদ্ধ মুস্তাফা শরাফী। ঠাণ্ডায় প্রায় অবশই হয়ে গেছে দুজনের শরীর।

জীবনে এত দীর্ঘ রাত ওরা আর কাটিয়েছে কিনা সন্দেহ। ঘড়ির দিকে তাকাতেও আর ভাল লাগছে না কারও। কাঁটা যেন স্থির হয়ে রয়েছে। কিন্তু তবু সময় কাটে। হাত ঘড়ির রেডিয়াম ডায়ালে কয়েক যুগ পরে ভোর চারটে বাজতে দেখলে রানা।

মাথার ওপরে কমে আসছে আলো। উজ্জ্বলতা কমে গিয়ে লালচে হয়ে আসছে ক্রমেই। অশুভ সঙ্কেত। ঠাণ্ডায় ব্যাটারি জমে যাচ্ছে, কে জানে নষ্ট হয়েও যেতে পারে। আবছা আলোতে কেবিনে ঠাসাঠাসি করে বসা মুখগুলোর ওপর আরেকবার চোখ বুলিয়ে নিল রানা।

প্রায় সবকটা মুখের একই অবস্থা। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য, চামড়ার রঙ নীলচে। কারুও কারও চামড়ায় নীলের মাঝে হলদে ছোপ। ফ্রস্টবাইট। শ্বাস নিতে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু প্রতিটি ফেলা শ্বাস পরিষ্কার চোখে পড়ছে আবছা আলোতেও। মনে হচ্ছে ধোঁয়া বেরোচ্ছে নিঃশ্বাসের সাথে। কেবিনের ভেতরে যেখানেই সামান্যতম আর্দ্রতার আভাস আছে, সেখানেই বরফ জমেছে। বরফ নেই শুধু স্টোভের গায়ে। অবর্ণনীয় দুর্দশার এক জীবন্ত চিত্র যেন।

'ভাল ঘুম হয়েছে তো, রানা?' ঠাণ্ডায় দাঁতে দাঁতে বাড়ি খাচ্ছে, কিন্তু তবু রসিকতার চেষ্টা করল ওয়াকার! 'নাকি ইলেকট্রিক ব্ল্যাংকেটের প্লাগ লাগাতে ভুলে গিয়েছিলেন?'

'মনে হয় সত্যিই ঘুমিয়েছেন আপনি, ওয়াকার,' ম্লান হাসল রানা। দেহের অবসাদ কণ্ঠস্বরেই টের পাওয়া যাচ্ছে। কেবিনের অন্য মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কেউ ঘুমিয়েছেন?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সবাই, কারও মুখে কথা নেই।

'ঘুমোতে চান কেউ?'

আবারও একই উত্তর।

'বেশ,' উঠে দাঁড়াল রানা। 'মাত্র ভোর চারটে। কিন্তু তবু বসে বসে জমে যাওয়ার চাইতে পথ চলা অনেক ভাল। তাছাড়া আরও বিপদ আছে। এই ঠাণ্ডায় ইঞ্জিন বেশিক্ষণ বন্ধ রাখলে আর চালু করা যাবে কিনা সন্দেহ।' ব্যারির দিকে তাকাল, 'কি বলো, মাই ডিয়ার "একমাত্র ভরসা"?'

'ব্লো-টর্চগুলো আনতে যাচ্ছি আমি,' বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল এস্কিমো। ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল তার কাশির শব্দ। বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছে ঠাণ্ডায়। নাক দিয়ে ঢুকে গলা চিরে ফুসফুসে পৌঁছে গেছে হিম-হাওয়া।

রানা আর ওয়াকারও বেরোল। এস্কিমো যা সইতে পারেনি, সেটা সইবার ক্ষমতা রানা কিংবা ওয়াকারের থাকার কথা নয়। ব্যারির চেয়ে বেশি কাশতে লাগল ওরা। কাশির দমকে গলা ফুলে গেল, পানি বেরিয়ে এল চোখে। গলায়ই ঝোলানো রয়েছে স্নো-মাস্ক। দ্রুত পরে নিল দুজনেই।

ড্রাইভিং সীটে এসে উঠল রানা। পার্কার পকেট থেকে টর্চ বের করে প্রথমেই আলো ফেলল তাপমান যন্ত্রটার ওপর। চমকে উঠল। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছে না। শূন্যের আটষট্টি ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে পারদ। ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে তুষারপাত মাপার যন্ত্রটার ওপর টর্চের আলো ফেলল। একশো ডিগ্রীর কাছাকাছি। ভাবল রানা, যত যা-ই হোক, এখনও ওয়েগনারের মাপা রেকর্ড ভাঙতে ওদের অনেক দেরি আছে। পর্যটক ওয়েগনার একদিনের তাপমাত্রা রেকর্ড করেছিলেন শূন্যের নিচে পঁচাশি ডিগ্রী, তুষারপাত একশো পঁচিশ ডিগ্রী। সেটা অবশ্য ঘটেছিল দক্ষিণ মেরুতে। কিন্তু তবু ওয়েগনারের অবস্থা এই আজব ট্রাক্টর অভিযাত্রীদের চেয়ে অনেক ভাল ছিল। প্রয়োজনীয় কাপড়চোপড় আর খাবার ছিল তাঁর সঙ্গে। দু'জন মারাত্মক খুনীও ছিল না সাথে। আর ছিল না মুমূর্ষু কোন রোগী। ছিল না কোন অথর্ব বৃদ্ধা। সে যাই হোক, এখন ট্রাক্টরের ইঞ্জিন বিগড়ে না বসলেই বাঁচা যায়, ভাবল রানা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার আশঙ্কাই সত্যি হলো। সুইচ টিপে হর্ন বাজাতে গিয়েই ব্যাপারটা টের পেল সে। অস্পষ্ট ভোঁতা একটা আর্তনাদের মত শোনাল হর্নের আওয়াজ, বিশ গজ দূর থেকেও শোনা যাবে না। ব্যাটারিগুলোর অবস্থা কাহিল। আরও বিপদ হয়েছে। ইঞ্জিন কভারের বাইরে যেসব যন্ত্রপাতি রয়েছে, সবগুলোর লুব্রিকেটিং অয়েল জমে গেছে। রানা আর ওয়াকার দুজনে মিলে চেপেও একচুল ঘোরাতে পারল না স্টার্টিং হ্যান্ডেলটা।

প্যারাফিন ব্লো-টর্চগুলো জ্বালানোর চেষ্টা চলল, কিন্তু বৃথা। জমে শক্ত হয়ে গেছে প্যারাফিন। তাপমাত্রা পঞ্চাশের নিচে নামলেই আর তরল থাকতে পারে না এটা। পেট্রোল টর্চের শিখায় আগে গলিয়ে নিতে হবে প্যারাফিন। তাই করল রানা আর ওয়াকার। তারপর ওগুলো এনে রাখল কেবিনের ভেতরে। ব্লো-টর্চের সাহায্যেই তাতানো হলো গিয়ার বক্স।

এক ঘণ্টা অমানুষিক পরিশ্রমের পর একটু যেন নরম হলো ইঞ্জিনের মেজাজ,

জোড়গুলো নড়াচড়ার লক্ষণ দেখাল। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে, ইঞ্জিনে জীবন ফিরতে দেরি আছে এখনও।

ইঞ্জিন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা দুয়েকজনের থাকলেও বিশারদ এখানে কেউই নেই। তবু বসে থাকলে চলবে না। মোটামুটি জ্ঞান নিয়েই কাজে লেগে গেল রানা, ওয়াকার আর ব্যারি। ইঞ্জিনের দুদিক থেকে ব্লো-টর্চের সাহায্যে তাপ দেবার বন্দোবস্ত হলো। স্পার্কিং প্লাগগুলো খুলে ভালমত পরিষ্কার করা হলো। গরম করা হলো ব্যাটারি। কারেন্ট-সার্কিট যতটা সম্ভব চেক করে দেখা হলো। ট্যাঙ্ক থেকে কারবুরেটরে তেল যাবার লাইনটাও খুলে পরিষ্কার করা হলো ভালরকম। কারবুরেটরে কি করে জানি ঢুকে গেছে বরফের গুঁড়ো। খুলে পরিষ্কার করা হলো সেটা। এসব সূক্ষ্ম কাজগুলো ভারী দস্তানা পরে করা যায় না, কাজেই খুলতে হলো গ্লাভস। ঠাণ্ডা ধাতুর সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে কমলা হয়ে গেল আঙুলের চামড়ার রঙ, ফোস্কা পড়ে গেল। ফাটতেও দেরি হলো না। নখের ফাঁক আর ফোস্কার ক্ষত থেকে চুঁইয়ে বেরিয়ে এল রক্ত, জমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অস্বস্তি আর যন্ত্রণা এতে বাড়ল বই কমল না। ফুলে বিকৃত হয়েছে ঠোঁটের চেহারা। বার বার স্টোভের আগুনে হাত-মুখ সেঁকে নেয়া সত্ত্বেও লাভ তেমন কিছুই হচ্ছে না। তবে এই পরিশ্রম আর কষ্টের বিনিময়ে ফল পাওয়া গেল।

তোয়াজ শুরু করার প্রায় সোয়া দুই ঘণ্টা পরে ঘুম ভাঙল যেন ইঞ্জিনের, গা ঝাড়া দিল। আচমকা ভয়ঙ্কর রকম গর্জে উঠে কান ঝালাপালা করে দিল সবার। এতই বিকট আওয়াজ, রানার মনে হলো আশপাশে মরা লাশ পড়ে থাকলে লাফিয়ে উঠে ছুট লাগাত। ক্লান্ত হাসি ফুটল তিনজনের মুখে। পরস্পর হাত মেলাল, তারপর কেবিনে এসে ঢুকল ওরা। নাস্তা সত্যিই পাওনা হয়েছে ওদের।

নামেই নাস্তা, আসলে বার কয়েক চোয়াল নেড়ে ঢোক গেলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না একে। কয়েকটা বিস্কিট আর টিনের মাংসের দুটো স্লাইস বারোজনের মাঝে ভাগ করে দেয়া হলো। বেশি অংশটা অবশ্যই শরাফীর ভাগে পড়ল। এত কম খেয়েও নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছবার আগেই খাবারে টান পড়ে যাবে, জানে রানা। একটাই জিনিস প্রচুর রয়েছে ওদের, কফি। খাবার রয়েছে ছোট চার টিন মাংস, চার টিন সব্জী, দশ পাউন্ড শুকনো ফল, সামান্য জমানো মাছ, ছোট এক টিন বিস্কুট, তিন প্যাকেট ইন্‌স্ট্যান্ট সুপের গুঁড়ো, ব্যস। ও হ্যাঁ, আরেকটা জিনিস আছে, কিন্তু খুব একটা কাজের জিনিস নয়। কফি খাওয়া যাবে শুধু ওই জিনিস দিয়ে। নেসলের কুড়ি টিন মাখনতোলা মিষ্টি ছাড়া গুঁড়ো দুধ। কুকুরগুলোর জন্যে রয়েছে সীলের শুকনো মাংস। নিজের ভাগের সমস্ত খাবারটুকু শরাফীকে দিয়ে দিল ব্যারি, কয়েক টুকরো সীলের মাংস কেটে এনে আগুনে গরম করে খেয়ে নিল সে। তার মত সবাই যদি সীলের মাংস খেতে পারত, তাহলে খাবারের তেমন কমতি হত না। কিন্তু আর কেউ এ জিনিস খায়নি কখনও, খেতে অভ্যস্ত নয়। ডুলানী তো এমনই মুখ বিকৃত করল, যে অনেক দুঃখেও হেসে ফেলল ক্লেটন। কিন্তু বাদানুবাদের মধ্যে গেল না কেউই।

চাঁদ ডুবে যাচ্ছে। কুকুরগুলোকে খাওয়ানো শেষ করল ব্যারি। যাত্রা শুরু

হলো আবার। স্টিয়ারিং ধরল ওয়াকার।

ভট ভট বিকট আওয়াজ তুলে ট্রাক্টরের একজস্ট পাইপের মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। তুষারে কেমন এক ধরনের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে ওই ধোঁয়ায়, হালকা সাদা খুদে আকারের মেঘপুঞ্জের মত দেখতে লাগছে। চাঁদের আলোয় যতদূর নজর চলছে, পেছনে দেখা যাচ্ছে এই আজব ধোঁয়ার মেঘ।

এবারে আর বিশ নয়, পনেরো মিনিট অন্তর ড্রাইভার বদলের সিদ্ধান্ত নিল রানা। বরফঠাণ্ডা ড্রাইভিং সীটটা কিছুতেই গরম হয় না, তার ওপর ঠাণ্ডা স্টিয়ারিং। একটানা পনেরো মিনিটের বেশি ওখানে বসা কারও জন্যেই উচিত নয়। স্টিয়ারিং হুইলে আঙুল মুঠো অবস্থায়ই আটকে যাবার আশঙ্কা আছে। তাছাড়া শরীরের নিচের অংশ আর পিঠের রক্ত চলাচল থেমে যেতে পারে সীটের সংস্পর্শে থাকার ফলে। তাই পনেরো মিনিট পর পর সীট থেকে নেমে এসে স্টোভে হাত গরম করে নেবার ব্যবস্থা হলো।

রওনা হবার পর এসে শরাফীকে একবার পরীক্ষা করে দেখল রানা। জীবনের কোন লক্ষণ নেই। স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে লম্বা হয়ে শুয়ে থরথর করে কাঁপছে যেন একটা লাশ। দাঁতে দাঁত বাড়ি খাওয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে মুখের ভেতরে রুমাল গুঁজে নিয়েছে। নাড়ি দেখল রানা। অত্যন্ত দ্রুত চলছে হৃৎস্পন্দন। কয়েক ঘণ্টা আগেই অসাড় হয়ে গেছে হাতের আঙুল। শূন্য দৃষ্টি মেলে রানার দিকে তাকাল বৃদ্ধ। শুকনো মলিন এক চিলতে হাসি ছাড়া এমুহূর্তে তাকে দেবার আর কিছুই নেই রানার।

'কেমন লাগছে এখন, মিস্টার শরাফী?'

'আর সবার চেয়ে খারাপ না।'

'আর সবার অবস্থা কিন্তু খুবই খারাপ। যাই হোক, খিদে আছে?'

'খিদে! এগারোজন মানুষের কাউকেই ধন্যবাদ জানিয়ে ছোট করতে পারব না। বিশ্বাস করুন, দিলেও আর খেতে পারতাম না।'

বিশ্বাস করতে পারল না রানা, বিশ্বাস করার কোন কারণও নেই। এই সময়ে শরাফীর দেহের চাহিদা কেমন হতে পারে অজানা নয় তার। খাবার সময় গোগ্রাসে গিলতে দেখেছে ওকে রানা। যেন কতকাল দুর্ভিক্ষের মাঝে কাটিয়েছে, অভুক্ত থেকেছে, এমনিভাবে তাকিয়েছে খাবারের দিকে। ইনসুলিনের অভাব রক্তে শর্করার পরিমাণ ক্রমেই বাড়িয়ে তুলছে, শরীর এখন আরও বেশি খাবার চায়।

'পিপাসা আছে নিশ্চয়?' আবার জিজ্ঞেস করল রানা।

সায় দিল শরাফী। বোধ হয় জানে না, তাই সায় দিয়েছে, নইলে চেপে যেত। পিপাসা বাড়ার মানেই এই রোগের অবনতির লক্ষণ।

জানে রানা, এখন থেকে আরও দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়বে বৃদ্ধ। এখনই অনেক বেশি অসুস্থ দেখাচ্ছে তাকে। গালের হাড় আরও ঠেলে বেরিয়েছে। ছত্রিশ ঘণ্টা আগেও এত খারাপ ছিল না অবস্থা।

শরাফীর পরেই অবস্থা খারাপ সুসান গিলবার্টের। এখনও হাসি লেগে আছে মুখে, কোন প্রতিবাদও নেই। কিন্তু তবু প্রচণ্ড দুর্বলতা কিছুতেই ঢেকে রাখতে

পারছেন না। ওঁর দিকে তাকিয়েও শুকনো হাসিই শুধু উপহার দিল রানা। তারপর আবার কি মনে হতেই ফিরল শরাফীর দিকে। 'আপনার পায়ের কি অবস্থা, মিস্টার শরাফী?'

'পা?' মুখে রুমাল গোঁজা অবস্থায়ই হাসল বৃদ্ধ। অদ্ভুত হাস্যকর দেখাল হাসিটা। 'নেই। মানে, আছে বলে টের পাচ্ছি না।'

'দেখি,' বলেই স্লিপিং ব্যাগের চেন খুলতে শুরু করল রানা। দুর্বল গলায় প্রতিবাদ জানাল শরাফী, কিন্তু পাত্তাই দিল না রানা। ব্যাগ থেকে টেনে বের করে আনল শরাফীকে—যেন একটা শিশু। বের করেই কয়েকটা কম্বল দিয়ে জড়িয়ে দিল দেহটা। তারপর এক পায়ের মোজা খুলে দেখল। ফ্যাকাসে, কয়েকদিনের মরা লাশের মত রঙ।

পাশে বসে থাকা স্টুয়ার্ডেসের দিকে তাকাল রানা। 'শ্যারিন, এখন থেকে মিস্টার শরাফীর সমস্ত দায়িত্ব আপনার। স্লেজে কয়েকটা হট ওয়াটার ব্যাগ আছে, আনিয়ে দিচ্ছি। ওগুলোতে গরম পানি ভরে সারাক্ষণ ওঁর পায়ের কাছে রাখবেন।'

গোঁ গোঁ করে আবার প্রতিবাদ জানাল শরাফী, কিন্তু এবারেও কান দিল না রানা। লোকটার পায়ের অবস্থা সাংঘাতিক খারাপ। কাপড়চোপড় পরা থাকা সত্ত্বেও পায়ে ফ্রস্টবাইটের আক্রমণ হতে পারে এখন যে কোন সময়। তার একটাই মানে। গ্যাংগ্রিন হয়ে যাবে। লোকটার মৃত্যু আর কেউ ঠেকাতে পারবে না তখন।

ধীরে ধীরে আবার কেবিনের যাত্রীদের দিকে একবার নজর বুলাল রানা। পুরানো ক্রোধটা আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে তার ভেতর। এতগুলো লোকের এই দুর্ভোগের জন্যে দায়ী মাত্র দুজন লোক। কারা ওরা? শুধু যদি একবার জানতে পারত এখন···হাত দুটো নিশপিশ করে উঠল রানার।

এই সময় ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে ভেতরে ঢুকল ওয়াকার। মাত্র পনেরো মিনিট স্টিয়ারিং ধরে বসেছিল। স্নো মাস্ক খুলতেই দেখা গেল নীলচে চামড়ায় আগের চেয়ে অনেক বেশি হলুদ ফুটকি। ঠোঁট ফেটে গেছে অসংখ্য জায়গায়। রক্ত জমেছে। সাইকেলের টায়ারের মত এবড়োখেবড়ো দেখাচ্ছে ঠোঁটের চেহারা। খামচি মারার ভঙ্গিতে বাঁকা হয়ে রয়েছে দুই হাতের আঙুল। সোজা করতে পারছে না বোধহয়। তার চেয়ে অবস্থা অনেক ভাল রানা, ব্যারি আর ক্লেটনের। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে স্টোভের দিকে এগিয়ে এল ওয়াকার। টলছে রীতিমত।

তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ধরল ওকে রানা, সীটে বসিয়ে দিল। 'হাঁটুর নিচে অনুভূতি আছে?'

'হাঁটু আছে কিনা তাই তো বুঝছি না,' হাসতে চাইল ওয়াকার। বেদনা প্রকটভাবে প্রকাশ পেল। ঠোঁট সামান্য ছড়াতে গিয়েই তাড়াতাড়ি আবার স্বাভাবিক করে নিল। কিন্তু ওই সামান্য চাপেই আবার চোট লাগল ফাটাগুলোতে, আবার রক্ত বেরিয়ে এল। 'আরে ওয়াফ-রে-ওয়াফ, এওন ঠাণ্ডা জিন্দেগীতে দেখিনি! পায়ে বরফ ঘষব নাকি?' উবু হয়ে অবশ আঙুলে জুতোর ফিতে খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল সে।

ওয়াকার যদি খুনী হয়ে থাকে, তো তার মত অভিনেতা সমস্ত পৃথিবীতে আর

ক'জন আছে, অনুমান করতে চাইল রানা। 'হাসালেন আপনি, ওয়াকার,' হাসির নামগন্ধও নেই রানার কণ্ঠে। 'বরফ ঘষার চাইতে সিরিশ ঘষুন। জানলে একথা বলতেন না। শূন্যের ষাট-সত্তর ডিগ্রী নিচে বালির মতই খসখসে হয়ে যায় তুষারের গুঁড়ো। আর বরফ তো লোহার রেত।' গরম পানির বালতির দিকে ইশারা করল, 'পানির তাপ পঁচাশি ডিগ্রী উঠলে পা ডোবাবেন। চামড়া লাল হয়ে উঠলে বের করে আনবেন। ক্ষত হয়ে থাকলে···খবরদার, ডলাডলি করবেন না, আরও ছিলে যাবে।'

'গাড়ি চালিয়ে এসে বারবারই এই কাণ্ড করতে হবে নাকি?' রানার দিকে চোখ তুলে তাকিয়েছে ওয়াকার।

'উপায় নেই।'

পরের দশ ঘণ্টা প্রত্যেক ড্রাইভারকে একই কাণ্ড করতে হলো, এমন কি এস্কিমোও রেহাই পেল না। তবে তার পা রানা কিংবা ওয়াকারের মত অতটা খারাপ হলো না। ঠাণ্ডায় অভ্যস্ত চামড়া।

ধীরে ধীরে আরও কমল তাপমাত্রা। সত্তর ডিগ্রীতে এসে ঠেকল। দশটি ঘণ্টা বালতিতে কারও না কারও পা ডুবেই রইল। যারা বাইরে কাজ করছে তারা তো বটেই, ভেতরেরও সবাই পালা করে বালতিতে পা চুবাল। সারাক্ষণই বালতির গায়ে ধরা রইল ব্লো-টর্চ। নইলে গরম পানি বরফ হতে খুব একটা সময় লাগবে না।

আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে শরাফী। সুসানের অবস্থাও কাহিল। মড়ার মত কেবিনের কোণে জড়সড় কুকুরকুণ্ডলী হয়ে পড়ে রয়েছেন। অন্যদের অবস্থাও তেমন সুবিধের নয়।

দুপুর নাগাদ থামল ট্রাক্টর। কিছু সুপ বানিয়ে ফলের টিন সেঁকে গরম করার ব্যবস্থা করল শ্যারিন। রেডিও নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল রানা আর ব্যারি। খুঁটি গেড়ে সাময়িক অ্যান্টেনা টাঙানো হলো। সিগন্যাল পাঠাতে শুরু করল রানা।

একটানা প্যাডেল ঘুরিয়ে চলল ব্যারি। কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে দিয়ে নব ঘোরাল রানা। মিনিট দশেক পেরিয়ে গেল, কেনো খবর নেই। হতাশ হয়ে সুইচ অফ করে দিতে যাচ্ছিল, এই সময় তাকে চমকে দিয়ে জীবন্ত হয়ে উঠল রেডিওর সাউন্ড বক্স।

'··· জি এফ এক্স কলিং জি এফ কে··· জি এফ এক্স কলিং জি এফ কে···' কণ্ঠস্বরটা অস্পষ্ট।

'আরও জোরে···শুনতে পাচ্ছি···হ্যাঁ, আরও জোরে বলুন···' মাউথ পিসে মুখ রেখে চেঁচিয়ে বলল রানা।

আবার ভেসে এল কণ্ঠস্বর, আরও জোরে, আরও স্পষ্ট।

উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে রানা। চেঁচিয়ে উঠল, 'জি এফ কে, হ্যাঁ, জি এফ এক্স শুনতে পাচ্ছি···আমি মাসুদ রানা··· মা-সু-দ রা-না···'

'আপনার গলা শুনতে পাচ্ছি, স্পষ্টই···আবহাওয়া কেমন···আবহাওয়া? ···কতদূরে রয়েছেন?..'

'ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা···সত্তর ডিগ্রী···প্রায় একশো কুড়ি মাইল দূরে রয়েছি···অলৌকিক কাণ্ডই ঘটালেন আপনি? পোর্টার···'

'…ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার কথা বলতে চান…'

'…ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার?' চমকে গেল রানা। চোখ তুলতেই চোখাচোখি হয়ে গেল ব্যারির সঙ্গে। প্যাডেল ঘোরাতে ঘোরাতেই কান খাড়া করে কথা শুনছে এস্কিমো। তার চোখেও বিস্ময়। '…ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার এলেন কোথা থেকে।…তাঁর তো কেবিন থেকে আড়াইশো মাইল দূরে থাকার কথা…' হঠাৎ কি মনে হতেই বলল, '…ধরে থাকুন…দু'তিন মিনিট পর কথা বলছি…ধরে থাকুন…'

কেবিনের পাশেই অ্যান্টেনা টাঙিয়ে রেডিওতে কথা বলছে রানা। কেবিন থেকে দু'পাশের কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যায়। ইঙ্গিতে এস্কিমোকে কাছে ডাকল রানা। ব্যারি এসে দাঁড়াতেই ফিসফিস করে বলল, 'এখানে নয়,' অ্যান্টেনা আর জেনারেটর দেখিয়ে বলল, 'এগুলো দূরে, ওই ওখানে নিয়ে যেতে হবে।'

রানার ইঙ্গিত বুঝল ব্যারি। কাজে লেগে গেল। ঠিক তিন মিনিটের মাথায় কেবিন থেকে দুশো গজ দূরে নিয়ে গিয়ে অ্যান্টেনা আর জেনারেটর বসিয়ে ফেলল দুজনে। কেবিনের ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে ওয়াকার আর ক্রেটন উঁকি দিয়েছিল একবার করে, সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল দুজনেই। কিন্তু কাউকেই কিছু বলেনি রানা। বলার প্রয়োজনই বোধ করেনি। ওরা কেউ যদি কিছু মনে করে, কিচ্ছু এসে যায় না তার।

জেনারেটরের প্যাডেল ঘোরাতে লাগল ব্যারি। রেডিওর মাউথ পিস মুখের কাছে ধরে একবার কেবিনের দিকে তাকাল রানা। আবছা গোধূলি আলোয় ট্রাক্টর দেখা যাচ্ছে। কেউ এলে দেখা যাবে পরিষ্কার। তাছাড়া দুশো গজ দূর থেকে যত চেঁচিয়েই কথা বলুক, কেবিনের কেউ শুনতে পাবে না।

রেডিওর সুইচ আবার অন করল রানা। পোর্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইল। নবগুলো ঠিকমত ঘোরাতে পারছে না। ঠাণ্ডায় হাত কাঁপছে, আঙুল-গুলোতে শক্তি নেই। তবু কোনমতে লাইন করতে পারল সে।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' ভেসে এল একটা কণ্ঠ, একেবারে পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে। 'আমি ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার। পোর্টারের কাছে সব শুনেছি। আপনার তিন মিনিট সময় নেয়া থেকেই বুঝতে পারছি, ট্রাক্টরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছেন। ওই তাপমাত্রায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না। চুপ করে শুনুন, সংক্ষেপে কথা শেষ করছি। শুনতে পাচ্ছেন?'

'পরিষ্কার… কিন্তু আপনি কি করে—ওহ্, প্রশ্ন করতে নিষেধ করেছেন…হ্যাঁ, বলুন।'

'সোমবার বিকেলে আমাদের ট্রাক্টরের রেডিওতে বি বি সি আর ভয়েস অভ আমেরিকা থেকে প্রচারিত খবরে প্লেনটার কথা শুনেছি। তার পরের দিন, অর্থাৎ গতকাল আবার শুনি খবরটা, এবারে আপলাভনিক রেডিও থেকে। ওরা জানাচ্ছে, ব্রিটেন এবং আমেরিকা, দুই দেশেরই অনুমান প্লেনটা সাগরে পড়েনি, গ্রীনল্যান্ড কিংবা বাফিন দ্বীপের কোথাও নেমেছে। এই অনুমানের কারণ আমার জানা নেই। প্লেনটা উদ্ধারের জন্যে সাংঘাতিক তোড়জোর শুরু হয়ে গেছে। আমেরিকা আর

ইংল্যান্ড থেকে রওনা হয়ে গেছে উদ্ধারকারী জাহাজ।...এই দুই দেশ এবং ফ্রান্স, ক্যানাডা, রাশান মাছধরা কিছু ট্রলার, যেগুলো গ্রীনল্যান্ডের উপকূলে মাছ ধরছিল, তারাও রাতারাতি কি কারণে জানি তৎপর হয়ে উঠেছে। ...পশ্চিম উপকূলের দিকে ছুট লাগিয়েছে সবাই, নজর রাখছে কিংবা খুঁজে বেড়াচ্ছে প্লেনটাকে।...পুবে যেতে পারছে না, ইতিমধ্যেই প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফে ঢাকা পড়ে গেছে ওদিকটা। থিউল আর সন্ড্রে স্ট্রমফিয়র্ড থেকে পালা করে উড়ছে কয়েকটা আমেরিকান প্লেন, হারিয়ে যাওয়া প্লেনটাকে খুঁজছে।...প্লেনটা ব্রিটিশ, কিন্তু খোঁজার তোড়জোর আমেরিকানদের মাঝেই দেখা যাচ্ছে বেশি।...ওদের উপকূল রক্ষী বাহিনীও কাজে নেমে পড়েছে।...আটলান্টিক ঘুরে ডেভিস প্রণালীর দিকে ছুটে আসছে কয়েকটা ক্যানাডিয়ান ডেস্ট্রয়ার। আর্কটিকে মহড়া দিচ্ছিল একটা ব্রিটিশ বিমানবাহী জাহাজ আর একটা ডেস্ট্রয়ার।...ওদের কাছেও পৌঁছে গেছে খবর।...প্লেনটাকে খুঁজছে ওরাও। তবে ওরা কতটা কি করতে পারবে সন্দেহ আছে।... ফেয়ারওয়েল অন্তরীপ ঘুরে আসতে হবে ওদের, ওদিকে বাফিন উপদ্বীপের মুখে দারুণ বরফ জমেছে। তবে গ্রীনল্যান্ডের উপকূল বরাবর ডিস্কো থেকে সারটেনহাক পর্যন্ত পথ খোলাই আছে সম্ভবত।...গ্রীনল্যান্ডের সমস্ত আই জি ওয়াই স্টেশনগুলোকে অনুসন্ধান কাজে নামতে আদেশ দেয়া হয়েছে।...এই খবর পেয়েই তাড়াতাড়ি কেবিনে ফিরেছিলাম।... খোঁজাখুঁজি করতে হলে পেট্রোল দরকার...'

'কিন্তু এই তোড়জোরের কারণ কি?' জিজ্ঞেস না করে পারল না রানা। '...আর বলছেন আপলাভনিক রেডিও জানে খবরটা, কিন্তু ওরা তো কোনরকম সিগন্যাল পাঠাচ্ছে না আমাদের উদ্দেশ্যে...'

'আমি কেবিনে ফিরে প্লেনটা কোথায় পড়েছে জেনেছি...বোরিয়ালিসের জন্যে খবর পাঠাতে পারিনি আপলাভনিকে। তবে আপনার সঙ্গে কথা শেষ করেই ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।...আপনারা কেমন আছেন?'

'আমরা মোটামুটি আছি। তবে একজন যাত্রী, মুস্তাফা শরাফীর অবস্থা খুবই খারাপ। অ্যাকিউট ডায়াবেটিসের শিকার। আপলাভনিককে ইনসুলিনের যোগাড় রাখতে বলুন। গডথ্যাবে পাওয়া যাবে হয়তো।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ হয়ে গেল ব্রিউস্টারের গলা। কারা জানি কথা বলছে, অস্পষ্টভাবে শোনা গেল রেডিওর সাউন্ডবক্সে, বোঝা গেল না কিছু। আবার শোনা গেল ব্রিউস্টারের কথা, 'মিস্টার রানা, ফিরে আসুন।...প্রচুর পেট্রোল আর খাবার রয়েছে আমাদের সঙ্গে। কেবিন থেকে চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছি আমরা...'

'বরং আপনারাই এগিয়ে আসুন, আরও তাড়াতাড়ি,' ব্যারির চোখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রানা। কি ভাবছে এস্কিমো, জানে সে। ব্যারি আর তার মনে এখন একই চিন্তা চলছে। 'আমরা আশি মাইল দূরে রয়েছি।...পাঁচ-ছ'ঘণ্টার ভেতরেই পৌঁছে যেতে পারবেন।'

'আপনারাও এগোন, আমরাও এগোই, তাড়াতাড়ি দেখা হয়ে যাবে...

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা। 'আমরা এগিয়েই যাব,' ফিরে যেতে পারলে খুশিই

হত রানা। আধুনিক ট্রাক্টরের আধুনিক কেবিনের উষ্ণতা আর ভাল খাবারের হাতছানি কঠোরভাবে দমন করল সে। 'একজন রোগী রয়েছে আমাদের সঙ্গে, বললামই তো পিছিয়ে গেলে দেরি হয়ে যাবে। এগোতেই থাকি।' একটু থেমে বলল, 'তাছাড়া দুজন খুনী রয়েছে আমাদের সঙ্গে। যেই আমরা পিছাতে চাইব, বেঁকে বসবে ওরা।...নাহ্, একজন রোগী আর কিছু অসহায় যাত্রী নিয়ে এই ঝুঁকি নিতে পারব না আমি। তারচে আমি এগিয়ে যাই, আপনিও দ্রুত এগোন।...আর হ্যাঁ, কেন এই অ্যাক্সিডেন্ট, কি এমন ছিল প্লেনটায়, বললেন না তো?'

'কি ছিল আমিও জানি না।'

'আপলাভনিকের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নিন।...রাত আটটায় আবার কথা বলার চেষ্টা করব,' লাইন কেটে দিল রানা। এই পরিবেশে অনেক বেশিই কথা বলা হয়ে গেছে। ঠোঁট ফেটে আবার রক্ত ঝরতে শুরু করেছে।

ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকেই চাপা উত্তেজনা টের পেল রানা। কিন্তু কোন কথা বলল না সে। এগিয়ে গিয়ে স্টোভের পাশে বসল। ব্যারিও এসে বসে পড়ল তার পাশে। হাত-পা গরম করে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করে নিতে তিনটে মিনিট ব্যয় হয়ে গেল। কেউ কথা বলল না এই কয় মিনিট।

দস্তানা আর জুতো-মোজা পরে নিয়ে যাত্রীদের দিকে তাকাল রানা।

'যোগাযোগ হয়েছে বন্ধুদের সাথে, না?' নীরবতা ভাঙল সিনেটর। ইতস্তত করে বলল, 'ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টারের কথা বলছি।'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা। 'তবে ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার আমার বন্ধু নন, কখনও দেখিনি তাঁকে। এই প্রথম দূর থেকে কথা হলো।' বলবে কি বলবে না ভাবতে ভাবতে বলেই ফেলল, 'রেডিও মেরামত করে ফেলেছে পোর্টার।' মিথ্যে কথা বলল, 'রেডিওতেই ক্যাপ্টেনকে আমাদের খবর জানিয়েছে সে। এগিয়ে আসছেন ক্যাপ্টেন।'

'ভাল খবর,' কিন্তু কতটা খুশি হয়েছে সিনেটর, বোঝা গেল না। 'কতক্ষণ পরে এখানে পৌঁছবে?'

'জানি না,' আবার মিছে কথা বলল রানা। 'প্রায় আড়াইশো মাইল দূরে রয়েছে এখনও। যে আবহাওয়া, পাঁচ-ছ'দিন লেগে যাবে হয়তো।'

দুই

আবার শুরু হলো চলা।

কিছুতেই যেন শেষ হতে চাইছে না দীর্ঘ দিনটা। বিরক্তিকর যন্ত্রণাকর একটা দিন। অসহ্য ঠাণ্ডারও যেন আর কমতি নেই। সেই সঙ্গে ইঞ্জিনের একঘেয়ে কান ফাটানো আওয়াজ আরও বেশি বিষণ্ণ করে তুলছে মনকে।

আড়াইটা নাগাদ মুছে গেল সব আলো। আকাশে মেঘ নেই। তারা ফুটে

উঠল। তাপমান যন্ত্রটার দিকে তাকাল রানা। একটা অজানা আশঙ্কায় নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল। আরও নেমেছে তাপমাত্রা। তিয়াত্তর ডিগ্রী। আশ্চর্য একটা ব্যাপার ঘটল এই সময়। টর্চের সামনে রাবারমোড়া জায়গায় হাতের চাপ লাগতেই সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে কাঠের গুঁড়োর মত ঝুর ঝুর ঝরে পড়ল রাবার। বেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে জমে যাচ্ছে নিঃশ্বাস, তারপর শত-সহস্র তুষার বিন্দু হয়ে ঝরে পড়ছে।

সাংঘাতিক কঠিন আর পিচ্ছিল হয়ে উঠেছে এখন বরফ। ট্রাক্টরের রাবারের টায়ার বারবার পিছলে যাচ্ছে। বারবার কাতর আর্তনাদ ছাড়ছে কুকুরগুলো। রোল্টা পর্যন্ত অস্থির হয়ে উঠেছে। লম্বা, দীর্ঘস্থায়ী নেকড়ে-হাঁক ছাড়ছে সে থেকে থেকে। নির্জন ধু-ধু বরফের দেশে বরফের টিলায় প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে সেই ডাক। ভয়ঙ্কর মেরুরাত্রিকে আরও বেশি গম্ভীর আরও বেশি ভয়ঙ্কর করে তুলছে সেই ডাক।

ঠিক এই সময় গোলমাল শুরু করল ট্রাক্টরের ইঞ্জিন। আরও আগেই যে শুরু করেনি, সেই বেশি। রাবার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে ঠাণ্ডায়, ধাতুর কি অবস্থা হবে, কে জানে! কোন ছোটখাট ধাতব যন্ত্রাংশ ভেঙে যাবে না তো! এই যেমন ভালব-স্টেম, ক্যাম-রড, ক্র্যাংকশ্যাফট পিন—এমনি সব ছোটখাট ধাতুর টুকরো ভেঙে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এবং তার মানেই অবধারিত মৃত্যু।

কিন্তু ওদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, এ ধরনের কিছু ঘটল না। তবে যা ঘটেছে, সেটাও কম খারাপ নয়। কারবুরেটরে বরফ জমেছে। স্টিয়ারিং বক্সের যন্ত্রপাতিও সব জ্যাম হয়ে এসেছে। বেশি গোলমাল বাধাল রেডিয়েটর। ওটাকে মোড়ানোর জন্যে ব্যবহৃত লোহার পাতগুলো ঠাণ্ডায় কুঁচকে যাচ্ছে। ফাটল দেখা দিতে শুরু করেছে ইতোমধ্যেই। বিকেল তিনটে নাগাদ বেশিরকম পানি চোয়ানো শুরু হলো রেডিয়েটরের লীক থেকে। ফলে বার বার পানি ঢালতে হলো রেডিয়েটরে। সাংঘাতিক কঠিন কাজ। বালতিতে সারাক্ষণই গরম হচ্ছে পানি, কেবিন থেকে বের করে এনে রেডিয়েটরে ঢালতে ঢালতে ঠাণ্ডা হয়ে বরফের আস্তরণ পড়ে যাচ্ছে।

যাত্রীদের অবস্থা একেবারে কাহিল। ক্লেটনের কানের ডান পাশটায় আগেই ফ্রস্টবাইট আক্রমণ করেছিল, এখন আরও খারাপ হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, পুরো কানটাই কাটা পড়বে। প্লাস্টিক সার্জারী না করলে এরপর থেকে এক কান ঢেকে রাখতে হবে তাকে। ওয়াকারের পায়ের পাতার অবস্থাও সুবিধের না। কিছু অপারেশন দরকার পড়বে তার পায়েও। নিজের হাতের আঙুলগুলোর দিকে তাকাল রানা। নীল হয়ে গেছে। আঙুলের মাথা আর নখে জমাট রক্ত। দুটো ভাঙা আঙুলে ব্যান্ডেজ জড়ানো। অনুমান করল রানা, দুর্ভাগ্যবশত অন্যান্য আঙুলগুলো যদি হারায়ও, এই দুটো ভাঙা আঙুল বেঁচে যাবে। ওগুলোতে প্লাস্টার জড়ানো রয়েছে। ঠাণ্ডা সুবিধে করতে পারছে না ওখানে। সারা শরীরে প্লাস্টার জড়িয়ে নেবার ভাবনাটা এই মুহূর্তে খুব সুখকর মনে হলো তার কাছে।

মেরুর ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা তার হিংস্র কামড় ভালমতই বসিয়েছে অসহায় যাত্রীদের ওপর। ঢুলতে শুরু করেছে ওরা, থেকে থেকেই চমকে সোজা হয়ে চোখ মেলছে।

প্রচণ্ড নিদ্রাকাতরতার লক্ষণ। জানে রানা, এরপরেই আসবে ভয়াবহ নিদ্রাশূন্যতা, হজমের গোলমাল আর অস্থিরতা, এবং স্বাভাবিক কারণেই দেখা দেবে রক্তশূন্যতা। তারপর মস্তিষ্ক বিকৃতি, সবশেষে মৃত্যু। করার কিছুই নেই।

এক কোণে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে সিনেটর। মাঝেমধ্যে ঠাণ্ডায় শিউরে শিউরে না উঠলে তাকে মৃত বলেই মনে হত। শরাফী বেহুঁশের মত পড়ে রয়েছে, আসলে গভীর ঘুমে অচেতন। খুবই খারাপ লক্ষণ।

পরিস্থিতি মানুষকে যে কি করে, মিসেস ডুলানী আর মার্থা তার প্রমাণ। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে মড়ার মত পড়ে রয়েছে ওরা। অবস্থাই এটা করতে বাধ্য করেছে ওদের, কিন্তু রানা জানে, সভ্য জগতে ফিরে যেতে পারলে আবার আগের পর্যায়ে ফিরে যাবে দুজনেই। ডুলানীর মত মহিলাদের মনে এই রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ বেশি দিন টিকে থাকে না।

সত্যিই বৃদ্ধা হয়ে গেছেন সুসান গিলবার্ট। গত কয়েক ঘণ্টায় বয়স যেন আরও দশ বছর বেড়ে গেছে তাঁর। আরও বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছেন। ঘুমিয়ে আছেন। কিন্তু মুখের হাসি হাসি ভাবটা লেগে আছে ঘুমের মাঝেও। পুরানো একটা ঘড়ি যেন, যতদিন নতুন আর কার্যক্ষম ছিলেন, অবিরাম কাজ করে গেছেন। ধীরে ধীরে ক্ষয়ে এসেছে যন্ত্রপাতিগুলো, স্তব্ধ হয়ে যাবে শিগগিরই। হয়তো আরও কিছুদিন কাজ করত ওগুলো, কিন্তু ভয়ঙ্কর প্রতিকূলতা নির্মম আঘাত হেনেছে। টিকতে পারবে না পুরানো জিনিস। বড়জোর আর আটচল্লিশ ঘণ্টা, তাও টেকে কিনা সন্দেহ।

পানির বালতির গায়ে সারাক্ষণ ব্লো-টর্চ ধরে রেখেছে টম মার্টিন। সামান্য সময়ের জন্যও সরানো যাচ্ছে না, অমনি বরফ জমে ওঠে। মার্টিনের সারা শরীর ভারী পোশাকে ঢাকা, মুখেও স্নো-মাস্ক। চোখ দুটো বেরিয়ে আছে কেবল।

স্টোভের পাশে জড়সড় হয়ে বসে আছে শ্যারিন। কাঁপছে শীতে। কিন্তু কোনরকম ভাবান্তর নেই।

রেভারেন্ড নিউবোল্ড কিন্তু এখনও তেমন কাতর হয়নি শীতে, অথচ অনেক আগেই ওর ভেঙে পড়ার কথা। চোখে রিমলেস ফ্রেমের চশমা। বাইবেল খুলে রেখেছে কোলের ওপর। দৃষ্টি ধর্মগ্রন্থের পাতায়। অন্য কোন দিকে নজর নেই কেবিনের ম্লান আলোয় বাইবেলে গভীর আত্মনিমগ্ন রেভারেন্ডকে দেখে এখন কেমন যেন শ্রদ্ধা জাগে মনে।

রাত আটটার একটু আগে ট্রাক্টর থামাল রানা। সে-ই ড্রাইভ করছিল। এখানে একটু বেশি সময় থামার ইচ্ছে তার। ব্রিউস্টারের সঙ্গে রেডিও-যোগাযোগ করতে হবে। তাছাড়া ক্যাপ্টেনকে আরও এগিয়ে আসার সুযোগ দিতে চায়।

যাত্রীদের কাছে আসল কথা বলল না রানা, ওদের বোঝাল, ট্রাক্টরের ইঞ্জিনকে বিশ্রাম দেয়া দরকার। নইলে বেশি তেতে উঠলে বিগড়ে যাবে।

তাপমাত্রা তিয়াত্তর ডিগ্রীর পর আর বাড়েনি, একটু একটু করে কমছে বরং। শুভ লক্ষণ, কিন্তু বিপদ এখনও বিন্দুমাত্র কাটেনি। বহুদূরে, দক্ষিণ-পশ্চিমে চোখে পড়ছে তুষার ভেদ করে জেগে ওঠা আঁকাবাঁকা ভিড়েভিড়ি নুনাটাক পর্বতমালা। প্রায়

একশো মাইল লম্বা এই পর্বতের দুর্গম উপত্যকা ধরেই চলতে হবে ওদের আগামীকাল। দিগন্তরেখার কাছে উঁকিঝুঁকি মারছে চাঁদ। বরফের পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো শৃঙ্গগুলোতে চাঁদের আলো পড়ে চিকচিক করছে।

কেবিনে ঢুকে শ্যারিনকে সুপ তৈরি করতে বলল রানা। কিছু শুকনো ফল আর মাংসের টুকরোও গরম করতে বলল। তারপর ব্যারিকে ইঙ্গিত করে আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

ব্যারিকে অ্যান্টেনা টাঙাতে বলে ট্রাক্টরের ইঞ্জিনের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। ক্যাপ খুলে পরীক্ষা করল। রেডিয়েটরের ভেতরেই জমে যাচ্ছে পানি। স্লেজের কাছে এসে দাঁড়াল আবার সে। জেনারেটরটা নামাতে ব্যস্ত ব্যারি। তাকে কিছু জিজ্ঞেস করল। উঠে গিয়ে স্লেজ থেকে ছোট একটা টিন এনে দিল ব্যারি।

টিনটা হাতে নিয়ে আবার রেডিয়েটরের কাছে ফিরে এল রানা। জেনারেটর নিয়ে চলে যাচ্ছে ব্যারি, কেবিন থেকে দূরে সরে গিয়ে রেডিও যোগাযোগ করতে হবে।

ছিপি খুলে রেডিয়েটরে টিনের তরল পদার্থটুকু ঢালতে শুরু করল রানা। ইথাইলিন গ্লাইকোল। পানিকে বরফ হওয়া থেকে রক্ষা করে এই রাসায়নিক পদার্থ।

কাজে এতই মনোযোগ রয়েছে রানার, ব্যাপারটা প্রথমে টের পেল না। যখন পেল, দেরি হয়ে গেছে অনেক। বিপদ টের পেয়েই পেছনে ঘুরতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু তার আগেই কানের ওপর কঠিন কিছুর বাড়ি খেল। অনেকগুলো লাল-নীল-সাদা উজ্জ্বল তারা ফুটল চোখের সামনে। পরক্ষণেই জ্ঞান হারাল।

'রানা! রানা!' একটা ঘোরের মাঝেই ডাকটা কানে গেল রানার। ধীরে ধীরে চোখ মেলল। বরফের ওপর উবু হয়ে পড়ে আছে সে। কাঁধের ওপর ব্যারির হাত। ঠেলছে।

ব্যারিই রানাকে উঠে বসতে সাহায্য করল। 'রানা! কি হয়েছে তোমার! বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিলে কেন?'

এস্কিমোর শক্তিশালী বাহুতে দেহের ভর রেখে আধশোয়া হলো রানা। কানের পাশে আর মাথার ভেতরে অসহ্য যন্ত্রণা। চোখের সামনে আবার অন্ধকার পর্দা এসে ঠাঁই নিতে চাইল, জোর করে মাথা ঝাড়া দিয়ে দূর করল রানা। কানের পাশে হাত দিল। চামড়া কেটে গিয়ে রক্ত বেরিয়ে এসেছে।

'কেউ একজন বেহুঁশ করে ফেলেছে আমাকে,' আস্তে করে বলল রানা। 'বাড়ি মেরেছে, কানের ওপর।'

'বাড়ি মেরেছে!' চাপা কণ্ঠে বলল এস্কিমো, 'কে, কে রানা?'

'জানলে কি আর মারতে দিতাম?' ব্যারির দিকে তাকাল রানা। চাঁদের আলোয় জ্বলজ্বল করছে চোখের নীল মণি, কিন্তু রঙটা বোঝা যাচ্ছে না। 'কাউকে কেবিন থেকে নামতে দেখেছিলে?'

'দূর থেকে দেখেছি তো, চিনতে পারিনি,' বলল ব্যারি। 'তিন-চারজন নেমে এসেছিল কেবিন থেকে।'

আচমকা কথাটা মনে পড়তেই শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করল রানা, 'রেডিও! রেডিওটা কোথায়, রিক?'

'আছে,' গম্ভীর গলায় বলল ব্যারি। 'ওটা আমার কাছেই আছে, রানা। ঠিকই আছে।' কি যেন ভাবল, তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু তোমাকে আক্রমণের কারণ কি?'

ব্যারির মুখের দিকে তাকিয়ে এক সেকেন্ড চুপ করে রইল রানা। ধীরে ধীরে পারকার পকেটে হাত ভরল। খুঁজল। নেই। অন্যান্য পকেটও খুঁজল, কিন্তু পাওয়া গেল না।

'ওয়ালথার···আমার পিস্তলটা নিয়ে গেছে।'

'আর কিছু?'

'না। আর সব ঠিকই আছে,' মাথার ভেতরে দপদপ করছে রানার। 'তা হ্যাঁ, জেনারেটর আর অ্যান্টেনা বসিয়েছ?'

'বসিয়েছি, ও-ই যে,' হাত তুলে দক্ষিণ দিকে দেখিয়ে দিল ব্যারি।

'চলো, যাই, কাজ সারিগে। এখানে মাথায় হাত দিয়ে বসে ভাবলে কোন লাভ হবে না। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে অনেক,' টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল রানা। সারা শরীর কাঁপছে। ব্যারিকে ধরে ধরে এগিয়ে চলল।

লাইন পেতে অসুবিধে হলো না। রেডিওর কাছেই বসে আছে পোর্টার। সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিল সে।

'আপলাভনিকের খবর কি?' কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই জিজ্ঞেস করল রানা।

'দুটো খবর আছে, মিস্টার রানা,' পোর্টারের হাত থেকে ব্রিউস্টারের হাতে চলে গেছে মাইক্রোফোন। ভাবলেশশূন্য যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরে ভেতরের চাপা ক্রোধ বেরিয়ে আসছে। 'ব্রিটিশ শিপ ট্রাইটনের মাধ্যমে খবর নিয়েছে আপলাভনিক। ট্রাইটন ডেভিস প্রণালীতে রয়েছে এখন। আপনারা যেদিকে যাচ্ছেন, ওই উপকূলের দিকেই এগিয়ে আসছে।···হ্যাঁ, খবর নিয়েছি, তোড়জোরের একটা কারণ, প্লেনে তিনজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। একজন নাম করা অভিনেত্রী সুসান গিলবার্ট, একজন বিশিষ্ট আমেরিকান সিনেটর ওয়াল্টার ম্যাক্সওয়েল, আরেকজন হচ্ছেন নাম করা সৌখিন সমাজবেসী, মিসেস ভারনন ডুলানী।'

খবরটা মোটেই নতুন নয় রানার কাছে। কিছু বলতে যাচ্ছিল, আবার কথা বলে উঠল রেডিও।

'একটা খবর শুনলেন,' আবার শোনা গেল ব্রিউস্টারের গলা, 'অন্য খবরটা শুনুন।··· জোর করে যে নামানো হয়েছে প্লেনটা, ইচ্ছে করেই যেন বিশ্বাস করতে রাজি হচ্ছে না অ্যাডমিরালটি। ···আপলাভনিক অবশ্য সন্দেহ করছে, মূল্যবান কিছু একটা ছিল, কিংবা রয়েছে প্লেনের কোন একজন যাত্রীর কাছে। ··· কি হতে পারে, বলতে পারছে না অবশ্য।···ওরা বলছে, থাকলে জিনিসটা ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্সের কাছেই ছিল, তাকে খুন করে হাতিয়ে নেয়া হয়েছে···।'

শুনতে শুনতেই একে অন্যের দিকে তাকাল রানা আর ব্যারি।

'···আপলাভনিকের সঙ্গে আবার যোগাযোগ করুন,' ব্রিউস্টারকে বলল রানা।

'জানতে চেষ্টা করুন, কি ছিল প্লেনে। এবং যাত্রীদের কাকে কাকে সন্দেহ করা যায়।...তা, আপনারা এখন কতটা দূরে আছেন?...আমরা আপনার সঙ্গে যোগাযোগের পর বিশ মাইলের মত এগিয়েছি।...ঠাণ্ডা সাংঘাতিক।... রেডিয়েটরে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে...'

'দুপুরের পর থেকে মাত্র আট মাইল এগিয়েছি আমরা...' আবার ক্রোধ প্রকাশ পেল ব্রিউস্টারের কণ্ঠে।

'মাত্র আট মাইল!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'বলেন কি!'

'হ্যাঁ,' ভয়ঙ্কর গম্ভীর শোনাল ব্রিউস্টারের গলা, 'মাত্র আট মাইল। কেবিন থেকে তিরিশ পাউন্ড চিনি চুরি গিয়েছিল মনে আছে? পাওয়া গেছে ওগুলো। পেট্রোলের ড্রামগুলোয় ফেলা হয়েছিল সব। আমরা নিশ্চল।'

তিন

রাত ন'টার একটু পরে আবার যাত্রা শুরু হলো। রানার ধারণা ছিল, মাঝরাত নাগাদ ব্রিউস্টার এসে মিলিত হবে ওদের সঙ্গে। কিন্তু আর কোন আশা নেই। ব্রিউস্টারের আধুনিক ট্রাক্টর স্নো-ফ্যালকনের ইঞ্জিনে চিনি ঢুকেছে।

ব্যারির কাছে শুনল রানা, ওই ট্রাক্টরের বিশাল কেবিনে ছোটখাট একটা ওয়ার্কশপই আছে বলা যায়। ইঞ্জিনে যে-কোন রকমের গোলমাল হোক, সারানোর মত যন্ত্রপাতি রয়েছে ওখানে, টেকনিশিয়ানও আছে। এরই মাঝে নিশ্চয় কাজ শুরু করে দিয়েছে ওরা। কিন্তু তবু প্রচুর সময়ের দরকার। ইঞ্জিনের সিলিন্ডার, পিস্টন, ভালভগুলো সব খুলতে হবে। চিনির জন্যে জমে ওঠা কার্বন সাফ করতে হবে। এরপর ড্রামের পেট্রোল থেকে চিনি সরাতে হবে। সম্ভবত পাতনের সাহায্যে চোলাই করে নেয়া হবে পেট্রোল। পেট্রোলের স্ফুটনাংক চিনির চেয়ে কম। তাই ড্রামসুদ্ধ গরম করে নিয়ে গলিয়ে চিনি সরাতে হবে। এতে প্রচুর সময়ের দরকার।

ভাবতে ভাবতে ট্রাক্টর চালাচ্ছে রানা। সেই একই রকম একঘেয়ে ক্লান্তিকর বৈচিত্র্যহীন চলা। পশ্চিমে সামান্য বাঁক নিয়ে এখন দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলেছে ওরা। আকাশের অবস্থা আবার খারাপ হতে শুরু করেছে। একটু একটু করে মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। ঘনিয়ে আসছে আরও বিপদ। কেমন একটা হতাশা অনুভব করছে রানা, ভয়ঙ্কর ক্ষোভ জমেছে মনে। কাউকে ধরে দমাদম কিল মারতে পারলে যেন এখন অনেকখানি স্বস্তি পেত সে, এমনি একটা ভাব। স্টিয়ারিঙে আরও চেপে বসেছে আঙুল। উত্তেজনায় চোট লাগা কানটা এবং তার আশপাশের এলাকা আবার দপদপ করতে শুরু করেছে।

অসহায়ই বোধ করছে এখন রানা। নিজের জন্যে নয়, নিরীহ কয়েকটা জীবন এখন তার ওপর নির্ভরশীল, ওদের জন্যে ভাবনা হচ্ছে। সাংঘাতিক অসুস্থ শরাফী, দুর্বল বৃদ্ধা সুসান, শান্ত জার্মান তরুণী মার্থা, শ্যারিন, এরা সবাই নিশ্চিন্তে তার ওপর

নিজেদের ভার তুলে দিয়ে বসে আছে। কিন্তু ওদের কি বাঁচাতে পারবে সে? এতটা প্রতিকূল অবস্থায় কি করে বাঁচাবে সে ওদের? কোন পথ পাচ্ছে না রানা। এভাবে এগিয়ে চলা আর কতক্ষণ? উপকূলে পৌঁছতে আর কত সময় লাগবে? ততক্ষণ বেঁচে থাকবে ওরা সবাই? পুরো অঘটনের জন্যেই দায়ী ওই দুই শয়তান। কারা ওরা?

প্রথম থেকে আবার ভাবতে শুরু করল রানা। মনে মনে খতিয়ে দেখতে চাইল ভাল করে। সে আর ব্যারি ছাড়া দশজন যাত্রী রয়েছে ট্রাক্টরে। তাদের চারজনকে পুরোপুরি সন্দেহমুক্ত করে দেয়া গেছে। এই চারজন হলো মুস্তাফা শরাফী, সুসান গিলবার্ট, শ্যারিন ক্যাম্পবেল, আর মার্থা হফম্যান। আর দু'জনকে এখনও সন্দেহের চোখে দেখছে, তবে শেষ পর্যন্ত ওরাও সন্দেহের বাইরে চলে যাবে, মনে হচ্ছে। এরা দু'জন সিনেটর ম্যাক্সওয়েল আর সৌখিন সমাজসেবিনী ডুলানী।

কিছু কিছু মার্কিন সিনেটরের সম্পর্কে দুষ্ট লোকে অনেক খারাপ মন্তব্য করে। ওরা বলে টাকাপয়সা আত্মসাৎ আর নারীঘটিত কেলেঙ্কারীর সঙ্গে প্রায়ই জড়িত হয়ে পড়ে এদের কেউ কেউ, তবে খুনখারাপিতে এরা নেই। কিন্তু নেই বললেই, যে কেউ কখনও খুনের সঙ্গে জড়িয়ে যাবে না, এটা তো আর হলপ করে বলা যায় না।

আর সমাজসেবিনী নিজে হয়তো খুন করেনি, কিন্তু খুনীর সহকারী হতে তো কোন বাধা নেই।

বাকি রইল চারজন। টম মার্টিন, ডেরেক ক্লেটন, জন ওয়াকার আর রেভারেন্ড নিউবোল্ড। কেমন যেন অতিরিক্ত ভালমানুষ একটা ভাব রয়েছে রেভারেন্ডের মাঝে। গত ক'দিন ধরে বাইবেলটা হাতছাড়া করেনি একবারও। এটা অভিনয় হতে কোন বাধা নেই। কে জানে, ছদ্মবেশ নিয়েছে হয়তো।

জন ওয়াকারের ওপর জোর সন্দেহ হওয়ার মত যথেষ্ট কারণ রয়েছে। ট্রাক্টর সম্পর্কে তার কণামাত্র জ্ঞানও নেই, অথচ বিশাল একটা ট্রাক্টর কোম্পানির সে নাকি কর্মকর্তা। এই লোকটার মাঝেই কোনরকম ঘুম ঘুম ভাব ছিল না, বিমানে সেই প্রথম যখন ঢুকেছিল, দেখেছে রানা। এই লোকটাই ডাক্তার ব্রাউন আর তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক প্রশ্ন করেছে কেবিনে, অনেক খোঁজখবর নিয়েছে। এই লোকটাই ব্যারি আর ক্লেটনকে সুড়ঙ্গ থেকে পেট্রোলের ড্রাম বয়ে আনতে সাহায্য করেছে। তাছাড়া ও-ই নাকি কেবিনের আর সি এ রেডিওটা বাঁচাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ধরার ছুতো করে যে ধাক্কা মারেনি যন্ত্রটাকে, কে বলতে পারে!

ডেরেক ক্লেটন আর টম মার্টিনকে সন্দেহ করারও যথেষ্ট কারণ রয়েছে। প্লেনে নাস্তা কখন দেয়া হবে, শ্যারিনকে জিজ্ঞেস করেছিল ক্লেটন। পেট্রোলের ড্রাম বয়ে আনতে ওয়াকারের মত সে-ও ব্যারিকে সাহায্য করেছিল। ষাঁড়ের মত তাগড়া শরীরটা ছাড়া মুষ্টিযোদ্ধার তেমন কোন লক্ষণ ওর মাঝে দেখতে পাচ্ছে না রানা।

মার্টিন কেবিনে রেডিওটার বেশ কাছাকাছিই ছিল, ঝাড়ুর হাতল দিয়ে ঠেলা মেরে টেবিলের পায়া নাড়িয়ে দেয়া তার জন্যে অসম্ভব ছিল না। তাছাড়া সে কোন মুষ্টিযোদ্ধার ম্যানেজার, এটা ভাবতেই ইচ্ছে হয় না। ক্লেটন আর তার ব্যবহারেও

কেমন একটা খাপছাড়া ভাব। ঠিক মনিব-কর্মচারীর মত মনে হয় না।

হঠাৎই মনে হলো রানার কথাটা। সে ভাবছে, দু'জন খুনী, তিনজন থাকতেই বা বাধাটা কোথায়? রেভারেন্ড ছাড়া চারজনের তিনজনই একই দলের লোক হতে পারে না? প্লেনে যখন আগুন লেগেছিল, নিজের সীটে বসে রয়েছিল ওয়াকার। কফি খায়নি, কেন? হয়তো জানত সে, কফিতে ওষুধ মেশানো হচ্ছে। মুষ্টি-যোদ্ধাকেও তেমন নেশাগ্রস্ত মনে হয়নি। ইচ্ছে করেই সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিল সে। আর মার্টিন? তার নেশা নেশা ভাব দেখানোটা অভিনয়ও হতে পারে। ওর পক্ষে কফিতে ওষুধ মেশানো আর কাগজ জড়ো করে আগুন লাগানো এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। নাহ্, ভেবে কোন কূল কিনারা পাচ্ছে না রানা। মস্ত ধড়িবাজ কিছু লোকের পাল্লায় পড়েছে সে এবারে।

আরও দু'ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে আসছে পথ। বার বার বরফে পিছলে যাচ্ছে ট্রাক্টরের চাকা। পেছনে স্লেজটাকে ব্রেক কষে থামাবার কোন ব্যবস্থা নেই। বারবার ওটা হুমড়ি খেয়ে খেয়ে পড়ছে ট্রাক্টরের ওপর, ধাক্কা মারছে নিচের দিকে। শেষ পর্যন্ত স্লেজে রাখা পেট্রোলের ড্রামগুলো ট্রাক্টরের কেবিনে এনে গাদাগাদি করে রাখতে বাধ্য হলো রানা। কেবিনের ভেতরে আর জায়গা নেই এখন বলতে গেলে। তবে স্লেজের ধাক্কায় সামনে ছিটকে পড়ার আশঙ্কা আর নেই এখন। কিন্তু গতি সাংঘাতিক মন্থর হয়ে গেল।

এভাবেই সারা রাত চলে সকাল সাতটা নাগাদ ভিডেভির পাদদেশে এসে পড়ল ওরা। সামনে পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে বরফের পাহাড়। ঘুরে গেলে অন্তত শ'সোয়াশো মাইল বেশি পাড়ি দিতে হবে। আরেকটা পথ আছে, তাতে এই বাড়তি পথটুকু বাঁচিয়ে নেয়া সম্ভব, জানাল ব্যারি। কিন্তু সেই বিকল্প পথ সাংঘাতিক দুর্গম। যেখানে আছে ওরা এখন, তার মাইলখানেক পশ্চিমে গিরিপথ আছে একটা। ভিডেভিকে ভেদ করে গেছে এই গিরিপথ। মাঝে মাঝে সাংঘাতিক বিপজ্জনক ফাটল রয়েছে, রয়েছে আলগা তুষারের স্তূপ। এসব এড়িয়ে ওপারে যাওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু সম্ভব করা গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছানো যেত।

'একেবারে অসম্ভব নিশ্চয়ই নয়?' জানতে চাইল রানা।

'না, তা হয়তো নয়,' অনিশ্চিত শোনাল ব্যারির গলা।

'তাহলে ওই পথেই যাব আমরা। এমনিতেও মরতে বসেছি, আর একটু ঝুঁকি না হয় নিলামই। তাতে ভালও হতে পারে।'

ঠিক হলো, গিরিপথ পেরিয়েই ওপারে যাবে ওরা। কিন্তু এখন থামবে। বিশ্রাম নেবে। দুপুর বেলা ঘণ্টা দুই তিনের জন্যে আলো ফুটবে, তখন পেরোনোর চেষ্টা করবে ওই পথ।

ট্রাক্টর থামল। কেবিনে এসে শ্যারিনকে নাস্তা তৈরির নির্দেশ দিল রানা। তারপর শরাফী আর সুসানের দিকে মনোযোগ দিল।

তাপমাত্রা এখন অনেক উঠে গেছে। শূন্যের নিচে তিরিশ ডিগ্রীতে এসে গেছে ইতোমধ্যেই। কিন্তু তাতে কোন লাভ হচ্ছে না শরাফী আর সুসানের। তাদের অবস্থার উন্নতি হয়নি মোটেও। অভিনেত্রীকে দেখে মনে হচ্ছে দীর্ঘদিন অনাহারে

রয়েছেন। সারা মুখে ফ্রস্টবাইটের ছোট ছোট অসংখ্য ক্ষত। কৃশ হয়ে গেছে শরীর। প্রচণ্ড অবসাদের চিহ্ন মুখে চোখে। এককালে অপূর্ব সুন্দর যে চোখ বহু পুরুষের রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছে, এখন সে দুটো টকটকে লাল। যেন মাতালের চোখ।

শরাফীর রোগ আরও বেড়েছে। এখন আর অ্যাসিটোনের গন্ধ শোঁকার জন্যে তার নাকের কাছে যেতে হয় না। অনেক জোরাল আর ভারী হয়ে উঠেছে গন্ধটা। জানে রানা, শিগ্‌গিরই আচ্ছন্নতা আসবে শরাফীর। এরপর অতি দ্রুত আরও বেশি খারাপ হতে থাকবে তার অবস্থা।

খুঁড়িয়ে হাঁটছে শ্যারিন, লক্ষ করল রানা। স্টুয়ার্ডেসের পা পরীক্ষা করে দেখল। ফ্রস্টবাইট। ক্ষতগুলো খুব খারাপ। ডুলানীর চোখ ঢুলঢুলু, কেমন যেন নেশাখোরের মত। আসছে, ওরও সময় ঘনিয়ে আসছে, ভাবল রানা। আশ্চর্য শান্তভাবে বসে আছে শান্ত মেয়ে মার্থা হফম্যান। হাড়ভাঙা, নিশ্চয় দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে, কিন্তু কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না সে। মুখে বেদনার কোন ছাপই নেই। সেই একইভাবে বাইবেলের পাতায় নিমগ্ন রেভারেন্ড। আগের চেয়ে কাহিল। সবাই আগের চেয়ে বেহাল।

আটটা নাগাদ ব্যারির সাহায্যে অ্যান্টেনা, জেনারেটর এবং রেডিও নিয়ে ট্রাক্টর থেকে শ'দুয়েক গজ দূরে চলে এল রানা। ব্রিউস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল। খারাপ খবর। গত বারো ঘণ্টায় মাইল দুয়েকের মত এগিয়েছে স্নো-ফ্যালকন। হ্যাঁ, যা ভেবেছিল রানা, পেট্রোলের ড্রাম গরম করেই চোলাইয়ের কাজ চালানো হচ্ছে। ইঞ্জিন পরিষ্কার করে ফেলা হয়েছে। এখন একটু একটু করে যা চোলাই হচ্ছে ট্রাক্টরের ট্যাঙ্কে ভরে এগোনোর চেষ্টা করছে ব্রিউস্টার। না, আপলাভনিক থেকে আর নতুন কোন খবর পায়নি।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে আবার ট্রাক্টরে ফিরে এল রানা আর ব্যারি। খেয়াল করল রানা, এস্কিমোর মুখে সারাক্ষণ লেগে থাকা হাসির আভাসটুকু এখন আর নেই। গম্ভীর, চুপচাপ হয়ে গেছে।

বেলা এগারোটায় আলো ফুটল। রওনা হয়ে পড়ল ওরা। ড্রাইভ করছে রানা। তার পাশে এখন আর কেউ নেই। ট্রাক্টরের ক্যাবে একাই আছে সে।

কেবিনে তেলের ড্রাম থাকায় ওখানে যাত্রীদের সবার জায়গা হচ্ছে না। তাছাড়া উঁচুনিচু এবড়োখেবড়ো পথে কতগুলো তেলের ড্রামের পাশে কারও থাকা নিরাপদ নয়। অন্য ব্যবস্থা করেছে তাই রানা। সবাইকে কেবিন থেকে বের করে দিয়েছে। তার জায়গায় স্লেজ থেকে আরও কিছু ভারী মালপত্র এনে তুলেছে ব্যারি, ক্লেটন আর ওয়াকারের সহায়তায়। শরাফী আর সুসানকে কয়েকটা করে কম্বলে পেঁচিয়ে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিয়েছে কুকুরে টানা স্লেজটায়। অন্যেরা সব ট্রাক্টরের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে। শ্যারিন আর মার্থাকে ট্রাক্টরে টানা স্লেজটায় চড়তে বলেছিল রানা, কিন্তু ওরা দু'জনই হেঁটে আসতে চাইল। বেশি চাপাচাপি করেনি আর রানা।

গিরিপথে এসে ঢুকেছে ট্রাক্টর। সিত্রোঁর জন্যে পথটা সরু। কোথাও কোথাও একআধটু প্রশস্ত হচ্ছে, কিন্তু সেটা বেশি নয়, মাত্র আট-ন'ফুট হবে। দুদিকে কয়েকশো ফুট ওপরে খাড়া উঠে গেছে বরফের দেয়াল। দেয়ালের চূড়ায় বরফ জমতে জমতে বাইরের দিকে ছাতার মত বেরিয়ে এসেছে। কোন কোন জায়গায় দুদিকের দেয়াল থেকে বেরোনো এই ছাতা গায়ে গায়ে লেগে গিয়ে ছাদ সৃষ্টি করে ফেলেছে। খুবই খারাপ অভিযাত্রীদের জন্যে। ঠাণ্ডা বেড়ে যাওয়ায় সৃষ্টি হয়েছে ওই ছাদ, কমে গেলেই ধসে পড়বে। ট্রাক্টরের ওপর পড়লে নিমেষে গুঁড়িয়ে দেবে সবকিছু, মানুষজন সুদ্ধ।

প্রথম প্রথম পথ পাওয়া গেল মোটামুটি মসৃণ এবং সমতল। প্রশস্তও। ফলে দ্রুত এগোল ওরা। মাইলখানেক পর থেকেই খারাপ হতে শুরু করল পথ। অসমতল এবড়োখেবড়ো। দুদিক থেকে চেপে আসছে বরফের দেয়াল। কোন কোন জায়গায় এত সরু হয়ে গেছে যে চলতে গিয়ে ঘষা খাচ্ছে ট্রাক্টরের কেবিনের দুই পাশ।

এক ঘণ্টা পর আরও খারাপ হয়ে এল পথের অবস্থা। দুদিকের দেয়াল অনেকখানি সরে গেছে, কিন্তু পথ তেমনি সরুই রয়েছে। কারণ একপাশ থেকে পথের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেছে চওড়া গভীর ফাটল। ট্রাক্টরের চাকা পিছলে কিংবা অন্য কোন কারণে খাদে পড়ে গেলেই সর্বনাশ! অতি সাবধানে গাড়ি চালাতে হচ্ছে। স্টিয়ারিঙের দায়িত্ব ব্যারি ছাড়া আর কারও হাতে দিতে ভরসা পাচ্ছে না রানা। যতক্ষণ পারছে নিজেই চালাচ্ছে, তারপর স্টিয়ারিঙ ছেড়ে দিচ্ছে ব্যারির হাতে।

ব্রিউস্টারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল রানা। কোন্ পথে চলছে ওরা, জানানো দরকার ক্যাপ্টেনকে। এই-ই সময়। এরপর কখন আবার যোগাযোগ করতে পারবে, ঠিক নেই। ট্রাক্টর থামিয়ে নেমে এল রানা। সবাইকে বিশ্রাম নিতে বলে ব্যারির সহায়তায় রেডিওর সরঞ্জামসহ দূরে সরে গেল।

দ্রুত ব্রিউস্টারের সঙ্গে কথা শেষ করল রানা। নতুন আর কোন খবর নেই। স্নো-ফ্যালকনের অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

আবার চলল ওরা। আগে আগে ট্রাক্টর আর স্লেজ নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে রানা। পেছনে কুকুরের স্লেজের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসছে অন্যেরা।

কয়েকশো গজ যেতে না যেতেই ঘটল বিপত্তি। ছুটে এসে থামতে বলল ওয়াকার। ট্রাক্টর থামিয়ে দিল রানা।

'সর্বনাশ হয়ে গেছে, রানা!' হাঁপাচ্ছে ওয়াকার। ইঞ্জিনের বিকট শব্দের জন্যে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে তাকে। 'মেয়েটা পড়ে গেছে!'

'কি বললে? কে পড়ে গেছে!' বলতে বলতে ড্রাইভিং সীট থেকে দ্রুত নেমে এল রানা।

'ওই জার্মান মেয়েটা···খাদে পড়ে গেছে। পা হড়কে গিয়েছিল মনে হয়···ব্যারি পড়েছে গিয়ে ওর সঙ্গে।'

আর কিছু শোনার প্রয়োজন বোধ করল না রানা। ছুটল।

ট্রাক্টরের পেছনে চল্লিশ গজ মত দূরে ফাটলের পাশে জটলা করছে সবাই।

নিচের দিকে উঁকিঝুঁকি মারছে। সাংঘাতিক উত্তেজিত।

কাছে এসে ধাক্কা মেরে সিনেটর আর মার্টিনকে একপাশে সরিয়ে দিল রানা। উঁকি দিয়ে চাইল নিচের দিকে। সাত-আট ফুট চওড়া হবে এখানে ফাটল। দেয়ালের ওপরের দিকটায় আলো আছে, তারপর কমতে কমতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে এক সময়। তলাটা দেখা যায় না। বরফে আলোর কোন ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্যেই হয়তো খাদের তলাটা ঠিক কালো নয়, নীলচে-সবুজ মনে হচ্ছে। কিংবা চোখের ভুলও হতে পারে, ভাবল রানা। তার বাঁয়ে ফুট বিশেক নিচে এক জায়গায় আলগা বরফ জমেছে। পথের পাশে দেয়ালের চূড়ায় যে কারণে যেভাবে বরফ জমে ছাদ সৃষ্টি হয়েছে, ফাটলের নিচের ওই আলগা বরফও একইভাবে জমেছে। কোন কারণে জোরে চাপ লাগলে কিংবা তাপ বেড়ে গেলে ধসে পড়বে কয়েকশো ফুট নিচে। আর ওখানেই মার্থাকে জড়িয়ে ধরে ওপরের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রয়েছে রিক ব্যারি।

ফাটলের বেশি কাছে চলে এসেছিল হয়তো মার্থা, পিচ্ছিল বরফে পা পিছলে গিয়ে পড়েছে খাদে, অনুমান করল রানা। ভাঙা হাড় নিয়ে এভাবে পড়ে এখনও যে বেঁচে রয়েছে মেয়েটা এটাই আশ্চর্য। এস্কিমো নিশ্চয় লাফিয়ে নেমেছে ওখানে। তার সাহসের তারিফ করল রানা মনে মনে। যে-কোন সময় ভেঙে নিচে খসে পড়তে পারে আলগা বরফ। তাহলে দু'জনেই শেষ হয়ে যাবে। খাদটা কয়শো ফুট গভীর, এখানে দাঁড়িয়ে অনুমান করা অসম্ভব।

'ব্যারি-ই-ই!' ঝুঁকে চেঁচিয়ে ডাকল রানা। 'ঠিক আছ তো!'

'আমার বাঁ হাতটা ভেঙে গেছে মনে হচ্ছে,' জবাব এল নিচে থেকে। 'তাড়াতাড়ি আমাদের ওপরে তোলার ব্যবস্থা করো। পায়ের তলায় বরফ পাতলা, যে কোন সময় খসে যেতে পারে।'

কি করে ওদের ওপরে তোলা যায়? প্রথমেই দড়ির কথা মনে পড়ল রানার। মেয়েটার কলার বোন ভাঙা, তার ওপর এখন পড়ে গিয়ে আরও দু'এক জায়গায় ভেঙেছে কিনা কে জানে। ব্যারিই যখন হাত ভেঙে ফেলেছে···। ওঠার ব্যাপারে মার্থা কোনরকম সাহায্য করতে পারবে না। ব্যারিরও এক হাত ভাঙা। একটা মেয়েকে নিয়ে একহাতে দড়ি বেয়ে ওঠা···সম্ভব নয়।

বেশিক্ষণ চিন্তা করার সময় নেই। ছুটল রানা আবার। স্লেজ থেকে নাইলনের দড়ির বান্ডিল তুলে নিল। সেইসাথে গোটা দুই গজাল আর হাতুড়ি নিয়েই ছুটল আবার।

ফাটলের ধারে গজাল পুঁততে গিয়ে টের পেল রানা, অসম্ভব। কঠিন বরফে গজাল ঢুকতেই চাইছে না। জোর করে গজালের মাথায় হাতুড়ি দিয়ে যদিও বা কিছুটা ঢোকানো হচ্ছে, থাকছে না। সামান্য টানেই উঠে আসছে আবার।

'রা-না-আ!' খাদের তলা থেকে ব্যারির চিৎকার শোনা গেল, 'জলদি করো। বরফের ধার থেকে আস্তর ভেঙে পড়ছে! জলদি···'

গজাল পোঁতা রেখে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। ক্লেটনকে বলল, 'আমার সঙ্গে আসুন!' বলেই ঘুরে ছুটতে শুরু করল আবার ট্রাক্টরের দিকে।

সাময়িক সেতু বানানোর জন্যে বড় বড় কয়েকটা তক্তা নেয়া হয়েছে সঙ্গে। সরু বিপজ্জনক পথে স্লেজসুদ্ধ ট্রাক্টর পিছিয়ে আনা অসম্ভব, তাই বাধ্য হয়ে স্লেজ থেকে ওই তক্তারই একটা তুলে নিল রানা আর ক্লেটন। বিশাল তক্তা, এগারো ফুট লম্বা। বেশ মোটা। ওজন একশো পাউন্ডের কম হবে না। ধরাধরি করে তক্তাটা ফাটলের কাছে নিয়ে এল দু'জনে। ফাটলের ওপর আড়াআড়ি ভাবে ফেলল।

তক্তার এপাশের প্রান্তে ফুট দুয়েকের ভেতরেই দড়ির এক প্রান্ত পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধল রানা। অন্য প্রান্তে দ্রুত হাতে একটা ফাঁস বানাল। নিজের মাথার ওপর দিয়ে এনে ফাঁসটা কোমরে আটকাল। তারপর এই দড়িটা ধরে ঝুলে পড়ল। সহজেই নিচে নেমে এসে ব্যারি আর মার্থার পাশে দাঁড়াল সে।

নেমেই টের পেল রানা, একটু একটু কাঁপছে পায়ের তলার বরফ। ওপরের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে আরেকটা দড়ি ছুঁড়ে দিতে বলল সে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে এসে পড়ল একটা দড়ির প্রান্ত। কে ছুঁড়েছে, দেখার কোন প্রয়োজন বোধ করল না রানা। এখন অত সময় নেই। দড়িটা এসে পড়ামাত্রই তুলে নিয়ে দ্রুত হাতে ফাঁস বানাল। মার্থার মাথা গলিয়ে কোমরে এনে আটকে দিল ফাঁস। চেঁচিয়ে টেনে তোলার নির্দেশ দিল আবার।

দড়িতে টান পড়তেই মার্থাকে ঠেলে তুলে দিল রানা যতটা সম্ভব। নিচ থেকে ওকে ধাক্কা দিয়ে তুলে দেবার সময় আচমকা চাপ লাগল পায়ের তলার বরফে। অনেক চোট-পাট সয়েছে, আর পারল না। 'হু-ড়ু-ম্-ম্' শব্দ তুলে ধসে পড়ল একপাশের বরফ। কিন্তু তার আগেই ব্যারিকে জড়িয়ে ধরে দোল খেয়েছে রানা। ওপাশের দেয়ালে গিয়ে জোরে আছড়ে পড়ল দুটো শরীর। ভাঙা হাতটায় বাড়ি লাগতেই আর্তনাদ করে উঠল ব্যারি।

একটা পাশ ধসে পড়েছে, অন্য পাশটা আর বেশিক্ষণ থাকবে না। তাছাড়া ভার সইবার ক্ষমতাও এখন অনেক কমে গেছে এই বরফের। ওটাতে বেশি চাপ দিল না রানা। ব্যারিকে জড়িয়ে ধরে রেখে দড়িতে শরীরের বেশির ভাগ ভর রাখল। অতিরিক্ত ওজনে কোমরে কেটে বসে যেতে চাইছে দড়ি। ঠিক এই সময়, একটা চিৎকার শুনে চমকে উপরের দিকে তাকাল রানা। ভেবেছিল, মার্থা বুঝি ভাঙা হাড়ে চোট পেয়ে চিৎকার করে উঠেছে। কিন্তু না, অন্য কারণে চেঁচিয়েছে মার্থা। খাদের ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে জন ওয়াকার। হাতে ব্যারির লী-এনফিল্ড রাইফেল।

জীবনে এতখানি অসহায় আর কখনও বোধ করেনি রানা। মরা ছাড়া এখন করার আর কিছু নেই। পরিষ্কার বুঝল রানা, মার্থা পা হড়কে পড়েনি, ইচ্ছে করেই খাদে ফেলা হয়েছে তাকে। সেই সঙ্গে ফাঁদে ফেলা হয়েছে রানা আর ব্যারিকে। সহজ ব্যাপার। খুনীরা জানে, রানা আর ব্যারিকে সাধারণ অবস্থায় কব্জা করা সহজ হবে না। তাই সুযোগের অপেক্ষায় থেকেছে। গিরিপথে ঢুকে ফাটলটা দেখার পরই বুদ্ধিটা এসেছে তাদের কারও মাথায়। ফাটলের মাঝে মাঝেই কয়েক ফুট নিচে আলগা বরফের ব্রিজ তৈরি হয়েছে। ও জানে, মার্থা কিংবা শ্যারিনকে ওই সব ব্রিজে ফেলতে পারলে তুলে আনার জন্যে নামবে রানা। সেই সুযোগে রানাকে খতম করে দেয়া কঠিন হবে না। ব্যারি একা ওপরে থাকলেও দু'জনের বিরুদ্ধে তেমন

সুবিধে করতে পারবে না, এটাই ধরে নিয়েছে খুনী। মার্থা কিংবা শ্যারিনের আচমকা পতনের ফলে ব্রিজ ধসে পড়ার সম্ভাবনাটা বাদ দেয়নি ওরা। সেক্ষেত্রে তাদের প্ল্যান মাফিক কাজ হবে না। এটাও জানে। তাহলে শুধু শুধু একটা জীবন নষ্ট হবে, জেনেও দ্বিধা করেনি। রাগে দাঁতে দাঁত চাপল রানা, কিন্তু এখানে এই পরিস্থিতিতে একেবারেই অসহায় সে। করার কিছুই নেই। উল্টে তার আর ব্যারির জীবন এখন নির্ভর করছে ওয়াকারের হাতেই।

পাশ ফিরে উত্তেজিতভাবে উপরের কাউকে ধমক দিল ওয়াকার। মুহূর্ত পরেই তার পাশে এসে দাঁড়াল রেভারেন্ড, দেখতে পেল রানা। চকিতে বাঁ হাতে রাইফেলটা চালান করল ওয়াকার, ডান হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আঘাত করল রেভারেন্ডের মুখে। অস্ফুট আর্তনাদ করে দুই হাতে মুখ চেপে ধরল রেভারেন্ড। আবার ধমকে কি আদেশ দিল তাকে ওয়াকার। একটু একটু করে পিছে হটে গেল রেভারেন্ড।

এইবার তাদের পালা, ভাবল রানা। দুটো বুলেট খরচ করার কোনই দরকার নেই ওয়াকারের। পা দিয়ে তক্তার একটা পাশ ফাটলের ভেতরে ঠেলে দিলেই হলো। একশো পাউন্ড ওজনের তক্তাটা সোজা এসে পড়বে রানা আর ব্যারির ওপর, দু'জনকে নিয়ে বরফের আধখানা ব্রিজ খসিয়ে নিয়ে চলে যাবে নিচের দিকে।

নিজেদের বাঁচানোর কোনই উপায় দেখল না রানা। ওয়াকারের হাতে রাইফেল রয়েছে, অন্য কেউ সাহায্যও করতে পারবে না তাদের দু'জনকে। ব্যারির দিকে একবার তাকাল রানা। ওপরের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে এস্কিমো। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে নীল দুই চোখের তারা।

মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, এই সময় চেঁচিয়ে ওপরের কাকে নির্দেশ দিল ওয়াকার, 'জলদি দড়িটা ছুঁড়ে দিন। ওরা দু'জন সারাদিন অপেক্ষা করবে নাকি ওখানে?'

চার

রানা আর ব্যারি ওপরে উঠে আসতেই রাইফেলটা এস্কিমোর দিকে বাড়িয়ে ধরল ওয়াকার। 'ব্যারি, অস্ত্রশস্ত্র রাখার ব্যাপারে তেমন হুঁশিয়ার নন আপনি। যেখানে সেখানে ফেলে রাখেন। এই নিন।'

ভাল হাতটা বাড়িয়ে রাইফেলটা নিতে নিতে বলল ব্যারি, 'ঠিকই বলেছেন। কাজটা মোটেই উচিত হয়নি।'

'কিন্তু আপনি ওভাবে রাইফেল নিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা। 'আর রেভারেন্ডকেই বা মারলেন কেন?'

'ব্যারি ছাড়া আর কেউ এই গিরিপথ পার করে নিয়ে যেতে পারবে না আমাদের, রানা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ওয়াকার। 'কেউ একজন এসে লাথি মেরে

তক্তাটা সরিয়ে দিক, চাইনি। আরও কিছুদিন বাঁচার শখ আছে আমার।' বলেই আর দাঁড়াল না সে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করল ট্রাক্টরের দিকে।

ওয়াকারের কথার আসল মানে বুঝতে বেগ পেতে হলো না রানার। আসলে তার মত ওয়াকারও বুঝে গেছে, মার্থাকে ইচ্ছে করেই ঠেলে ফেলে দিয়েছে কেউ। নিপুণভাবে সাজিয়েছে ঘটনা, খুন করার জন্যে।

ওয়াকার চলে যেতেই ব্যারির দিকে নজর দিল রানা। 'পারকাটা খোলো তো, কোথায় ভেঙেছে দেখতে হবে।' পারকা খুলতে ব্যারিকে সাহায্য করল রানা।

আসলে হাড় ভাঙেনি ব্যারির। কনুইয়ের জয়েন্ট ডিসলোকেট হয়ে গেছে। জোর করে চেপে আবার জয়েন্ট ঠিক করে দিল রানা। ব্যথা কেমন পেয়েছে ব্যারি, অনুমান করতে পারছে সে। কিন্তু বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই এস্কিমোর মুখে। হাসি হাসি ভাবটাও মুছে যায়নি। নীল চোখের তারা ক্ষণিকের জন্যে ঝিকিয়ে উঠেই স্বাভাবিক হয়ে গেছে আবার। অস্বাভাবিক সহ্যশক্তি। পারকা পরে রাইফেলটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিল এবার ব্যারি। বোকার মত রাইফেলটা কাছছাড়া করার ইচ্ছে নেই আর।

ধীরে ধীরে হেঁটে কুকুরে-টানা স্লেজের কাছে এসে দাঁড়াল রানা। চুপচাপ বসে রয়েছে মার্থা। দু'দিকে বসে তাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন সুসান আর ডুলানী। ডুলানী! ডুলানী আবার সান্ত্বনা দিতেও জানে! কারও জন্যে সহানুভূতি আর সমবেদনাও জাগে তার মনে! অবাকই হলো রানা।

'গেছিলেন তো আরেকটু হলেই,' মার্থাকে বলল রানা। 'আর কোন হাড়টাড় ভাঙেনি তো?'

'না,' বিষণ্ণভাবে এদিক ওদিক মাথা দোলাল মার্থা। 'মিস্টার ব্যারি আর আপনি না থাকলে কি যে হত…ধন্যবাদ…'

'ওসব কথা থাক,' বাধা দিল রানা। 'এখন বলুন তো, কে ধাক্কা দিয়েছিল আপনাকে?'

'অ্যাঁ…' চমকে মুখ তুলল মার্থা। 'ধাক্কা?'

'হ্যাঁ। লোকটা কে?'

'ধাক্কা…না, ধাক্কা ঠিক মারেননি,' অনিশ্চিত গলায় বলল মার্থা। 'তবে ওপরে এসে পড়েছিলেন।'

'কে?' কঠোর কণ্ঠে জানতে চাইল রানা।

'আমি,' বলে উঠল টম মার্টিন। হাত কচলাচ্ছে, মরমে মরে যাচ্ছে যেন। 'আমি গিয়ে পড়েছিলাম ওর ওপর। হোঁচট খেয়েছিলাম…।'

'হোঁচট খেলেন কোথায়?' মার্টিনের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকাল রানা।

'হোঁচটও ঠিক খাইনি… কেউ আমার জুতোর গোড়ালিতে ঠোকর মেরেছিল, পেছন থেকে জুতোর ডগা দিয়েই সম্ভবত।'

'কে ঠোকর মারল? অত ভণিতা না করে নামটা বলে ফেলছেন না কেন?' রাগ দমাতে পারল না রানা।

'তা তো জানি না!' এদিক ওদিক মাথা নাড়াল মার্টিন। 'হোঁচট খেয়ে গিয়ে পড়লাম মার্থার ওপর। তার পরেই তো এই বিপত্তি। উত্তেজনায় পেছন ফিরে

তাকাবার কথাটা একবারও মনে হয়নি।'

'হুঁ,' মার্টিনের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল রানা। তার সামনে এসে দাঁড়াতে চাইল ক্লেটন। কিন্তু ঠেলে ওকে সরিয়ে দিয়ে আর কিছু না বলে ট্রাক্টরের দিকে চলল সে। জানে, এ ব্যাপারে আর কিছু জানতে চেয়েও লাভ নেই। প্রতিটি উত্তর হবে না-বাচক।

ট্রাক্টরের পেছনে স্লেজে বসে রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ধরে বসে আছে রেভারেন্ড। ওয়াকারের চড় খেয়ে ঠোঁট কেটে গেছে। রেভারেন্ডের পাশে লজ্জিতভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওয়াকার।

পাশ দিয়ে যাবার সময় একবার থামল রানা। 'আমারই দোষ, রেভারেন্ড,' নিজেকে দেখাল রানা বুড়ো আঙুল দিয়ে। 'আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তাহলেই অঘটনটা ঘটত না।' বলেই আর দাঁড়াল না। এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে। আলো কমে আসছে ধীরে ধীরে। আর একটু পরেই ঝুপ করে নামবে অন্ধকার। তার আগেই গিরিপথটা পেরোতে না পারলে আরও বিপদে পড়তে হবে।

আবার চলল আজব ক্যারাভান। ধীরে ধীরে ট্রাক্টর চালাচ্ছে রানা। পেছনে দুই ধরনের স্লেজ, পায়ে-হেঁটে-আসা কিছু মানুষ, কুকুর। সামনে বরফে ঢাকা দুর্গম পথ, ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে নেমে গেছে। একপাশে ভয়ঙ্কর ফাটল।

আলো একেবারে মুছে যাবার আগেই গিরিপথটা পেরোল ওরা। সামনে আবার ধু-ধু বরফ, ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। গিরিপথের মুখ থেকে সামান্য দূরে ট্রাক্টর থামাল রানা। নেমে ব্যারির সঙ্গে দুয়েকটা কথা বলে স্লেজের কাছে এসে দাঁড়াল। খাবারের জন্যে কিছু মাংস আর ফল গরম করতে বলল শ্যারিনকে।

সাংঘাতিক দুর্গম এলাকাটা পেরিয়ে এসেছে, এখন আর এই ঠাণ্ডার মধ্যে সুসান এবং শরাফীকে বাইরে রাখার কোন মানে হয় না। তাছাড়া অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়বে। দু'জনকেই আবার নিয়ে গিয়ে কেবিনে শুইয়ে দেয়া হলো।

কাজ সবে শেষ করেছে রানা, এমনি সময়ে কেবিনের ক্যানভাস সরিয়ে উঁকি দিল শ্যারিন। 'মিস্টার রানা?'

'কি?'

'মাংস,' স্টুয়ার্ডেসের আয়ত বাদামী চোখে শঙ্কার ছায়া। 'মানে, মাংসের টিনগুলো খুঁজে পাচ্ছি না।'

'খুঁজে পাচ্ছেন না!' অবাক হয়েই শ্যারিনের দিকে তাকাল রানা।

'না,' এদিক ওদিক মাথা দোলাল শ্যারিন।

'কিন্তু মাংসের টিন যাবে কোথায়? ভাল করে খুঁজে দেখেছেন?'

'দেখেছি।'

'আসুন তো, আরেকবার খুঁজে দেখি। রিক কোথাও রেখেছে হয়তো।'

কিন্তু না, অনেক খোঁজাখুঁজি করেও টিনগুলো পাওয়া গেল না। সত্যিই গায়েব হয়ে গেছে ওগুলো।

স্লেজের পাশে দাঁড়ানো ব্যারির দিকে তাকাল রানা। 'দাঁড়াও এখানে।'

অনেকক্ষণ বাইরে থেকে জমে যাবার যোগাড় হয়েছে সবাই। কেবিনে ঢুকে স্টোভের আগুনে সেঁকে হাত-পা গরম করার চেষ্টা করছে।

ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিল রানা। 'বেরিয়ে আসুন আপনারা।'

মুখ তুলে তাকাল সবাই। রানার ডাক শুনেই বুঝতে পারল, কিছু একটা ঘটেছে। কেউ কোন কথা বলল না। একে একে নেমে এল কেবিন থেকে, অবশ্যই সুসান আর শরাফী ছাড়া।

কেবিনের পাশে খোলা জায়গায় সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করাল রানা। কোনরকম ভণিতা না করে গম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'মাংসের টিনগুলো খুঁজে পাচ্ছি না। তার মানে এই নয় যে হারিয়ে গেছে। কেউ চুরি করেছে ওগুলো। কে করেছেন কাজটা?'

কেউ কোন জবাব দিল না। হাঁ করে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন বুঝতে পারছে না, রানা কি বলছে।

'না বললে আমাকেই খুঁজে বের করতে হবে। এবং সেটা চোরের জন্যে সুখকর হবে না,' আবার বলল রানা।

এবারেও কেউ কিছু বলল না। অন্ধকার নামছে। চারদিকে কেমন একটা জমাট নিস্তব্ধতা। মাঝেমধ্যে কেঁ-উঁ-উঁ-উঁ করে ডাক ছাড়ছে স্লেজের একআধটা কুকুর।

অখণ্ড এই নীরবতায় সেফটি ক্যাচ অফ করার শব্দটা বড় বেশিই কানে বাজল। চমকে ফিরে তাকাল সবাই। ক্লেটনের শিরদাঁড়া বরাবর নিশানা করে রয়েছে লী-এনফিল্ড।

'এক হাতেই একশো গজ দূরের টার্গেট মিস করে না রিক,' বলল রানা। আপনি থেকে তুমিতে চলে এল হঠাৎই। 'ক্লেটন, দয়া করে অবিশ্বাস কোরো না কথাটা। হ্যাঁ, তোমার ব্যাগটা দেখতে চাই।'

হাঁ করে রানার দিকে তাকিয়ে রইল ক্লেটন একমুহূর্ত, তারপর বলল, 'বোকামি করছেন আপনি, রানা!'

'কি করছি না করছি, প্রমাণ হয়ে যাবে এখুনি,' ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে বলল। 'ওর ব্যাগটা নিয়ে আসুন তো।'

সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে স্লেজ থেকে ক্লেটনের ব্যাগটা নিয়ে এল ওয়াকার। রানার পায়ের কাছে এনে নামিয়ে রাখল।

'খুলুন,' ইঙ্গিতে ব্যাগটা দেখিয়ে বলল রানা।

একবার চেষ্টা করেই সোজা হলো ওয়াকার। 'চাবি দেয়া।'

'চাবিটা?' ক্লেটনের দিকে হাত বাড়াল রানা।

বোবা শূন্য দৃষ্টি মেলে রানার দিকে তাকাল ক্লেটন। ধীরে ধীরে হাত ঢোকাল পারকার পকেটে।

'খুব আস্তে আস্তে হাত বের করবেন,' হুঁশিয়ার করল রানা। 'একটু বেসামাল দেখলেই গুলি করবে রিক। ওর হাতের ব্যথা কমেনি এখনও, কাজেই রাগ

পড়েনি।'

পকেট হাতড়াল ক্লেটন। বিস্ময় ফুটছে চেহারায়। হাত বের করে আনল আবার পকেট থেকে। একে একে সবকটা পকেট খুঁজল। 'চাবিটা···চাবিটা নেই। কিন্তু পরিষ্কার মনে আছে, পকেটেই রেখেছিলাম।'

'থাকবে না, এটাই আশা করেছিলাম···,' বলতে বলতে রেভারেন্ডের দিকে তাকাল রানা। মুখে এখনও রুমাল চেপে ধরে আছে সে। ওয়াকারের দিকে ফিরল। ক্লেটনকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'ওর পকেট সার্চ করুন।'

একটু দ্বিধা করল ওয়াকার। ফিরে ব্যারির রাইফেলের দিকে তাকাল একবার। শ্রাগ করল। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন এগিয়ে গেল ক্লেটনের কাছে।

ক্লেটনের প্রতিটি পকেটই শুধু নয়, পোশাকের ভাঁজে-খাঁজে সম্ভাব্য সমস্ত জায়গায় খুঁজে দেখা হলো, কিন্তু চাবি পাওয়া গেল না। 'নেই,' মাথা নাড়ল ওয়াকার। কি মনে করে মার্টিনের দিকে তাকাল। মুখে চিন্তার ছাপ।

মার্টিনের দিকে রানাও তাকাল। তারপর ওয়াকারকে জিজ্ঞেস করল, 'ওর পকেটে দেখতে চান?'

'না···মানে, ইয়ে···' আমতা আমতা করল ওয়াকার।

'বেশ দেখুন,' বলল রানা।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে মার্টিনের পাশে দাঁড়াল ওয়াকার। পারকার এক পকেটে হাত দিল। নেই। অন্য পকেটে ঢুকিয়েই দ্রুত বের করে আনল হাত। চোখের সামনে তুলে ধরল গোছাটা। চাবি।

'এগুলো আপনার?' মার্টিনকে জিজ্ঞেস করল ওয়াকার।

কিন্তু মার্টিন জবাব দেবার আগেই চেঁচিয়ে উঠল ক্লেটন, 'ওই ওয়াকারই নিয়ে রেখেছে মার্টিনের পকেটে! সব সাজানো ব্যাপার!'

'শাটাপ!' কড়া গলায় ধমকে উঠল রানা। 'এগুলো তোমার?'

আবার কি যেন বলতে গিয়েও থেমে গেল ক্লেটন। আস্তে করে মাথা নাড়াল।

'ওয়াকার, চাবিগুলো নিয়ে আসুন এদিকে,' ডাকল রানা। 'ব্যাগটা খুলুন।'

দ্রুত হাতে ব্যাগ খুলে ফেলল ওয়াকার। ব্যাগের ওপরের দিকে কাপড়চোপড়ে বোঝাই। ভেতরে হাত ঢুকিয়ে দিল ওয়াকার। ভুরু কোঁচকাল। ধীরে ধীরে বের করে আনল হাতটা। একটা টিন। মাংসের। একে একে তিনটে টিনই বের হলো ক্লেটনের ব্যাগ থেকে।

গম্ভীর মুখে ক্লেটনের দিকে তাকাল একবার রানা। চিন্তিত দেখাচ্ছে ওকে। তারপর ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ব্যাগের সমস্ত জিনিসপত্র ঢেলে ফেলুন। আর কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখি।'

কাপড়চোপড় এবং টুকিটাকি অন্যান্য সমস্ত জিনিসই বের করে ফেলা হলো ব্যাগ থেকে। আতঙ্কিত দৃষ্টিতে একটা জিনিসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ওয়াকার। পিস্তল। নিজের জিনিস দেখামাত্রই চিনল রানা। তার ছিনতাই হওয়া ওয়ালথার পি.পি.কে।

'কিছু বলার আছে তোমার, ক্লেটন?' মুষ্টিযোদ্ধার দিকে তাকিয়ে আছে রানা।

'মানে, এই মুহূর্তে রিক যদি তোমাকে গুলি করে মারে, কিছু বলার আছে?'

'আপনি ভুল করছেন, রানা,' হঠাৎই একটু বেশি শান্ত শোনাল ক্লেটনের গলা। 'আপনার কি মনে হয়? নিজেকে ধরিয়ে দেবার জন্যে ইচ্ছে করেই জিনিসগুলো নিজের ব্যাগে ভরেছি?'

'কি জন্যে ভরেছ না ভরেছ, সেটা তুমিই জানো,' বলল রানা। 'কিন্তু এভাবে জলজ্যান্ত প্রমাণ পাওয়ার পরে তোমাদের দু'জনকে আর ছেড়ে রাখা যায় না।' ওয়াকারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের হাত-পা বেঁধে ফেলুন।'

'আসলে আপনার ইচ্ছেটা কি, রানা?' জানতে চাইল ক্লেটন।

'আমার ইচ্ছে, এখন থেকে তুমি আর তোমার ম্যানেজার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় স্লেজে শুয়ে থাকবে। রিকের রাইফেলটার কথা ভুলো না।...সুসান, আপনি উঠে এসেছেন কেন আবার?'

'কাজটা ঠিক করছ তো, রানা?' ক্যানভাসের পর্দা সরিয়ে উঁকি দিয়েছেন সুসান। ক্লান্ত, উঠে আসার পরিশ্রমটুকুতেই হাঁপাচ্ছেন। 'ডেরেককে কিন্তু খুনী বলে মনে হয় না আমার!' স্পষ্ট অবিশ্বাস অভিনেত্রীর গলায়। তার মত আরও চার পাঁচজনের চেহারায়ও অবিশ্বাসের ছাপ। ক্লেটন খুনী, বিশ্বাস করতে পারছে না কেউই। মুষ্টিযোদ্ধার প্রতি কেমন একটা সহানুভূতি প্রকাশ পাচ্ছে তাদের হাবভাবে। বোঝা যাচ্ছে, ওই লোকগুলোর মাঝে ইতোমধ্যেই বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করে নিয়েছে মুষ্টিযোদ্ধা।

'কাকেই বা খুনী বলে মনে হয় এখানে?' প্রশ্ন রাখল রানা। 'আপনি আর কি অভিনয় শিখেছেন। এখানে আমাদের দুই বন্ধু তার চেয়ে অনেক বড় অভিনেতা।' বলে একটু থামল রানা। খুক করে একটু কাশল। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'আর মার্টিনকে সন্দেহ করতে পারছেন না তো? বেশ, তাহলে শুনুন...।' দু'জনকে খুনী সাব্যস্ত করার মত বেশ কিছু জোরাল পয়েন্ট বলে গেল রানা একে একে। এরপর আর কারও সন্দেহ করার কোন কারণ থাকল না। সবাই তীব্র ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকাল দুই খুনীর দিকে, সুসান ছাড়া। এখনও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না তিনি ব্যাপারটা।

দেরি হয়ে যাচ্ছে, ব্যাপারটার আপাতত এখানেই ইতি টানল রানা। তাড়াতাড়ি কিছু মুখে দিয়ে জলদি আবার রওনা হওয়া দরকার।

দুই ঘণ্টা পরে আরও অনেক নিচে নেমে এল ওরা। ঢাল সোজা হয়ে আসছে এখন ধীরে ধীরে। পাহাড়ী এলাকা শেষ হয়ে আসছে। এখান থেকে উপকূল বড়জোর আর শ'খানেক মাইল হবে। আপলাভনিকের সঙ্গে এবারে রেডিও যোগাযোগ সম্ভব হতে পারে হয়তো।

থামল রানা। কি ভেবে রেডিওর সরঞ্জাম নিয়ে এবারে আর দূরে সরে এল না। মনে করছিল সহজেই পেয়ে যাবে, কিন্তু আধ ঘণ্টা একটানা পরিশ্রম করেও কারও সাড়া পেল না। ব্যারি জানাল, এরকম হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আপলাভনিকে ছোট্ট রেডিও হাউস, একজন মাত্র রেডিওম্যান ডিউটিতে থাকে। সারাক্ষণ সতর্ক থাকা একজন লোকের পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া যে ওয়েভলেংথে কথা বলছে রানা, সেটা

জানা না-ও থাকতে পারে রেডিওম্যানের।

ঘড়ি দেখল রানা। চারটে বাজে। ব্রিউস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করল এবার। ওকে পাওয়া গেল সহজেই। কেবিনের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে কথা শুরু করল সে। ইচ্ছে করেই সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে কথা বলছে।

প্রথমেই জানাল রানা, অপরাধীদের সনাক্ত করা গেছে, ধরা পড়েছে ওরা। বলল বটে, কিন্তু নিজের কাছেই কেমন হাস্যকর ঠেকল ব্যাপারটা।

খুনীরা ধরা পড়েছে শুনে ব্রিউস্টারের কি প্রতিক্রিয়া হলো, দেখতে পেল না রানা। ক্যাপ্টেনের খুশি খুশি ভাবটা কণ্ঠস্বরেই বোঝা যাচ্ছে। কতটা এগিয়েছে ব্রিউস্টার, জিজ্ঞেস করতেই কিন্তু তার গলা থেকে খুশির ভাব চলে গেল। জানাল, এখনও প্রায় নিশ্চলই হয়ে রয়েছে ওরা। নগণ্য দূরত্ব অতিক্রম করেছে গত কয়েক ঘণ্টায়। না, বিমানে কি ছিল এখনও জানতে পারেনি। ট্রাইটন জাহাজে ইনসুলিন আছে। আপলাভনিকের দিকে আরও এগিয়ে এসেছে। বিমানবাহী জাহাজ, বিমান রয়েছে ওতে। এছাড়া সঙ্গের ছোট একটা বার্জে একটা ট্রাক্টরও আছে। বার্জটা এগিয়ে আছে ট্রাইটনের বেশ কিছুটা। আগামীকাল নাগাদ আপলাভনিকে পৌঁছে যাবে বার্জ, ট্রাক্টর নামিয়ে দেবে। সিত্রোঁর দিকে এগোবে ওই ট্রাক্টর। দুটো ছোট স্কিপ্লেন আর দুটো বম্বার গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই খুঁজছে সিত্রোঁটাকে, কিন্তু গিরিপথের ভেতরে থাকাতেই খুঁজে পায়নি বোধহয়। 'আমরা তেল পরিষ্কার করার জোর চেষ্টা চালাচ্ছি, কিন্তু সুবিধে করতে পারছি না...'

ব্রিউস্টারের শেষের কথাগুলো খেয়াল করল না রানা। অন্য একটা ব্যাপার ভাবছে। 'একটু ধরুন, ক্যাপ্টেন,' বলল সে। 'একটা জরুরী কথা মনে পড়েছে। আসছি...এক মিনিট...'

সোজা এসে ট্রাক্টরের কেবিনে ঢুকল রানা। ঘুমিয়ে আছে শরাফী। আস্তে করে তার কাঁধে ঠেলা দিল। অতি ধীরে চোখ মেলল শরাফী। বার দুই জোরে শ্বাস নিল, ছাড়ল। অ্যাসিটোনের কড়া মিষ্টি গন্ধে নাক কুঁচকাল রানা।

'মিস্টার শরাফী, তাড়াতাড়ি একটা কথার উত্তর দিন। গোপন করার চেষ্টা করবেন না। জরুরী ব্যাপার!'

রানার মুখের দিকে স্থির চোখে একমুহূর্ত চেয়ে রইল শরাফী। আস্তে করে বলল, 'বলুন।'

'কেমিস্ট্রি নিয়ে লেখাপড়া করেছেন আপনি নিশ্চয়?' শরাফীর চোখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করল রানা।

'কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

'বলছি। আগে আমার কথার জবাব দিন।'

'হ্যাঁ,' শুয়ে থেকেই মাথা নাড়ানোর চেষ্টা করল শরাফী। 'কেমিস্ট্রি, হায়ার মেথাম্যাটিকস এবং ফিজিক্স।'

'খনিজ তেল, ইঞ্জিনের জ্বালানি ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চয় জানেন আপনি?'

'নিশ্চয়। ওই সাবজেক্টগুলো নিয়ে রীতিমত গবেষণা করেছি আমি।' চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে শরাফীর। 'কিন্তু কেন এই প্রশ্ন, বলুন তো?'

'ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টারের ট্রাক্টরেরও ডায়াবেটিস হয়েছে,' হাসল রানা। শরাফীকে অবাক হয়ে মুখ খুলতে দেখে হাত তুলে থামাল। 'বুঝতে পারলেন না, পেট্রোল মিষ্টি হয়ে গেছে ওটার। কেবিনের তেলের ড্রামগুলোতে পঁচিশ-তিরিশ পাউন্ড চিনি ঢেলে দেয়া হয়েছে।'

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে শরাফীর কাছে খুলে বলল রানা।

চুপচাপ শুনল বৃদ্ধ। তারপর বলল, 'জলদি গিয়ে এখুনি ওই মারাত্মক কাণ্ডকারখানা বন্ধ করতে বলুন ক্যাপ্টেনকে। কি করছেন, বুঝতে পারছেন না উনি। কোন একটা ড্রামে যদি সামান্য ফুটোও হয়, আর পেট্রোল গরম করার সময় আগুনের সান্নিধ্যে আসে···সোজা আকাশে উড়ে যাবেন ক্যাপ্টেন আর তাঁর লোকজন। তাছাড়া ওভাবে কাজ করে কতটা তেল পরিষ্কার করতে পারবেন? এক ঘণ্টায় একটা সিগারেট-লাইটার ভরার মতও না।'

'ঠিকই বলেছেন। সেজন্যেই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করছি। আর কোন উপায় আছে?'

'আমাকে আরও আগেই জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল আপনার। আছে, সহজ উপায়।'

'কি?' সামনে ঝুঁকে এল রানা।

'পেট্রোল ধুয়ে নিতে হবে।'

'পেট্রোল ধুয়ে নেবে!' কিছুই মাথায় ঢুকছে না রানার। হাঁ করে তাকাল শরাফীর মুখের দিকে।

'হ্যাঁ। ড্রামগুলো কয় গ্যালনের, জিজ্ঞেস করেছেন?'

'দশ গ্যালনের। দেখেছি আমি।'

'তাহলে গিয়ে বলুন ওঁকে, দুই গ্যালন করে পেট্রোল অন্য খালি কোন পাত্রে সরিয়ে ফেলুক। আট গ্যালন পেট্রোল থাকবে প্রতিটি ড্রামে। এবারে দুই গ্যালন পানি মিশিয়ে নিতে হবে আট গ্যালনের সঙ্গে। ভাল করে নাড়তে হবে। মিনিট দশেক সময় দিলেই স্থির হয়ে যাবে চিনি-পানি মেশানো তেল। এরপর যেন বেশি নাড়া না খায়, ওপরের গ্যালন সাতেক তেল বের করে নিতে বলুন। একেবারে নির্ভেজাল হবে ওই তেল।'

'এত সহজ!' কণ্ঠের অবিশ্বাস চাপা দিতে পারল না রানা। শুনে ব্রিউস্টারের মুখটা কেমন হবে, কল্পনা করে নিতে পারল সহজেই। এক ঘণ্টায় এক চায়ের কাপ তেলও ছাঁকতে পারেনি বেচারা, তা-ও কত কষ্টে। 'ঠিক বলছেন তো, মিস্টার শরাফী?'

'আট গ্যালনই নিতে পারেন ক্যাপ্টেন, কিন্তু উচিত হবে না। ওই সাত গ্যালনই নিতে বলুনগে,' শান্ত কণ্ঠে বলল শরাফী। থামল। কথা বলার এই সামান্য পরিশ্রমেই হাঁপাচ্ছে। ক্ষীণ হয়ে এসেছে স্বর। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'এটা তো নিশ্চয় জানেন, চিনি পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু পেট্রোলে নয়। আর এমনিতেই পেট্রোলের চেয়ে পানি ভারী, তার ওপর চিনি মিশে গেলে আরও ভারী হয়ে যাবে। কাজেই পেট্রোলের ড্রামের তলায়ই পড়ে থাকবে দুই গ্যালন পানি।'

'বিশ্বাস করুন, প্রফেসর,' শেষের শব্দটা উত্তেজনার কারণে মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রানার, 'আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনাকে এখুনি পি. এইচ. ডি. দিয়ে ফেলতাম। আর কোন পরামর্শ আছে এ ব্যাপারে?'

'আছে,' ক্ষীণ হাসি ফুটল শরাফীর মুখে। 'পানি যোগাড় করা সহজ হবে না ব্রিউস্টারের পক্ষে। বরফ গলিয়ে পানি করে নেয়া···সে অনেক ঝামেলার ব্যাপার। এক কাজ করতে বলুন, আমরা এখন যেখানে রয়েছি, এখানে আসার মত পরিষ্কার পেট্রোল বের করে নিতে বলুন···'

'তারপর?'

'তারপর আর কি? দ্রুত এখানে পৌঁছে যেতে পারবেন উনি। এখানে ড্রামে কিছু পেট্রোল ফেলে রেখে যান ওঁর জন্যে। আমাদের সঙ্গে স্লেজে তো প্রচুর পেট্রোল রয়েছে, না? কাল রাতেই তো শুনলাম, বাইরে ব্যারির সঙ্গে আলোচনা করলেন, বোঝা ভারী হয়ে যাচ্ছে, পেট্রোল ঢেলে ফেলে বোঝা কমিয়ে নিতে···।'

হাসল রানা। সত্যিই, অসাধারণ প্রতিভাশালী একটা ব্রেনকে চিনতে পারল না ব্রিটিশরা, ভাবল সে, শুধু পি. এইচ. ডি. ডিগ্রী নেই বলে এমন অবহেলা···

আর দেরি না করে উঠে পড়ল রানা। ব্রিউস্টারকে এক মিনিট সময় দিয়ে এসেছে। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেছে এদিকে। খুশির খবরটা শোনাতে লাফিয়ে নেমে এল কেবিন থেকে।

পাঁচ

পুরো সন্ধ্যা আর সারাটা রাত একটানা গাড়ি চালাল পালা করে ব্যারি, ওয়াকার আর রানা। গোলমাল বাড়ছে ইঞ্জিনে, একজস্ট পাইপে অদ্ভুত শব্দ উঠছে, কাজ করতে চাইছে না সেকেন্ড গিয়ার···কিন্তু তবু থামতে ভরসা পেল না রানা। গতিই এখন জীবন ওদের।

রাত নটার পর জ্ঞান হারালেন শরাফী। এটা এক ধরনের আচ্ছন্নতা,বহুমূত্র রোগীর জন্যে মারাত্মক। সময় ঘনিয়ে আসছে তাঁর। যতটা সম্ভব করছে রানা আর অন্য সবাই, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেসব কিছুই না। এই মুহূর্তে শরাফীর দরকার গরম আরামদায়ক বিছানা, উত্তাপ, গরম পানীয়, উপযুক্ত খাদ্য আর ইনসুলিন। এর কোনটাই দেয়া যাচ্ছে না তাঁকে। বরফ গলানো পানি গিলতেই পারছেন না। কাঠের তাকের বিছানায় গোটাকয়েক কম্বল জড়িয়ে পড়ে থাকাকে বিছানায় শোয়া বলা যায় না কিছুতেই। আর ইনসুলিন তো এখানে স্বপ্ন। ইতোমধ্যেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেছে তাঁর। ইনসুলিন ছাড়া আগামী আর আটচল্লিশ ঘণ্টা টিকে থাকবেন কিনা সন্দেহ। আবহাওয়া যদি আরও খারাপ হয়, শীত বেড়ে যায়, আরও আগেই মারা যাবেন বৃদ্ধ।

সুসান গিলবার্টেরও খুবই খারাপ অবস্থা, আরও অবনতির দিকে যাচ্ছে ক্রমশ।

জোর করে গলা দিয়ে দুয়েক টুকরো মাংস নামাতেই খুব কষ্ট হচ্ছে তাঁর, ঘুমোবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হচ্ছেন। এককালের অসামান্য প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা অভিনেত্রীর মধ্যে কিচ্ছু অবশিষ্ট নেই আর এখন। সাংঘাতিক ঠাণ্ডা প্রতিহত করার মত শক্তি আর নেই শরীরে। মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। শ্রান্ত, ক্লান্ত, অবসন্ন মুখের দিকে তাকালে করুণাই জাগে মনে।

রোগীদের এই অবস্থা, তার ওপর রানার মন আরও খারাপ করে দিল ব্যারি। উদ্বিগ্নভাবে ঘন ঘন তাপমান যন্ত্রের দিকে তাকাচ্ছে সে। তাপমাত্রা বাড়ছে ধীরে ধীরে, একটানা। খুশির খবর নয় এটা। গ্রীনল্যান্ডে এভাবে উত্তাপ বেড়ে যাওয়ার মানেটা অন্যরকম। গত দু'দিন বাতাস বন্ধ ছিল, এখন আস্তে আস্তে বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হু হু বিলাপধ্বনি শুরু করে দিল একেবারে। আকাশে গত কয়েক ঘণ্টা ধরেই একটু একটু মেঘ জমতে শুরু করেছিল, ঘন কালো হয়ে এসেছে এখন।

রাত বারোটার পর বাতাসের গতিবেগ পনেরো মাইল ছাড়িয়ে গেল। ইতোমধ্যেই বরফের কুচি উড়াতে শুরু করে দিয়েছে।

ব্যারির শঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ জানে রানা। গ্রীনল্যান্ডের ভয়ঙ্কর ক্যাটাব্যাটিক উইন্ড আর আলাস্কার উলিউয়াওজের নাম শুনেছে সে। বরফ পাহাড়ের উপত্যকায় যখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়ে, বাতাস ভারী হতে শুরু করে ধীরে ধীরে। ওপরের অপেক্ষাকৃত গরম বাতাসও ভারী হয়ে নিচে নেমে আসতে থাকে। শূন্য জায়গাটুকু পূরণ করে নেয় তারও ওপরের গরম হাওয়া। প্রক্রিয়াটা চলতে থাকে দীর্ঘক্ষণ ধরে—গত আটচল্লিশ ঘণ্টায় তাই হয়ে চলেছে। নিচে জমতে জমতে ক্রমে ফুলে ফেঁপে ওঠে বাতাস, চাপ বাড়তে থাকে, ছড়াতে থাকে। এক সময় আর জায়গা হয় না উপত্যকায়, ঠাণ্ডা বাতাস ঢাল বেয়ে দ্রুত গড়াতে শুরু করে নিচের দিকে। বাঁধ ভাঙা বন্যার মত। ঢালের নিচেও ঠাণ্ডা বাতাস রয়েছে। ওপরের বাতাস গড়িয়ে নেমে গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারে তলার বাতাসকে, চাপ বাড়ে অস্বাভাবিক রকম। এই সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয় হারিকেনের মত ভয়ঙ্কর এক জাতের বরফঝড়। যেমন প্রচণ্ড শক্তি তেমনি তার ধ্বংসক্ষমতা।

এই ঝড়ের সঙ্কেতই ফুটে উঠেছে এখন চারদিকে। তাপমাত্রার অস্থিরতা, ধীরে বাড়তে থাকা বাতাসের বেগ, অদ্ভুত কালো মেঘে ঢেকে যাওয়া আকাশ, উড়তে থাকা বরফের কুচি···না, কোন সন্দেহ নেই, ওই ঝড়ই আসছে, ঘোষণা করল ব্যারি। তার নীল এস্কিমো চোখে আতঙ্কের আভাস দেখে স্বভাবতই ঘাবড়ে গেল রানা।

গতি যতটা সম্ভব বাড়িয়ে দেয়া হলো ট্রাক্টরের। নিম্নমুখী ঢালু পথে গতিবেগ বেড়েছে ট্রাক্টরের। এখান থেকে মাইল ষাটেক দক্ষিণ-পশ্চিমে আপলাভনিক, আর বেশি দূর নেই। কিন্তু ভোর চারটে নাগাদ দেখা দিল আরেক বিপদ।

স্যাসতুগি—তুষারের বুকে আঁকাবাঁকা ছোটবড় ঢেউ, সিত্রোঁর মত পুরানো বাতিল ট্রাক্টরের যম। প্রচণ্ড ওই ঝড়ো বাতাসে সৃষ্টি হয় এই বিচিত্র তুষারতরঙ্গ। মারাত্মক পিচ্ছিল। তার ওপর ঢালু পথ। ঝড়ো বাতাস তো আঘাত হানছেই।

এখানে এসে হামাগুড়ি দিয়ে যেন এগিয়ে চলল ট্রাক্টর আর স্লেজ দুটো। কিন্তু তবু রেহাই পেল না। ভয়ঙ্কর ঢেউ ওঠা সাগরে খুদে নৌকার যেরকম উথালপাতাল অবস্থা হয়. ঠিক তেমনি ভাবেই নাচছে তিনটে যান। অদ্ভুত এক কাণ্ড। এই মাত্র কালো আকাশের দিকে তীব্র আলো ছুঁড়ে মারছে সিত্রোঁর হেডলাইট দুটো, পরক্ষণেই নিচু হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে উজ্জ্বল শুভ্র ঢেউ খেলানো তুষারের বুকে। মৃত্যুর ভয় না থাকলে সত্যিই উপভোগ করার মত দৃশ্য।

সকাল আটটা নাগাদ ট্রাক্টর থামাল ব্যারি। হামাগুড়ি দিতে দিতে এসে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যেন সিত্রোঁটা। ইঞ্জিনের বিকট একঘেয়ে বিরক্তিকর শব্দের কবল থেকে রেহাই পেল বটে অভিযাত্রীদের কান, কিন্তু খানিক বিশ্রাম নিতে না নিতেই কানের পর্দায় দ্বিগুণ গতিতে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্য একটা আরও জোরাল শব্দ। বাতাসের গর্জন। সেই সঙ্গে বাইরে যারা ছিল তাদের মুখেচোখে পাথরের কুচির মত এসে আঘাত হানল উড়ন্ত বরফকণা। আচমকা বেড়ে গেছে বাতাসের গতি।

বাতাসের গতির সঙ্গে আড়াআড়িভাবে থামিয়েছে ব্যারি। এতে সরাসরি ক্যানভাসের পর্দা উল্টে কেবিনে ঢুকতে পারছে না বাতাস। আরও একটু নিরাপত্তার ব্যবস্থা করল রানা আর ব্যারি। কেবিনের ছাদের পেছনে ফ্রেমের দুই দিকের কোণের সঙ্গে একটা বড় ক্যানভাসের এক প্রান্তের দুটো কোণ শক্ত করে আটকাল। অন্য প্রান্তটা টানটান ভাবে ক্রমশ ঢালু করে পেছনে স্লেজের ওপর দিয়ে এনে বরফে গজাল পুঁতে আটকে দিল। তাঁবুর একটা ধারের মত দেখতে হলো জিনিসটা, কিংবা দোচালা ঘরের একপাশের চালের মত। কাজে লাগবে এই আচ্ছাদন। সবাইকে কেবিনে ঢুকতে হবে না আর খাওয়ার জন্যে, এবং এখানে বসেই ব্রিউস্টারের সঙ্গে রেডিওতে কথা বলতে পারবে রানা। আর ক্লেটন এবং মার্টিনও মাথার ওপরে আচ্ছাদন পেয়ে দুর্দশা থেকে কিছুটা রেহাই পাবে। তাপমাত্রা এখন তেমন কম নয়, শূন্যের মাত্র কয়েক ডিগ্রী নিচে,গায়ে গরম পোশাকও রয়েছে দু'জনের, কিন্তু বরফকুচির আঘাত বড় কষ্টকর। অহেতুক কষ্ট পাচ্ছে দুটো লোক, জানে রানা, কিন্তু করার কিছু নেই তার আপাতত। আসলে ঝুঁকিটা বেশিই নিয়ে ফেলেছে রানা, কিন্তু নানারকম বিপদ আর উত্তেজনায় সেই পরিমাণ হুঁশিয়ার থাকতে পারল না। আর এতেই ঘটল চরম বিপত্তি।

ট্রাক্টর থামলে নাস্তা সেরে নেবে ভেবেছে রানা, কিন্তু খাওয়ার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই। গত তিন রাত ধরে ঘুমোতে পারছে না, মনে হচ্ছে ঘুম কাকে বলে ভুলে গেছে সে। একটা ঘোরের ভেতর দিয়েই যেন কেটেছে এতটা সময়। শারীরিক আর মানসিক অবসাদে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার ক্ষমতাও যেন লোপ পেতে বসেছে। কফির মগটা হাতে নিয়েই ঢুলছে। বার দুই টলে পড়তে পড়তেও অদম্য মানসিক শক্তির জোরে সামলে নিল নিজেকে। ছলকে পড়ে গেছে অনেকটা কফি। অবশিষ্ট তরল পদার্থটুকু গলায় ঢেলে ব্রিউস্টারের সঙ্গে কথা বলতে উঠে দাঁড়াল। আপলাভনিকের সঙ্গেও যোগাযোগের চেষ্টা করে দেখতে হবে আবার।

প্রথমে ব্রিউস্টারকে ডাকল রানা। লাইন পেয়ে গেল সহজেই। ক্যাপ্টেন জানাল, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে ওপাশ থেকে। জোরে চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে

রানাকে। সে কিন্তু ব্রিউস্টারের গলা পরিষ্কারই শুনতে পাচ্ছে। কেবিনের সবাই এবং স্লেজে বসে মার্টিন ও ক্লেটন শুনতে পাচ্ছে দু'জনের কথাবার্তা।

একে একে কেবিন থেকে পুরুষযাত্রীরা সবাই বেরিয়ে এসে রানার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়াল, শরাফী ছাড়া। মাত্র সাত-আট ফুট দূরে বসে কান খাড়া করে রানা আর ব্রিউস্টারের কথা শুনছে ক্লেটন আর মার্টিন।

একটা ক্যানভাস-চেয়ারে বসে কথা বলছে রানা। কেবিনের প্রান্তে ক্যানভাসের পর্দার এপাশে পা ঝুলিয়ে বসল ওয়াকার আর সিনেটর। রানার পেছনে জেনারেটরের প্যাডেল ঘোরাচ্ছে ব্যারি। কাঁধে ঝুলছে লী-এনফিল্ড।

কি ভেবে ব্যারির কাছে এগিয়ে গেল রেভারেন্ড। 'দেখুন, মিস্টার ব্যারি, আপনি একটুও রেস্ট নিতে পারেননি গত বিকেল থেকে। মচকানো হাত। আমি তো শুধু বসে বসে খাবার নষ্ট করছি। প্যাডেল ঘোরানোর কাজটা আমাকে দিন। একটু কাজ করলে গা-টাও গরম হবে আমার, আপনিও কিছুক্ষণের জন্যে রেহাই পাবেন।'

'ঠিক আছে, নিন,' জেনারেটরের সাইকেল-সীট থেকে নেমে এল ব্যারি। রানার কয়েক ফুট দূরে স্লেজের দিকে মুখ করে বসে পড়ল।

চেঁচিয়ে কথা বলছে রানা, '...হ্যাঁ, হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি।...কতদূর এগোলেন?'

'...মিস্টার শরাফীকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন...ওফ্, দারুণ ব্যাপার, মিস্টার রানা!...পেট্রোলে পানি ঢেলে চিনি পরিষ্কার করা...ইস্, আরও আগেই যদি জানতাম!... হ্যাঁ, বেশ দ্রুত এগোচ্ছি আমরা!...আশা করছি, বিকেল নাগাদ ভিন্ডেভি গিরিপথ পেরিয়ে যাব।'

কপাল খুলছে ধীরে ধীরে। সন্ধে নাগাদ ওদের ধরে ফেলবে স্নো-ফ্যালকন। আধুনিক ট্রাক্টরের আরামদায়ক কেবিন আর ভাল খাবারের চিন্তায় খুশি হয়ে উঠল সবার মন। রানা জিজ্ঞেস করল, 'আর কি খবর?'

'খবর আছে। ভয়ঙ্কর জিনিস সঙ্গে যাচ্ছে আপনাদের। এর দাম নাকি লক্ষ লক্ষ পাউন্ড। আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স সব দেশের সরকারই চাইছে জিনিসটা। প্রথম দিকে ব্রিটিশ সরকার তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কিন্তু এখন ট্রাইটনের পাগল হয়ে ছুটে আসার খবর জেনে বুঝতে পারছি, টনক নড়েছে আমাদের সরকারেরও।'

'কি?' চেঁচিয়ে উঠল রানা। 'কি রয়েছে আমাদের সঙ্গে? জলদি বলুন!'

'কি জিনিস? অতি উন্নত মানের একটা গাইডেড অ্যাটমিক মিসাইলের ফরমুলা! জিনিসটা আছে রবার্ট ব্রিমন নামে অসাধারণ প্রতিভাশালী বিজ্ঞানীর কাছে। অন্যান্য দেশগুলোর পাগলের মত ছুটে আসা দেখে টনক নড়েছে এখন ব্রিটেনের...' থামল ব্রিউস্টার। দম নিচ্ছে। আবার ভেসে এল ওর গলা, 'স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে নির্দেশ এসেছে, যেমন করেই হোক যেন ফরমুলাটা উদ্ধার করি আমি। অন্য কোন দেশের কারও হাতে যেন জিনিসটা না পড়ে। আপনাদের সঙ্গেই রয়েছেন বিজ্ঞানী রবার্ট ব্রিমন ছদ্ম পরিচয়ে। তাঁর কাছেই রয়েছে ফরমুলাটা। এটা অবশ্য অনুমান, ইতিমধ্যেই অন্য কারও হাতে পড়ে গিয়ে থাকতে পারে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরবতা। চুপচাপ কান খাড়া করে বসে আছে সবাই, এরপর ব্রিউস্টার কি বলে শোনার জন্যে আগ্রহী।

'অন্য কেউ মানে?' জানতে চাইল রানা।

'দু'জন খুনী রয়েছে আপনাদের সঙ্গে, জানেনই তো।'

'জানি। কে কে, তা-ও জানি। আমার অনুমান, কে জি বি...'

'ঠিকই অনুমান করেছেন। চেহারার বর্ণনা দিচ্ছি, আপনার অনুমানের সঙ্গে মিলিয়ে নিন। হ্যাঁ, আগে ওদের আসল নাম বলে নিই: একজন হচ্ছে মিখাইল গার্নেভ...'

ব্রিউস্টারের কথা শেষ হবার আগেই ঘটল ঘটনাটা। হাত পা বাঁধা অবস্থায়ই লাফিয়ে উঠে পড়ল ক্লেটন। ওর দিকেই তাকিয়ে বসে ছিল ব্যারি, একটু অসাবধানেই ছিল, রেডিওর কথা শুনছিল সে মনোযোগ দিয়ে। এত আচমকা পরিস্থিতি এমন দাঁড়াবে ভাবেনি রানাও, প্রস্তুত ছিল না, কে আসল খুনী আগে থেকেই জানা থাকা সত্ত্বেও। ফলে ঘটে গেল অঘটন। যে প্ল্যান করে ক্লেটন আর মার্টিনকে বেঁধে রাখা হয়েছিল, ভেস্তে গেল সব।

ক্লেটন লাফিয়ে উঠতেই কোলের ওপর ফেলে রাখা রাইফেলের দিকে ছোঁ মারল ব্যারি। তার দোষ নেই, একটা হাত মচকানো। অন্য হাতে রাইফেল তুলে নিয়ে নিশানা করতে দেরি হয়ে গেল একটু। কিন্তু তার আগেই এসে গেল ক্লেটন।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। কিন্তু তার আগেই জোড়া পায়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে লাফিয়ে লাফিয়ে ট্রাক্টরের কেবিনের কাছে পৌঁছে গেছে ক্লেটন। ব্যারি আর ক্লেটনের মাঝখানে পড়ে গেছে রানা, ফলে গুলি করতে পারল না এস্কিমো।

পাগলের মত পকেট থেকে কি যেন বের করার চেষ্টা করছে ওয়াকার, কিন্তু পারছে না। আটকে গেছে মনে হয়। ঝাঁপিয়ে পড়ল ক্লেটন ওর ওপর। ওয়াকারও নেহাত দুর্বল নয়। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি দেহটার ওজন কমপক্ষে দুশো পাউন্ড। কিন্তু মুষ্টিযোদ্ধার বিশাল দেহের প্রচণ্ড ধাক্কায় তাল সামলাতে পারল না, ছিটকে পড়ে গেল একপাশে। হাত-পা বাঁধা অবস্থায়ই হাঁটু মুড়ে তার পেটের ওপর ঝপাং করে পড়ল ক্লেটন। উঁক্ করে একটা উদ্ভট শব্দ বেরিয়ে এল ওয়াকারের মুখ থেকে। এতগুলো কাণ্ড ঘটে গেল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই।

ঠিক এই সময় ঘাড়ে শীতল স্পর্শ পেল রানা। 'নড়বেন না, মিস্টার রানা!' নীরব, কঠিন, হিমশীতল একটা গলা। রেভারেন্ড নিউবোল্ডের বলে মনেই হয় না। 'একচুল নড়বেন না, সাবধান! ব্যারি, রাইফেলটা ফেলে দিন—এক্ষুণি! কেউ নড়লেই গুলি খাবেন মাসুদ রানা, কাজেই...।' কথাটা শেষ করল না রেভারেন্ড।

স্থির দাঁড়িয়ে রইল রানা। লোকটার কণ্ঠস্বরেই ওর মনের ভাব পরিষ্কার, গুলি করার ছুতো খুঁজছে। ভাবছে রানা, ও-ই কি গার্নেভ নাকি?

'নিখারেভ, উঠে এসো,' ডাকল ছদ্মবেশী গার্নেভ।

গায়ের ওপর থেকে ক্লেটনকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল ওয়াকার ওরফে নিখারেভ। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। পিস্তল বের করে নিল পকেট থেকে। 'হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এভাবে লাফাতে পারে কেউ, কল্পনাও করিনি। নইলে...।'

'বকর বকর বাদ দিয়ে কেবিন থেকে সবাইকে নেমে আসতে বলো,' শান্ত কণ্ঠে আদেশ দিল রেভারেন্ড। ও-ই নেতা, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না।

ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে ধরল নিখারেভ। ভেতরের সবাইকে পিস্তল দেখিয়ে আদেশ দিল, 'নেমে আসুন সবাই, জলদি!'

'রবার্ট ব্রিমন নামতে পারবেন না,' শান্ত কণ্ঠে প্রতিবাদ করল রানা। 'উনি অসুস্থ। অজ্ঞান…'

'চু-উ-প!' ধমকে উঠল নিখারেভ। 'যথেষ্ট খেল্ দেখিয়েছ তুমি, রানা! চালাক লোকই বলতে হবে তোমাকে। কিন্তু এবারে তোমার খেল্ খতম!' ক্লেটনকে আদেশ দিল, 'ভেতরে ঢুকে কোলে করে বের করে আনো ওকে।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করল আবার রানা। 'একচুল নড়ানো যাবে না ওঁকে…' কথাটা শেষ করতে পারল না। এর আগের বার কানের ওপর যেখানে খেয়েছিল, ঠিক সেই একই জায়গায় বাড়ি খেল আবার, তবে আগের চেয়ে আস্তে। ঘুরে উঠল মাথা। হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে কোনমতে সামলে নিল রানা নিজেকে।

'নিখারেভ একটু আগে চুপ করতে বলেছিল আপনাকে,' নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল নকল রেভারেন্ড। 'আদেশ মানতে শিখুন।'

দাঁতে দাঁত কামড়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল রানা। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল ব্যাটাকে খুন করার আগে তার কানের ওপরও পিস্তলের দুটো বাড়ি মেরে নেবে।

একে একে কেবিন থেকে নেমে এল মেয়েরা। মুস্তাফা শরাফী ওরফে রবার্ট ব্রিমনকে কোলে করে নামিয়ে আনল ক্লেটন। ক্লেটন আর মার্টিনের হাত-পায়ের বাঁধন আগেই খুলে দিয়েছে শ্যারিন, নিখারেভের নির্দেশে।

রানাকে বলল গার্নেভ, 'আপনার কথা বলা শেষ হয়নি এখনও। ব্রিউস্টার হয়তো চিন্তায় পড়ে গেছে।' আস্তে করে পিস্তলের নল দিয়ে রানার ঘাড়ে খোঁচা মারল, 'আপনার জন্যে না হলেও আপনার এই বন্ধুদের দিকে চেয়ে, কোন বেফাঁস কথা বলে ফেলবেন না। অল্প কথায় সারুন।'

অল্প কথায়ই শেষ করল রানা। কথাবার্তায় হঠাৎ বাধা আসার কারণ জানাল, আচমকা 'শরাফী'র অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় উঠে দেখতে গিয়েছিল। মিসাইলের ওপর আর বেশি জোর দিল না রানা, বারবার বলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরাফীকে আপলাভনিকে নিয়ে যেতে হবে। ওর অবস্থা আরও অনেক বেশি খারাপ হয়ে পড়েছে। কোনভাবে যদি ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে ব্রিউস্টার…

'জলদি শেষ করুন,' কানের কাছে ফিসফিসিয়ে বলল গার্নেভ।

'আপাতত রাখি, ক্যাপ্টেন। দুপুরে কথা বলব আবার। মে-ডে, মে-ডে।'

সুইচ অফ করে দিল রানা। চেহারা ভাবলেশশূন্য রাখার চেষ্টা করল।

পিস্তলের নলটা রানার কানের ছিদ্রে ঢোকাবার চেষ্টা করল এবার গার্নেভ। 'মে-ডে মানে কি, মিস্টার রানা? আমি তো জানি, কোন বিমান বিপদে পড়লে ওই সঙ্কেত জানায়। কিন্তু এখানে তো কোন বিমান বিপদে পড়েনি!'

'ওটা আসলে রেডিওতে কথা শেষ করার সঙ্কেত। আই. জি. ওয়াই এই সঙ্কেতই ব্যবহার করে।'

'কিন্তু আপনাদের সঙ্কেত জি. এফ. কে।'

'আমাদের শুরু করার সঙ্কেত জি. এফ. কে। শেষ করার সঙ্কেত মে-ডে।'

প্রচণ্ড জোরে শিরদাঁড়ার মাঝামাঝি পিস্তলের খোঁচা খেলো আবার রানা। তীব্র ব্যথা মেরুদণ্ড বেয়ে দ্রুত উঠে এল ওপরের দিকে, বিস্ফোরণ ঘটল যেন মগজে। পেশাদার খুনী, ব্যথা দিতে জানে।

'মিছে কথা বলছ,' কঠিন গলায় বলল গার্নেভ। কণ্ঠস্বরেই লোকটার নৃশংস স্বভাব আঁচ করতে পারছে রানা।

'কি করে বুঝলে মিছে কথা?' কর্কশ গলায় পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'এভাবে হবে না, মিখাইল,' কথা বলে উঠল নিখারেভ। 'দেখছ না, বড় শক্ত চীজ। ওর পেট থেকে কথা বের করতে পারবে না। পেছনে রয়েছ তো, দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু আমি দেখছি ওর চোখ। সামান্যতম সুযোগ দিলেই ঘাড় মটকে দেবে ও তোমার। দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি⋯,' এক পা এগিয়ে শ্যারিনের পেছনে এসে দাঁড়াল নিখারেভ। পিস্তলের নল চেপে ধরল স্টুয়ার্ডেসের পিঠে, ঠিক হৃৎপিণ্ড বরাবর। আহত জায়গায় চাপ লাগতেই ব্যথায় ককিয়ে উঠল মেয়েটা।

'রানা,' বলল নিখারেভ। 'আমি পাঁচ গোণার আগেই যদি না বলো, গুলি খাবে শ্যারিন⋯'

'না না, মিস্টার রানা, বলবেন না, প্লীজ⋯' পিঠে আবার খোঁচা খেয়ে থেমে গেল শ্যারিন। ককিয়ে উঠল আবার।

'এক⋯দুই⋯' শান্তভাবে গুনতে শুরু করল নিখারেভ। '⋯ তিন⋯'

'বিমানের মতই আই.জি. ওয়াই দলের বিপদ সঙ্কেতও মে-ডে,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'শ্যারিনের পিঠ থেকে পিস্তল সরাও, নিখারেভ। নইলে তোমার কব্জি ভেঙে দেব⋯'

হা হা করে হাসল নিখারেভ। একটা কুৎসিত ইঙ্গিত করে বলল, 'মনে ধরে গেছে, না?'

'তোমাকে শুয়োরের বাচ্চা বলতে চাই না, কারণ তার চেয়েও তুমি অধম⋯'

পিস্তল তুলতে গেল নিখারেভ, কিন্তু তার আগেই বাঁ হাত তুলে তাকে থামাল গার্নেভ। 'ভদ্রলোকের মুখ খারাপ করা উচিত না, রানা।' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'তবে তুমি সাহসী মানুষ। আর সাহসকে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধা করি আমি।⋯কিন্তু ঝুঁকি একটু বেশিই নিয়ে ফেলছ। মানে, আমরা তোমাকে খুন করতে পারি, কথাটা ভুলে যাচ্ছ।'

'কিন্তু তাতে কোন লাভ হবে না তোমাদের, গার্নেভ, শেষ রক্ষা করতে পারবে না,' শান্ত রানা। 'একগাদা প্লেন আর জাহাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। মানুষ খুনের অপরাধে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে তোমাদের। কেউ বাঁচাতে পারবে না।'

'দেখাই যাক তাহলে। এক সারিতে দাঁড়ান আপনারা সবাই। নিখারেভ, ওদের সাহায্য করো।'

মেয়ে-পুরুষ সবাইকে এক সারিতে দাঁড় করানো হলো। রানাও রয়েছে সারিতে। তার পেছন থেকে সরে এসেছে গার্নেভ। পিস্তল হাতে ও আর নিখারেভ এখন সারিটার কয়েক ফুট তফাতে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

মনে মনে দূরত্বটা মেপে নিল রানা। না, লাভ নেই। এক লাফে অতটা দূরত্ব

পেরিয়ে যেতে পারবে না। তাছাড়া, দু'জন লোক, দুটো পিস্তল।

'এটার আর দরকার নেই। উফ্, কি যে বিরক্তি লেগেছে এই ক'দিন!' বলতে বলতে চোখ থেকে রিমলেস চশমাটা খুলে ফেলে দিল গার্নেভ। ঘোলা কাঁচের মত চোখের রঙ, নিষ্প্রাণ। নিখারেভকে বলল, 'বাক্সটা আনো তো এবারে। আর হ্যাঁ, ড্রাইভিং কম্পার্টমেন্ট থেকে ম্যাপটাও নিয়ে এসো।'

নিখারেভ চলে গেল।

আরও এক পা পিছিয়ে আরও একটু নিরাপদ দূরত্বে সরে গেল গার্নেভ। দারুণ হুঁশিয়ার লোক।

'কেন, গার্নেভ?' জানতে চাইল রানা। 'ম্যাপ দিয়ে কি হবে?'

'একটু পরেই জানতে পারবে,' কাটা জবাব গার্নেভের। 'বেশি কথা বললে অন্যমনস্ক হয়ে যায় লোকে।'

ম্যাপ নিয়ে ফিরে এল নিখারেভ। স্লেজে গিয়ে উঠল। নিজের ব্যাগটা বের করে খুলল। চামড়ার খাপে মোড়া একটা জিনিস বের করল ওটা থেকে। জিনিসটা রানা চেনে। রেডিও। নিখারেভ বলেছিল নষ্ট হয়ে গেছে ওটা।

রেডিওর ওপরের চামড়ার খাপটা সরিয়ে দিল নিখারেভ। একটা বিশেষ জায়গায় চাপ দিতেই রেডিওর প্লাস্টিক-বক্সের ওপরের অংশটা ঢাকনার মত খুলে গেল। ঢাকনার নিচ থেকে টেনে টেনে দুটো পাতলা লম্বা ফিতে বের করল। ছুঁড়ে ফেলল বরফের ওপর। বুঝল রানা, এক ধরনের আর্থিং ও দুটো।

নিখারেভের কাজ দেখছে সবাই চুপচাপ। টান মেরে রেডিওর ভেতর থেকে একটা স্টিক এরিয়াল বের করল নিখারেভ। চোখ পড়ল রানার ওপর। হাসল, 'পিস্তল দুটো কোথায় রেখেছিলাম, বুঝতে পারছ তো এখন? এই বাক্সটা একসঙ্গে কয়েকটা কাজ দেয়।' বলতে বলতে বাক্সের ভেতর থেকেই হেডফোন বের করে কানে লাগাল নিখারেভ। একটা নব টিপে ডায়াল ঘোরাতেই খড় খড় আওয়াজ করে উঠল রেডিও। আরেকটা নব টিপতেই আওয়াজটা বন্ধ হয়ে গেল। হেডফোনে আওয়াজ শুনছে এখন। কয়েক সেকেন্ড কি শুনল, তারপর খুশি হয়ে বন্ধ করে দিল রেডিও। 'শোনা যাচ্ছে, তবে অপরিষ্কার। ট্রাক্টর আর স্লেজের ধাতুর জন্যেই এমন হচ্ছে।'

যন্ত্রটা নিয়ে স্লেজ থেকে নেমে গেল নিখারেভ। পকেট থেকে টর্চ বের করে গার্নেভের দিকে তাকাল, 'দুই মিনিট। আসছি।' বলে ছাউনির নিচ থেকে বেরিয়ে গেল সে। পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে থামল।

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল নিখারেভ। মুখে হাসি। গার্নেভের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওদের পেয়েছি। পারফেক্ট সিগন্যাল। বেয়ারিং টু সিক্স এইট।'

'গুড,' খুশির কোন লক্ষণ নেই গার্নেভের চেহারা কিংবা কণ্ঠস্বরে।

ওদের পেয়েছে? কারা ওরা?—ভাবছে রানা। নিশ্চয় কোন রাশান জাহাজ, ওটার সঙ্গেই যোগাযোগ করে এসেছে নিখারেভ। জিজ্ঞেস করল রানা, 'কারা ওরা, গার্নেভ?'

'আমাদের বন্ধু, এটা না বোঝার মত বোকা নও তুমি।'

'তোমাদের বন্ধুরা নিশ্চয় জাহাজ নিয়ে এসেছে,' কথা আদায়ের চেষ্টা করছে রানা, 'কিন্তু ভুল করছে ওরা। ভীমরুলের চাকে খোঁচা মেরেছ তোমরা। ডেভিস প্রণালী আর গ্রীনল্যান্ডের উপকূল জাহাজে প্লেনে ভরে গেছে এখন। ক্যারিয়ার শিপ ট্রাইটন থেকে সারাক্ষণ প্লেন উড়ছে আকাশে, চক্কর মারছে। জাহাজ কিংবা মাছ ধরা ট্রলার তো দূরের কথা, একটা ছোট্ট নৌকাও ওদের চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'পানির তলা দিয়েও আজকাল জাহাজ চলতে পারে, রানা,' বলে উঠল নিখারেভ। 'সাবমেরিনের নাম শুনেছ তো? ওই জিনিস একটা ঘোরাঘুরি করছে...'

'সাবমেরিনের সম্ভাবনাটা নিশ্চয় জানা আছে ব্রিটিশ আর আমেরিকান শিপ ক্যাপ্টেনদের। ডেভিস প্রণালীতে সাবমেরিন ধরা ফাঁদ পেতে রাখবে ওরা। কয়েকটা ডেস্ট্রয়ারকে ফাঁকি দিতে পারবে না তোমাদের সাবমেরিন।'

'বাজে কথা বলার সময় নেই,' কঠিন শোনাল গার্নেভের কণ্ঠ। নিখারেভের দিকে তাকাল, 'টু সিক্স এইট বললে—পশ্চিমে তো? কতদূরে?'

শ্রাগ করল নিখারেভ, জানে না সে।

রানাকে ডাকল গার্নেভ, 'একটু এদিকে এসো তো, মাসুদ রানা। ম্যাপে আমাদের অবস্থানটা দেখাও।'

'যদি না দেখাই?' শান্ত রানা। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে অন্যদিকে।

'তোমাকে বাধ্য করতে মোটেই বেগ পেতে হবে না নিখারেভের। আসলে কি জানো, এ ধরনের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দিলেই ঠকতে হয়...' মেয়েদের মুখের ওপর একবার চোখ বুলাল গার্নেভ। আবার ফিরল রানার দিকে, 'মেয়েদের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা না থাকলে কি আর তোমার মুখ থেকে কথা বের করতে পারতাম? এসো, খামোকা দেরি করছ।'

অসহায় বোধ করছে রানা। খেপা ষাঁড়কে নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে যেন ওরা। ভয়ঙ্কর রাগ দমন করে পায়ে পায়ে এগিয়ে এল গার্নেভের কাছে রানা। হাত দুটো নিশপিশ করছে লোকটার টুঁটি টিপে ধরার জন্যে।

গার্নেভের কাছে এসে ম্যাপে তাদের অবস্থানটা দেখিয়ে দিল রানা।

ওকে আবার আগের জায়গায় ফিরে যেতে বলল গার্নেভ। ব্যারিকে ডাকল এবার। অবস্থান দেখাতে বলল ম্যাপে। দু'জনকে আলাদা আলাদা ভাবে জিজ্ঞেস করে মিলিয়ে নিল আসলে, নিশ্চিত হয়ে নিল পুরোপুরি। বুঝতে পারল দু'জনের কেউ মিছে কথা বলছে না।

'হ্যাঁ, ঠিকই দেখিয়েছ,' মাথা ঝাঁকাল গার্নেভ। 'তার মানে জানের ভয় আছে তোমাদের। কিংবা নিছক শিভালরি।' বিন্দুমাত্র হাসি নেই তার মুখে। ম্যাপটায় চোখ বুলাচ্ছে। 'কাঙ্গালাক ফিয়র্ডটা নিশ্চয় কাঙ্গালাক গ্লেসিয়ারের নিচে, না?'

'কাঙ্গালাক ফিয়র্ড?' মুখ বাঁকাল রানা। 'প্রথমেই ওখানে প্লেন নামাতে বললে না কেন? কেন শুধু শুধু এই ঝামেলায় ফেললে সবাইকে, নিজেরাও পড়লে?'

'তুমি কি ভেবেছ খামোকা মরেছে পাইলট?' ঠাণ্ডা হাসি দেখা গেল গার্নেভের মুখে, এই প্রথম। 'ফিয়র্ডের উত্তরে কোন এক জায়গায় নামতে বলেছিলাম ওকে।

ওখানে আমাদের কয়েকজন বন্ধু একটা আইস-ক্যাপে কিছু পরীক্ষা চালাচ্ছে। তিন মাইল লম্বা, পুরোপুরি সমতল জায়গাটা, চমৎকার রানওয়ের কাজে ব্যবহার করা যায়। আমারও একটু ভুল হয়েছিল। প্লেনের ডায়ালগুলোর দিকে চোখ রাখা উচিত ছিল প্রথম থেকেই। বড় দেরিতে লক্ষ্য পড়েছিল ওগুলোর ওপর। ততক্ষণে যা ক্ষতি করার করে ফেলেছে পাইলট, ধোঁকা খেয়ে গেছি··· সেসব কথা বলে আর লাভ নেই এখন···' শ্রাগ করল সে। নিখারেভের দিকে তাকাল। 'সময় নষ্ট হচ্ছে, সের্গেই। এই নাও,' ম্যাপটা বাড়িয়ে ধরল সে। 'দেখো এখন বের করতে পারো কিনা কতদূরে রয়েছে ওটা। মাইল ষাটেক হবে?'

হাত বাড়িয়ে ম্যাপটা নিল নিখারেভ। দেখল। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল, 'হ্যাঁ, ওই রকমই হবে।'

'তাহলে আর দেরি করে লাভ কি? চলো এগোই।'

'আমরা এখানে থেকে ঠাণ্ডায় জমে মরছি নিশ্চয়?' জানতে চাইল রানা।

'শরীরে রক্ত বেশি থাকলে না-ও জমতে পারো,' ভাবলেশশূন্য কণ্ঠস্বর গার্নেভের। আশ্চর্য! এই লোকটাই পাদ্রীর ছদ্মবেশে কি চমৎকার বোকা বানিয়েছে এতগুলো লোককে! 'তবে একটা ব্যাপারে নিশ্চিত হতে হবে আমাকে, দেখতে হবে, তোমাদের কেউ যেন আমাদের পেছনে ধাওয়া করতে না পারো। কিছু মনে কোরো না, তোমাদের সবাইকে নিশ্চল করে রাখতে হচ্ছে, কর্তব্যের খাতিরে, বাধ্য হয়েই।'

'কিছুক্ষণের জন্যে নিশ্চল,' অনেকক্ষণ পর কথা বলল ক্লেটন। 'নাকি বরাবরের জন্যে?'

'অপ্রয়োজনে মানুষ খুন করে বোকা লোকে। আমি বোকা নই, এটা তোমাদের সৌভাগ্য,' নিখারেভের দিকে তাকিয়ে বলল গার্নেভ, 'সের্গেই, দড়ি আনো তো। শুধু পাগুলো শক্ত করে বেঁধে ফেলো ওদের। অসাড় হাতের আঙুল দিয়ে ওদের এই বাঁধন খুলতে যা সময় লাগবে, আমাদের জন্যে তা-ই যথেষ্ট। এর মাঝেই অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারব।' পিস্তলের মুখটা বন্দীদের সারির এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ঘোরাল একবার অর্ধবৃত্তাকারে গার্নেভ, 'সবাই বসে পড়ুন।'

হুকুম তামিল করা ছাড়া উপায় নেই। একে একে বরফের ওপর বসে পড়ল সবাই।

স্লেজ থেকে দড়ি নিয়ে এল নিখারেভ।

'আগে রানাকে,' বলল গার্নেভ।

নিজের পিস্তলটা গার্নেভের হাতে তুলে দিল নিখারেভ। কোন কিছু ভুল হয় না এদের। রানা ভেবেছিল, নিখারেভ কাছে এগিয়ে এলে কোনমতে তাকে কাবু করে পিস্তল কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করা যাবে, কিন্তু হলো না। এখন দু'হাতে দুটো পিস্তল নিয়ে তৈরি গার্নেভ। বন্দীদের কেউ এদিক ওদিক কিছু করলে গুলি চালাবে।

রানার সামনে এসে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল নিখারেভ। রানার হাঁটুতে দড়ির একপাক জড়াতেই মরিয়া হয়ে ওকে ধাক্কা মেরে ফেলে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'না!' ভয়ঙ্কর হিংস্র শোনাল রানার গলা। 'কিছুতেই বাঁধতে দেব না

আমাকে!'

শিকারী কুকুরের মত একলাফে দূরে সরে গেছে নিখারেভ। রানার আয়ত্তের বাইরে।

'খবরদার!' চাবুকের মতই সপাং করে উঠল যেন গার্নেভের কণ্ঠ। তার ডান হাতের পিস্তলটা রানার কপালের দিকে তাক করা। 'চুপ করে বসে পড়ো, মাসুদ রানা!'

চকচক করছে গার্নেভের হাতের পিস্তল, কিন্তু গ্রাহ্য করল না রানা। 'রিক,' চেঁচিয়ে বলল, 'ক্লেটন, মার্টিন, সিনেটর···যদি বাঁচতে চান, উঠে দাঁড়ান! ওর হাতে পিস্তল দুটো, কিন্তু একবারে দুটো পিস্তল দিয়ে নিশানা করা যায় না। ও প্রথম গুলিটা করার সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়বেন ওর ওপর। সবাইকে একা ওর পক্ষে সামলানো অসম্ভব!' বলছে বটে, কিন্তু নিজেই বিশ্বাস করছে না রানা কথাটা। 'শ্যারিন, সুসান, ডুলানী, মার্থা···প্রথম গুলির শব্দ শোনামাত্র বাইরে অন্ধকারের দিকে ছুট লাগাবেন···'

'পাগল হয়ে গেলেন নাকি, রানা?' ক্লেটনের চোখে বিস্ময়। রানা বলার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছে সে। টান টান হয়ে উঠেছে শরীরের সমস্ত পেশী। চোখের পলকে গার্নেভের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তৈরি। 'আমাদের সবাইকে খুন করবে ও!'

'তা যাতে করতে না পারে, সেটাই চাইছি আমি,' বলল রানা। কঠিন কণ্ঠস্বর। 'পা বেঁধে আমাদের এখানে ফেলে যেতে চায়, ওকে কি পাগল ভেবেছেন? সাবমেরিনের কথা কেন ও আমাদের জানিয়েছে? ও কি জানে না একথা নিশ্চয় জানাব আমরা ব্রিউস্টারকে, ব্রিউস্টার জানিয়ে দেবে ট্রাইটনকে, পালাবার পথ বন্ধ হয়ে যাবে সাবমেরিনের? জানে। তাহলে কেন বলেছে? বলেছে আমাদের কাছ থেকে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে। সাবমেরিনের কথা ব্রিউস্টারকে জানানোর জন্যে কেউই বেঁচে থাকব না আমরা।' দ্রুত একটানা এতগুলো কথা বলে থামল রানা। এই সময়ে একবারও চোখ সরাল না গার্নেভের পিস্তল ধরা হাতের ওপর থেকে।

'কিন্তু···' বলতে চাইল ক্লেটন।

'কোন কিন্তু নেই,' প্রায় খিঁচিয়ে উঠল রানা। 'গার্নেভ জানে, আজ বিকেলের ভেতরেই এখানে পৌঁছে যাচ্ছে ব্রিউস্টার। আমরা যদি তখন পর্যন্ত বেঁচে থাকি, ওরা কোন্‌দিকে গেছে, কি করেছে, না করেছে, সব জেনে যাবে ব্রিউস্টার। এবং তারপর এক ঘণ্টার মধ্যেই কাঙ্গালাক গ্লেসিয়ারের পথ একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। ঝাঁকে ঝাঁকে বম্বার উড়ে আসবে ট্রাইটন থেকে। নিশ্চিহ্ন করে দেবে সিত্রোঁ আর তার আরোহীদের। প্রণালীর পানিতে ফাঁদ পাতবে ট্রাইটন আর অন্যান্য ডেস্ট্রয়ারগুলো। ডেপথ চার্জ খেয়ে মরবে রাশান সাবমেরিন। বুঝতে পারছেন তো এবার?··· আসলে, আমাদের সবাইকে একসাথে গুলি করে কিছুতেই মারতে পারবে না ওই হারামখোরের বাচ্চা। তাই সবার পা বেঁধে অসহায় করে নিয়ে তারপর গুলি করতে চায়।'

বন্দীদের আর কেউ কোন প্রশ্ন করল না। আসল সত্যটা বুঝে ফেলেছে ওরা এখন। সবাই চেয়ে আছে তার মুখের দিকে, টের পাচ্ছে রানা, কিন্তু ওদের কারও দিকে তাকাল না সে। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে গার্নেভের পিস্তলের দিকে।

'তোমাকে সত্যিই আন্ডার-এস্টিমেট করেছিলাম, মাসুদ রানা,' হালকা গলায় বলল গার্নেভ। কণ্ঠে রাগ বা ক্ষোভের চিহ্নমাত্র নেই। 'কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, আমাদের কাজ একটু বাড়ালে, এই যা। তবে ধরে নিতে পারো, মৃত্যু তোমার হয়ে গেছে।'

'জন্মের পর যেদিন বুঝতে শিখেছি, সেদিনই ধরে নিয়েছি মৃত্যু আমার হয়ে গেছে,' হাসল রানা।

'হুঁ,' চিন্তিত দেখাচ্ছে গার্নেভকে। রানাকে কায়দা করার নতুন কোন মতলব আঁটছে হয়তো।

'আপনি মানুষ না, গার্নেভ,' সিনেটর কথা বলল। গলায় ক্ষোভ আর ভয়ের মিশ্রণ। 'আমাদের ধরে বেঁধে এভাবে খুন করতে চাইছিলেন! আপনি পাগল···বদ্ধ পাগল···' কথা জোগাল না আর ম্যাক্সওয়েলের মুখে।

'মোটেও পাগল না ও,' বলল ক্লেটন। 'বদের হাড্ডি। ছদ্মবেশ কি নিয়েছিল গার্নেভের বাচ্চা···'

রাগল না গার্নেভ। 'ঠিকই ধরেছে মাসুদ রানা,' রানাকে দেখিয়ে বলল। 'আসলে একবারে সবাইকে শেষ করতে পারতাম না। কেউ এসে ঝাঁপিয়ে পড়তেন আমাদের ওপর, কেউ ছুটে চলে যেতেন বাইরের অন্ধকারে···,' স্লেজটার দিকে ইঙ্গিত করল গার্নেভ। 'ওসব কথা থাক। মনে হয়, আমাদের সঙ্গে যাওয়াই এখন ভাল আপনাদের।'

ছয়

যেতেই হলো। এর পরের নয়টি ঘন্টা, আর শেষ-না-হতে-চাওয়া তিরিশটা মাইল সাংঘাতিক কষ্ট পেল ওরা। একটা ট্রাক্টরের জন্যে তিরিশ মাইল কিছুই নয়, কিন্তু সেটা স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে। কিন্তু এই ঢেউ খেলানো তুষার আর ভয়ঙ্কর ঝড়ো বাতাস প্রাণ বের করে দেবার উপক্রম করেছে।

আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে ক্রমেই। বাতাসের গতি তিরিশ মাইল ছাড়িয়ে গেছে। এলোমেলো উড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বরফকুচি। যাত্রীদের শরীরের যেখানেই একটু খোলা জায়গা পাচ্ছে, সুচের মত বিঁধছে এসে।

ট্রাক্টর চালাচ্ছে সের্গেই নিখারেভ। কেবিনের পেছনে ক্যানভাসের পর্দার এপাশে বসে পিস্তল হাতে সারাক্ষণ স্লেজের যাত্রীদের ওপর নজর রাখছে গার্নেভ। ওর কয়েক ফুটের মধ্যেই খোলা স্লেজের সাংঘাতিক ঠাণ্ডার মাঝে গাদাগাদি করে বসে আছে বাকি সবাই।

আরও খারাপ হয়েছে আবহাওয়া। বরফ পড়া বেড়েছে। স্লেজের যাত্রীরা কি করছে না করছে দেখতে এখন অসুবিধে হচ্ছে গার্নেভের। সার্চলাইটের আলো স্লেজের দিকে ঘুরিয়ে দিল সে। এতে দুটো সুবিধে হলো তার। যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে পরিষ্কার। তাছাড়া তীব্র আলোর আড়ালে থাকায় ভালমত দেখতে পাবে না তাকে ওরা এখন। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে ট্রাক্টর থামিয়ে শ্যারিন আর মার্থাকে কেবিনে তুলে নিয়ে গিয়ে হাত পা বেঁধে ফেলে রাখল।

স্লেজের মাঝখানে চিত হয়ে শুয়ে আছেন ব্রিমন আর সুসান। তাঁদের দু'দিকে তিনজন তিনজন করে বসেছে অন্যেরা।

বরফের কবল থেকে বাঁচার জন্যে নিজেদের সবার ওপর একটা তেরপল টেনে দিয়েছে রানা আর ব্যারি। অতি সামান্য আড়াল, কিন্তু একেবারে খোলা আকাশের নিচে বরফপাতের মধ্যে বসে থাকার চেয়ে অনেক ভাল।

একঘেয়ে, ক্লান্তিকর যাত্রা। একেবারে চুপচাপ বসে থেকে ক্লান্তি আরও বাড়ে। কিছুই করার নেই। ক্যানভাস একটু ফাঁক করে উঁকি মারল ক্লেটন। আলোর জন্যে ভাল দেখা যাচ্ছে না, তবে আবছা দেখা গেল গার্নেভকে। একই জায়গায় একইভাবে বসে আছে।

'হারামজাদা, শুয়োরের বাচ্চা!' দাঁতে দাঁত চাপল ক্লেটন। 'কি চমৎকার অভিনয় আর ছদ্মবেশ! ইস্‌, ঘুণাক্ষরেও যদি টের পেতাম…'

'…তাহলে কি হত?' মৃদু হেসে বলল রানা। 'আমি তো টের পেয়েছিলাম…'

'টের পেয়েছিলেন!' প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠল ক্লেটন আর মার্টিন।

'হ্যাঁ, পেয়েছিলাম,' মাথা ঝাঁকাল রানা।

'এরপরেও আমাদের বেঁধে রাখলেন? ওদের ধরলেন না!' ভুরু কুঁচকে উঠেছে ক্লেটনের।

'হ্যাঁ।'

'কেন?'

'ওদের ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম। ঝুঁকিটা নিতে হয়েছিল। রাইফেলের মুখে ওদেরকে অসহায় করে বেঁধে ফেলতে পারতাম। কিন্তু তাহলে ওরা যে খুনী, কিছুতেই প্রমাণ করতে পারতাম না। কোন প্রমাণ রাখেনি ওরা। ওদেরকে দিয়েই বলাতে চেয়েছিলাম ওরা খুনী, হিসেবে একটু ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই পালটে গেল পরিস্থিতি।'

'কিন্তু আমি আর বাবা…'

'বাবা!'

'কাল রাতেই পরিচয় দিয়ে ফেলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সুযোগ পাইনি,' হেসে অন্ধকারে মার্টিনের দিকে তাকাল ক্লেটন। 'বাবা, আসল কথাটা ওদের বলেই ফেলি।'

অন্ধকারে ক্লেটন কিংবা মার্টিন, কারও মুখই দেখতে পাচ্ছে না রানা। 'ও-ও, মার্টিন তাহলে আপনার বাবা! তাই তো বলি, আপনাদের দু'জনের ব্যবহার এমন খাপছাড়া কেন! আসলে প্রথম থেকেই আপনাদের দু'জনকে মনিব-কর্মচারীর মত

মনে হচ্ছিল না আমার।'

'ঠিকই সন্দেহ করেছিলেন আপনি, রানা,' অন্ধকারেই হাসল টম। কণ্ঠে আগের বিরক্তি নেই। তার জায়গায় ঠাঁই নিয়েছে ক্লেটনেরই মত সুরুচি ও সংস্কৃতির ছাপ। 'আমি ডেরির বাপ। ওর ম্যানেজার ঠিক নই, তবে খবরদারির কাজ করতে হয় সারাক্ষণই। পড়াশোনায় কোনদিনই তেমন মন নেই ছেলেটার, মেতে আছে খালি খেলাধুলা নিয়ে। কোথা থেকে জানি মুষ্টিযুদ্ধের পোকা মাথায় ঢুকেছে কিছুদিন হলো। ব্যস, ওস্তাদ যোগাড় করে নিয়ে খেলা শিখতে শুরু করেছে।…নিউ জার্সিতে ছোটখাট একটা প্লাস্টিকের কারখানা আছে আমার। আমি চেয়েছিলাম, ওটার ম্যানেজিং ডিরেক্টর হোক ও। কিন্তু ওসবে ওর মন নেই। কত বোঝালাম…হলো না…বড্ড জেদী…।'

'একটু বাড়িয়ে বলছ না, বাবা? তুমি কি কম জেদী?' প্রতিবাদ করল ক্লেটন।

'মোটেও বাড়িয়ে বলছি না, তুমি জানো,' বলল টম। রানার উদ্দেশে বলল, 'জানেন, ও আমার একমাত্র সন্তান। ব্যবসাটা আর কার হাতে তুলে দেব? তাই ওকে দু'বছরের সময় দিয়েছি। এর মাঝে যদি মুষ্টিযুদ্ধে উন্নতি করতে না পারে তো আমার ব্যবসায় ঢুকতে হবে। তবে এর মধ্যে মোটামুটি ভালই করেছে সে। আমেরিকায় অপেশাদার ফাইটারদের সঙ্গে লড়ে দুইবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ওকে নিয়ে আমার মহা জ্বালা…ওর চাঁছাছোলা ব্যবহারের জন্যে কেউ কাজ করতে চায় না ওর কাছে। আগের ম্যানেজারটাকে তো লাথিই মেরে বসেছিল একদিন। এরপরে কি আর কেউ থাকতে চায়? শেষ পর্যন্ত আমিই ওর ম্যানেজারীর দায়িত্বটা নিয়েছি…আসলে ওকে চোখে চোখে রাখতে চাইছি আর কি…'

'তা আপনাদের নাম কোন্‌টা ঠিক? ক্লেটন, নাকি মার্টিন?' জানতে চাইল রানা।

'ক্লেটন।'

'নামটা বদলেছিলেন কেন?'

'মুষ্টিযোদ্ধাদের মাঝে একটা রেওয়াজ আছে, খুব নিকট আত্মীয়র প্লেয়ারের ম্যানেজার হওয়া নাকি অসম্মানের কাজ। সেজন্যেই পদবীটা বদলে নিয়েছি। এটাকে এক ধরনের নির্দোষ প্রতারণা বলতে পারেন।'

'খুব একটা নির্দোষই বা বলি কি করে,' গম্ভীর শোনাল রানার গলা। 'এত নিকৃষ্ট অভিনয় করেছেন যে যে-কেউই সন্দেহ করে বসবে। আপনাদের দু'জনকে সন্দেহমুক্ত করতে অনেক সময় লেগেছে আমার এজন্যেই।'

'সরি, রানা,' মাপ চাইল ডেরেক। 'কিছু মনে করবেন না। যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে আমাদের। হ্যাঁ, যে কথাটা জানতে চাইছিলাম…আমরা মাংস কিংবা আপনার পিস্তল চুরি করিনি, বিশ্বাস করছেন তো এখন?'

'ব্যাগের ভেতরে যখন পাওয়া গেল, তখনও অপরাধী ভাবিনি আপনাদের। বরং শিওর হয়ে গিয়েছিলাম, কে কে খুনী। কেন, চোখ টিপেছিলাম, লক্ষ করেননি?'

'করেছিলাম। তার মানে তখনি বুঝতে পেরেছিলেন, এটা একটা চাল? আমাদের দু'জনকে ফাঁসিয়ে দেয়ার জন্যেই এ কাজ করেছে নিখারেভ?'

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, নিজেকে আর গার্নেভকে সন্দেহমুক্ত করার জন্যেই রাইফেল নিয়ে ফাটলের পাশে গিয়ে খাড়া হয়েছিল সে। মেরেছিল গার্নেভের মুখে।'

'কি সাংঘাতিক পাজী লোক!' বলে উঠল সিনেটর।

'কিন্তু রানা, জেনেশুনেও আমাদের দু'জনকে বাঁধলেন কেন?' জানতে চাইল টম।

'আগেই তো বললাম, খুনীদেরকে খুনী প্রমাণ করতে চেয়েছিলাম। ওদের মুখ থেকেই ওদের অপরাধ স্বীকার করাতে চেয়েছিলাম কয়েকজন সাক্ষীর সামনে।'

'আচ্ছা, একটা ব্যাপার, রানা, ওই নিখারেভই তো সেকেন্ড অফিসারকে খুন করেছে?' জানতে চাইল ডেরেক।

'কেন, এখনও সন্দেহ আছে নাকি?'

'না, বলছিলাম কি, যদি টসে হেরে যেত সে?'

'ইচ্ছে করলে আপনিও টসে জিততে পারেন। একটা বিশেষ কায়দায় ওপর দিকে ছুঁড়ে দেবার প্র্যাকটিস থাকলে, একশোর মধ্যে পঁচানব্বই বারই আপনার ইচ্ছেমত ওপরের দিকে পিঠ করে মাটিতে পড়বে কয়েন।'

'কেবিনের রেডিওটা কে ভাঙল?'

'ওই নিখারেভ। আসলে রেডিওটাকে বাঁচানোর জন্যে হাতে ব্যথা পায়নি সে। ঝাড়ুর ডাণ্ডা দিয়ে টেবিলের পায়ায় ঠেলা মেরেই লাফ দেয়। শ্যারিনের গায়ের ধাক্কা তো আছেই, তার ওপর ডাণ্ডার ঠেলা খেয়ে উল্টে পড়ে যেতে থাকে টেবিলসুদ্ধ রেডিও। লাফ দিয়ে বাঁচানোর ভান করে আরও জোরে রেডিওটাকে ঠেলে দেয় নিখারেভ। হাতে ব্যথা পায়। সন্দেহমুক্ত থাকতে ব্যাপারটা সাহায্য করে তাকে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা আর কি।'

'প্লেনটায় আগুন লাগিয়েছিল কেন? সাক্ষ্য-প্রমাণ নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে?' প্রশ্ন করল ডেরেক।

'সাক্ষ্য-প্রমাণ আর এমন কি ছিল? পাইলট গুলি খেয়ে মরেছে, এ থেকে কে খুনী জানা যায় না। আসলে অন্য কারণে আগুন লাগানো হয়েছে প্লেনে।'

'অন্য কারণ?'

'খেয়াল করেছেন নিশ্চয়, প্লেনের শুধু সামনের অংশটা পুড়েছে। তাই-ই চেয়েছে নিখারেভ। আসলে তেল নষ্ট করে দিতে চেয়েছে। কেবিনে স্টক করা তেলে চিনি মিশিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে। এরপর যাতে প্লেন থেকে তেল যোগাড় করে ট্রাক্টর চালানো না যায়...মানে ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার যেন আমাদের এসে ধরে ফেলতে না পারেন, সে-ব্যবস্থাই করেছে শয়তানটা।'

'কি ধুরন্ধর, পাজী, বদমাশ লোক!' বলে উঠল সিনেটর।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ ট্রাক্টর থামাল নিখারেভ। কিন্তু ইঞ্জিন বন্ধ করল না। ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে কেবিনের পাশ দিয়ে পেছনে এসে দাঁড়াল। ঠেলে একদিকে খানিকটা সরিয়ে দিল সার্চলাইট। ইঞ্জিনের বিকট শব্দ আর বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলল।

'অর্ধেক পথ পেরিয়েছি আমরা,' গার্নেভকে বলল নিখারেভ। 'বত্রিশ মাইল।'

'গুড,' কণ্ঠস্বর শুনলেও আলোর পেছনে বসে থাকায় গার্নেভকে দেখতে পেল না স্লেজের লোকেরা। তবে ওর হাতে ধরা পিস্তলটা দেখা যাচ্ছে, আলোর ঠিক নিচেই বাড়িয়ে ধরে রেখেছে, যাতে সবাই দেখতে পায়। ডেকে বলল, 'মাসুদ রানা, এখানেই নামতে হবে তোমাদের। নেমে পড়ো।'

করার কিছুই নেই। নীরবে স্লেজ থেকে একে একে নেমে এল সবাই। গার্নেভের দিকে এগোতে যাচ্ছিল ডেরেক, কিন্তু নড়ে উঠল পিস্তল ধরা হাতটা। গম্ভীর হুঁশিয়ারি শোনা গেল, 'খবরদার! আর এক পা এগোলেই খুলি উড়ে যাবে!'

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ডেরেক।

'পিছিয়ে যান!' আলোর আড়ালে থেকে আবার আদেশ দিল গার্নেভ।

পিছিয়ে এল ডেরেক।

'গার্নেভ, আর কয়েক ঘণ্টা পরেই তোমার বন্ধুদের দেখা পাবে,' বলল রানা। 'এক কাজ করো না। সামান্য কিছু খাবার, একটা স্টোভ আর তাঁবু রেখে যাও এখানে। খুব বেশি চাইছি কি?'

'নিশ্চয়।'

'কিচ্ছু রেখে যাবে না?'

'খামোকা অনুরোধ করছ, রানা। তোমাকে ভিক্ষা চাইতে দেখে আমারই খারাপ লাগছে।'

'নিজের জন্যে চাইছি না আমি, গার্নেভ,' কঠিন হয়ে গেল রানার গলা। 'তা স্লেজ দুটোও কি নিয়ে যাবে নাকি?'

'কোন সন্দেহ নেই।'

'কুকুরে-টানা স্লেজটা অন্তত রেখে যাও। কুকুরগুলো চাইছি না। মিস্টার ব্রিমন আর সুসান গিলবার্ট হাঁটতে পারবেন না।'

'একবারই বলেছি, খামোকা সময় নষ্ট করছ,' পিস্তল ধরা হাতটা নড়ে উঠল গার্নেভের। 'সবাইকে নামতে বলেছি আমি···' ধমকে উঠল সে। 'মার্টিন, শুনতে পাননি? নামুন!'

'আমার পা দুটো···' যন্ত্রণার চিহ্ন পরিষ্কার ফুটেছে টমের চেহারায়। 'পা দুটো জমে গেছে।'

'নামো!' কঠিন কণ্ঠ গার্নেভের।

'ঠিক আছে,' দাঁতে দাঁত চেপে কোনমতে উঠে দাঁড়াল টম। 'চেষ্টা করছি। পারব কিনা জানি না।'

'এমনিতে না পারলেও পাছায় একটা গুলি বিঁধলেই পারবে,' ধমকে উঠল গার্নেভ।

আবার সামনে এগোল ডেরেক, গুলির ভয়কে অগ্রাহ্য করেই। ভয়ঙ্কর শীতল কণ্ঠে বলল, 'গুলি না করলেই ভাল করবে তুমি, লালমুখো বাঁদরের বাচ্চা! তোমাকে কথা দিচ্ছি, মিস্টার টমের একটা চুল যদি জখম হয়, তোমার হাত-পাগুলো সব টেনে টেনে ছিঁড়ব আমি!'

'তাই নাকি?' শ্লেষ ফুটল গার্নেভের কণ্ঠে। 'দু'জনই একসঙ্গে মরতে চাও?'

'দু'জন নয়, তিনজন, তুমিও মরবে আমাদের সঙ্গে,' হিংস্র হয়ে উঠেছে ডেরেক। 'একটা কথা জানাচ্ছি তোমাকে, আমার ম্যানেজার নয় ও, বাপ। জন্ম দিয়েছে আমাকে। সুতরাং বুঝতেই পারছ, তোমার পিস্তলের সবগুলো গুলি আমার গায়ে বিঁধলেও তোমাকে শেষ করার আগে মরছি না আমি।' বিশাল হাত দুটো আক্রমণের ভঙ্গিতে সামনে বাড়াল ডেরেক। 'আমার বাপ নামবে না। চালাও দেখি গুলি!'

'বাপ! টম আপনার বাবা?' প্রশ্নটা ছিটকে বেরিয়ে এল গার্নেভের মুখ থেকে।

'এক কথা বারবার বলি না আমি।'

'চমৎকার!' বিস্ময়ের ভাবটা সহজেই কাটিয়ে উঠেছে গার্নেভ। খুশি খুশি গলায় বলল, 'তাহলে তো আরও ভাল হলো। আপনার বাবাকে নিয়ে কেবিনে ঢুকুন, ক্লেটন। মার্থার বদলে ওকেই নেব। ওই জার্মান বাঁদীকে নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাবে না, বুঝতে পারছি।'

গার্নেভ এবং নিখারেভ দু'জনের হাতেই পিস্তল। বাধা দিতে গেলে প্রথম ধাক্কায়ই যে-কোন দু'জন লোক মরবে। এরপরের মুহূর্তেই আরও দু'জন। কাজেই ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তাটা বাদ দিল রানা। সামান্যতম সুযোগ দিচ্ছে না দুই খুনী।

হাঁটার ক্ষমতা নেই টমের। ওকে কোলে করেই নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু গোঁ ধরে রইল ডেরেক, কিছুতেই নিয়ে যাবে না। গুলি চালাক গার্নেভ।

ডেরেককে বোঝাল রানা, খামোকা গুলি খেয়ে কোন লাভ নেই। আপাতত গার্নেভ যা বলছে শুনুক, পরে হয়তো সুযোগ আসতেও পারে।

বাপকে কোলে নিয়ে কোনরকম ঝুঁকি নিল না ডেরেক। সুবোধ বালকের মত টমকে কেবিনের একটা তাকে শুইয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে আগের জায়গায় দাঁড়াল আবার।

ট্রাক্টরে টানা স্লেজের সঙ্গে কুকুরে টানা স্লেজ বাঁধার নির্দেশ দিল গার্নেভ ব্যারিকে। ব্যারি রওনা হয়ে যেতেই মার্থাকে নির্দেশ দিল, 'এবার বেরোও তুমি।'

ধীরে ধীরে ক্যানভাসের পর্দার কাছে এসে দাঁড়াল মার্থা। গার্নেভের পাশ দিয়ে যাবার সময় ইচ্ছে করেই হোঁচট খেলো সে। গিয়ে পড়ল গার্নেভের গায়ের ওপর। থাবা মারল ওর পিস্তল ধরা হাতে। ছিটকে পিস্তলটা নিচে পড়ে গেল। মার্থাকে ঝাড়া মেরে সরিয়ে দিয়ে ক্ষিপ্র চিতার মত লাফ দিল গার্নেভ, পিস্তলটার দিকে। এগিয়ে আসতে যাচ্ছিল রানা, নিখারেভের কঠোর কণ্ঠ কানে যেতেই থেমে গেল।

'খবরদার! এক পা এগোবে না, রানা! এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ব আমি!'

আলোর এপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিখারেভ। চোখ দুটো হিংস্র নেকড়ের মত জ্বলজ্বল করছে তার। একটার ওপর আরেকটা চেপে বসেছে ঠোঁট। সাক্ষাৎ শয়তানের মতই মনে হচ্ছে তাকে।

পিস্তলটা হাতে তুলে নিয়েছে আবার গার্নেভ। আবার ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল মার্থা। আরেক ভুল করল এবার ডুলানী। 'মার্থা, ওকে ছেড়ো না, ছেড়ো না, আমি আসছি!' দুই হাত সামনে বাড়িয়ে পাগলের মত সামনে ছুটে গেল মিসেস ডুলানী।

প্রচণ্ড ধাক্কা মারল গার্নেভ। ছ'হাত দূরে ছিটকে পড়ল মার্থা। ককিয়ে উঠল ভাঙা হাড়ে আঘাত খেয়ে।

গুলি করল গার্নেভ। কিন্তু তার আগেই দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছে ডুলানী। গুলিটা বিঁধল তারই গায়ে। আর্তনাদ করে বরফের ওপর ছিটকে পড়ল ডুলানী।

একলাফে কেবিনের পেছনে উঠে পড়ল গার্নেভ। আবার সকলের দিকে তাক করে ধরল পিস্তল।

চোখের সামনে এতবড় অঘটন ঘটে গেল, পুতুলের মত চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে হলো রানাকে। কিছুই করতে পারছে না সে। রাগে দুঃখে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে তার।

গার্নেভ পিস্তল নিয়ে আবার তৈরি হয়ে বসতেই ছুটল নিখারেভ। কয়েক সেকেন্ড পরেই ইঞ্জিনের শব্দ বদলে গেল। গিয়ার দিয়েছে সে।

ধীরে ধীরে চলতে শুরু করল ট্রাক্টর। পেছনে পেছনে টেনে নিয়ে চলেছে দুটো স্লেজকে। কুকুরগুলোকেও বাধ্য হয়ে ছুটতে হচ্ছে।

'মার্থা!' কেঁদে উঠল জার্মান মেয়েটা। ডুলানীর পাশে বসে দু'হাতে মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে সে। 'উনি আমাকে মার্থা বলে ডেকেছিলেন!'

কারও দিকে নজর নেই রানার। পশ্চিমের তুষার ঢাকা অন্ধকারে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাওয়া সিত্রোঁর সার্চলাইটের আলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে এক কঠিন শপথ নিল সে।

সাত

তুষার ঝরা অন্ধকার ভয়ঙ্কর রাত। টলতে টলতে এগিয়ে চলেছে ওরা। ট্রাক্টরটাকেই অনুসরণ করছে। সারা দেহে প্রচণ্ড অবসাদ রানার। প্রতিটি মিনিটকে মনে হচ্ছে এক একটা যুগ। চলছে তো চলছেই, এ চলার যেন আর শেষ নেই। পায়ে কোন সাড় নেই। কেমন যেন ঘুম ঘুম একটা ভাব শরীরের শক্তিকে আরও দ্রুত ক্ষয় করে দিচ্ছে।

রানার মনের পর্দায় সিত্রোঁর কেবিনটা ফুটে উঠল। ম্লান আলো। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় কাঠের মেঝেতে অসহায়ভাবে পড়ে আছে এক বৃদ্ধ, আর এক মেয়ে। কাতরাচ্ছে, কিংবা ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। কেবিনের অন্য পাশে পিস্তল হাতে বসে আছে গার্নেভ: ভয়াবহ নিষ্ঠুর এক পিশাচ যেন।

নিজের ওপর একটা বিরক্তি আর ক্ষোভ কুরে কুরে খাচ্ছে রানার মনকে। তার সামান্য ভুলের জন্যেই এখন এই অবস্থা হয়েছে এতগুলো লোকের। তার হিসেবে গরমিলের জন্যেই মারা গেল মিসেস ডুলানী। মারা যাবে শ্যারিন আর টম ক্লেটন। ওদেরকে জামিন হিসেবে ধরে নিয়ে গেছে গার্নেভ, কিন্তু পরে যে মেরে ফেলবে

তাতে কোন সন্দেহ নেই। দু'জনকে মেরে ফেলার আগেই কিছু একটা করতে চায় রানা। ট্রাক্টরটাকে অনুসরণ করার এটা একটা কারণ। আরও কারণ অবশ্য আছে।

একবার মনে করেছিল রানা, পিছিয়ে যাবে। কিন্তু ভেবে দেখেছে, সেটা উচিত হবে না। দীর্ঘ সময় সিট্রোঁর সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ বন্ধ থাকলে ব্রিউস্টারের মনে সন্দেহ জাগবেই। যোগাযোগ করার চেষ্টা করবে সে যত রকমে সম্ভব। কিন্তু পারবে না। তখন কি করবে? গোলমালটা কোথায়, অনুমান করতে কষ্ট হবে না তার। ভাববে, যাত্রীদের খুন করে ট্রাক্টর নিয়ে পালাচ্ছে দুই খুনী। চলার গতি বাড়িয়ে দেবে সে তখন। শর্টকাট পথ খুঁজে নিয়ে সোজা উপকূলের দিকে ছুট লাগাবে, কিংবা সিট্রোঁটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে। যদি প্রথমে উপকূলে যাওয়াই স্থির করে, তাহলে ওখানে পৌঁছে সিট্রোঁটার জন্যে কিছু সময় অপেক্ষা করবে। তারপর শুরু করবে তোলপাড়। বিরাট এলাকা নিয়ে তল্লাশীর ব্যবস্থা করবে।

ব্রিউস্টার ঠিক কি করবে, বা করছে, জানা নেই রানার। এখন তবু একটা চিহ্ন আছে, সিট্রোঁটাকে অনুসরণ করে কোন একটা নিরাপদ জায়গায় হয়তো পৌঁছতে পারবে। কিন্তু সাংঘাতিক এই তুষার ঝড় আর অন্ধকারের মাঝে ফিরে গিয়ে যদি ব্রিউস্টারকে না পায়? তখন সিট্রোঁরও নিশানা পাবে না, স্নো-ফ্যালকনের তো নয়ই। কোনদিনই তাহলে আর উপকূলে পৌঁছানো হবে না তাদের। সিট্রোঁকে অনুসরণ করার এটা আরেকটা বড় কারণ।

আশঙ্কা আর ভয় একসঙ্গে এসে ঠাঁই নিয়েছে ডেরেকের মনে। তার নিজের জন্যে নয়, বাপের জন্যে। ডুলানীর মৃত্যুর পর থেকে একটাও কথা বলেনি, ঠাণ্ডায় অবশ পা দুটো টেনে টেনে কোনমতে এগিয়ে চলেছে সে। রানার মত তার অতশত ভাবনা নেই, তার শুধু একটাই চিন্তা, যেমন করে হোক সিট্রোঁটার নাগাল পেতেই হবে।

ব্যারিও নির্বাক, নির্লিপ্ত। আপন মনে পা তুলছে, ফেলছে। চেহারা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। কিন্তু রানা জানে, ওর ভাবলেশশূন্য নির্লিপ্ততার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে দুই খুনীর প্রতি ভয়ঙ্কর ক্রোধ আর তীব্র ঘৃণা। গার্নেভ কিংবা নিখারেভকে কায়দা মত এখন বাগে পেলে খালি হাতেই খুন করে ফেলবে ব্যারি।

এই ঘৃণা আর রাগই হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে ওদের তিনজনকে। প্রচণ্ড ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ফ্রস্টবাইটের তীব্র যন্ত্রণা, দারুণ অবসাদ, কোন কিছুকেই গ্রাহ্য করতে চাইছে না।

গ্রীনল্যান্ডের বাতাস শুঁকেই যেন বিপদ টের পায় ব্যারি। অনেক আগে থেকেই সন্দেহটা উঁকিঝুঁকি মারতে শুরু করেছে তার মনে, কিন্তু শিওর হতে পারেনি বলে এতক্ষণ রানাকে জানায়নি। এখন জানাল।

ক্যাটাব্যাটিক উইন্ডের ফলে প্রচণ্ড নিম্নচাপ সৃষ্টি হচ্ছে কাঙ্গালাক গ্লেসিয়ারের ওপর। পেছনের ভিভেভি গিরিসমতল থেকে পনেরোশো ফুট নিচে নেমে এসেছে এতক্ষণে রানা আর তার সহযাত্রীরা। এখান থেকেই শুরু হয়েছে নিম্নচাপ। বাতাসের শব্দের পরিবর্তন শুনেই টের পেয়েছে ব্যারি ব্যাপারটা।

বাতাসের কি পরিবর্তন হচ্ছে না হচ্ছে জানার প্রয়োজন অনুভব করেনি এতক্ষণ রানা। তাছাড়া গ্রীনল্যান্ডের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচিতও নয় সে। এখন ব্যারি বলাতে খেয়াল করে শুনল। ঠিকই। গ্রীনল্যান্ডে বাতাসের শোঁ শোঁ আর্তনাদই শুধু শুনেছে রানা, এখন শুনল অদ্ভুত চাপা গর্জন। সাইরেনের শব্দের মতই চলছিল, কিন্তু এখন সেটা বদলে গেছে। কয়েক লক্ষ চীনা ঘুড়ির মিলিত বাঁউ উঁ উঁ-উঁ আওয়াজ যেন কানের পর্দায় এসে বাড়ি মারছে। তীব্র ঝড়ো বাতাসের সঙ্গে এলোমেলো উড়ছে লক্ষ-কোটি বরফ-কুচি, শরীরের যেখানেই সামান্যতম খোলা জায়গা পাচ্ছে, বিঁধে যাচ্ছে কুট করে। ওরা এগোতে পারছে শুধু বাতাসের ভাটির দিকে চলেছে বলে। কিন্তু সে-ও আরেক যন্ত্রণা। জোর বাতাসে কুঁজো হয়ে চলতে চলতে পিঠ-ঘাড় ব্যথা হয়ে গেছে।

প্রকৃতির প্রতিকূলতা তো আছেই, তার ওপর আছে বোঝা। সবার মাঝে মোটামুটি সমর্থ বলতে রানা, ব্যারি আর ডেরেক। ব্রিমন অচল, সুসানও তাই। সিনেটর বয়স্ক, তাছাড়া চিরজীবন আরাম আয়েশে থেকে শরীরের সর্বনাশ করে ফেলেছে। এখন কষ্ট সইতেই পারে না তার দেহ। মার্থা মেয়ে, তার ওপর হাড়ভাঙা যন্ত্রণা। আহত। হাঁটতে অসমর্থ।

আচ্ছন্ন ভাব এখনও কাটেনি ব্রিমনের। বুঝতে পারছে রানা, আর বেশিক্ষণ ওঁকে বইতে হবে না ডেরেকের। কিন্তু যেটুকু সময় বয়ে নিয়েছে, তাতেই সর্বনাশ হয়ে গেছে ডেরেকের হাতের। আর কোনদিন মুষ্টিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারবে না সে। কি করে জানি দস্তানা হারিয়ে ফেলেছে। তার ওপর সারাক্ষণ ব্রিমনকে কোলে তুলে হাঁটার জন্যে নাড়াতে পারছে না হাত। খোলা হাতে মারাত্মক কামড় বসিয়েছে ফ্রস্টবাইট।

সুসান গিলবার্টকে বয়ে নিচ্ছে রানা। বুঝতে পারছে সে, খামোকাই কষ্ট করছে। উপযুক্ত খাবার আর মাথার ওপর আচ্ছাদন সহ বিশ্রাম না পেলে এই রাতটাও কাটাতে পারবেন না অভিনেত্রী।

মার্থাকে বয়ে নিচ্ছে ব্যারি। প্রথমে কিছুতেই কাঁধে উঠতে রাজি হয়নি মার্থা, হাঁটার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কয়েক গজ যেতে না যেতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। শেষে তুলে কাঁধে নেয়ার সময় বাধা দেয়ার শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না মেয়েটার।

রাগ আর ঘৃণা ছাড়াও আরও তিনটে জিনিস এগিয়ে নিয়ে চলেছে ওদের, এখনও টিকিয়ে রেখেছে। ডেরেকের প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি, ব্যারির বরফ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আর রানার দায়িত্ববোধ।

সবার পেছনে অন্ধের মত হোঁচট খেতে খেতে এগোচ্ছে সিনেটর ম্যাক্সওয়েল। মাঝে মাঝেই আছাড় খেয়ে পড়ছে, পরক্ষণেই হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে আবার অন্যদের সাথে তাল বজায় রাখার চেষ্টা করছে। নিজের হোমরাচোমরা ভাবটা কিছুতেই বজায় থাকছে না, একেবারে ভেঙে পড়েছে বেচারী। অহঙ্কার আর মিথ্যে আভিজাত্যের কণামাত্রও অবশিষ্ট নেই আর এখন। বয়েস যেন আরও অনেক বেশি বেড়ে গেছে। বেশি খেয়ে আর সেই অনুপাতে কাজ না করে শরীর কাহিল, হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুস দুর্বল, ঠিকমত কাজ করতে চাইছে না এখন যন্ত্রগুলো। চোখ দুটো

টকটকে লাল হয়ে গেছে, জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে, হাপরের মত ওঠানামা করছে বুক। মুখ বিকৃত হয়ে গেছে। বোঝা যাচ্ছে, শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে তার।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত। সঙ্গে কম্পাস বা পথ দেখাবার অন্য কোন যন্ত্র নেই, তবু সহজেই অনুসরণ করতে পারছে ওরা ট্রাক্টরটাকে। কারণ, একটা ভুল করেছে গার্নেভ। রোল্টার কথা ভুলে গিয়েছিল সে।

কুকুরে টানা স্লেজটার পাশে পাশে ছুটে চলে গিয়েছিল রোল্টা, কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই ফিরে এসেছে আবার। যেই বুঝে গেছে ওর মনিব ট্রাক্টরের সঙ্গে যাচ্ছে না ফিরে এসেছে সে, বরফের দেশে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে।

কঠিন বরফে ট্রাক্টরের চাকার অস্পষ্ট দাগ অন্ধকারে ঠিকই অনুসরণ করছে রোল্টা। কখনও লাফিয়ে ছুটে গিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে সামনের অন্ধকারে, পরের মিনিটেই ফিরে আসছে আবার। কখনও ফিরে না এসে ওখানে থেকেই নেকড়ের হাঁক ছাড়ছে, শব্দ লক্ষ্য করে এগোচ্ছে অভিযাত্রীরা। কখনও বা আবার তাদের পাশে পাশে এগিয়ে যাচ্ছে কুকুরটা।

ভোর রাত তিনটে নাগাদ চলতে চলতে আচমকা দাঁড়িয়ে পড়ল রোল্টা। কান খাড়া করে কি যেন শোনার চেষ্টা করছে। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে মনিবের দিকে চেয়ে মৃদু ডাক ছাড়ল। পরক্ষণেই ছুটে হারিয়ে গেল সামনের অন্ধকারে। ফিরে এল আধ মিনিট পরেই।

কুকুরটাকে অনুসরণ করে একটু বাঁয়ে ফিরল অভিযাত্রীরা। মিনিট তিনেক পরেই পৌঁছে গেল ওখানে। কুকুরে টানা স্লেজটা পড়ে আছে। ওটার পাশেই কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে দুটো কুকুর। মুখ পেটের ভেতরে গুঁজে, লেজ মাথার ওপর ফেলে তুষার ঝড়ের আক্রমণ থেকে যেন আত্মরক্ষা করতে চাইছে।

ঠাণ্ডার দেশের কুকুর। প্রয়োজনের তাগিদে প্রাকৃতিক নিয়মেই মোটা হয়ে গেছে ওদের চামড়া, ঘন লম্বা রোমে ঢাকা পড়েছে শরীর। শূন্যের নিচে চল্লিশ ডিগ্রী ঠাণ্ডা ওরা অনায়াসেই সইতে পারে। মানুষ দেখেই অভ্যাসবশত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কুকুর দুটো। এগিয়ে গেল ব্যারি। কিন্তু স্বাধীনতা কার না কাম্য? ফিতের বাঁধন আর নেই ওদের গলায়। মানুষের কাছে আর পরাধীন থাকার কোন দরকার নেই। চোখের পলকে লাফিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল ওরা। রোল্টা পেছনে যাবার জন্যে ছুটতে শুরু করেছিল, ডেকে ওকে ফিরিয়ে আনল ব্যারি।

ভাবল রানা, কুকুর নেই, কিন্তু স্লেজটা তো পাওয়া গেল, তাই বা কম কি? এখান পর্যন্ত এসে নিশ্চয় ভেবেছে গার্নেভ, খামোকা কুকুরের স্লেজটা টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ নেই, ওটা শুধু বাড়তি বোঝা। এতটা পথ পায়ে হেঁটে এসে হাজির হতে পারবে না মৃত্যুর মুখে ফেলে আসা সাতজন লোক। তাই স্লেজটা খুলে ফেলে রেখে গেছে সে। কুকুরগুলোকেও ছেড়ে দিয়েছে। তবে এটা বাড়তি সতর্কতা।

স্লেজের পাশেই পাওয়া গেল চুম্বক-কম্পাসটা। ভাঙা। এটার দরকার নেই নিখারেভের। তার বন্ধুদের সঙ্গে রেডিও যোগাযোগ করেই পথ নির্দেশ পাচ্ছে সে। ইচ্ছে করেই কম্পাসটা ভেঙে ফেলে রেখে গেছে। হয়তো ভেবেছে, যদি কোন

উপায়ে এখানে এসে হাজির হতে পারে রানা।… নিষ্ঠুর রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় এটা।

রানার মনের ভেতর পুষে রাখা তীব্র ঘৃণা আর রাগ আবার মাথা চাড়া দিল। নিশপিশ করে উঠল দুই হাতের আঙুলগুলো।

মার্থাকে বরফের ওপর নামিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে ব্যারি ইতোমধ্যেই। স্লেজটাকে টেনে নিয়ে যাবার উপযোগী করে তুলছে। কুকুরের গলায় জোতার জন্যে স্লেজে লাগানো ফিতেগুলো কেটে রেখে যাওয়া হয়েছে, ওগুলো গিঁট দিয়ে দিয়ে জোড়া লাগাল আবার। ওরা টেনে নিয়ে যেতে পারবে এবারে গাড়িটাকে। তিনজন লোককে কাঁধে বয়ে নেয়ার চাইতে স্লেজে করে টেনে নেয়া অনেক সহজ।

একে একে স্লেজের পাতলা কাঠের পাটাতনে শুইয়ে দেয়া হলো সুসান আর ব্রিমনকে। একপাশে কুঁজো হয়ে ঝুঁকে বসল মার্থা। রানা, ব্যারি আর ডেরেক, তিনজনে তিনটে দড়ি তুলে নিয়ে টান দিল। সহজেই এগোল স্লেজ। তিনজনের জন্যে এটা এক বিরাট স্বস্তির ব্যাপার।

আবার শুরু হলো চলা। তুষারে ঢাকা পিচ্ছিল মসৃণ পথ। হড় হড় করে এগোচ্ছে স্লেজ। ভেবেছিল রানা, চলার গতি বাড়বে, কিন্তু ভুল। ঝড়ের গতি বাড়তে বাড়তে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে, প্রচণ্ড গতিতে দিগ্বিদিক্ উড়ছে বরফ-কুচি। টর্চের আলো সামনে মাত্র কয়েক হাত দূরে পৌঁছচ্ছে, কিন্তু তবু আবছা দেখা যাচ্ছে সামনের পথ, উড়ন্ত বরফের জন্যে। ভয়ঙ্কর গতিতে পিঠে আঘাত হানছে বাতাস। ছিটকে পড়তে পড়তে প্রায়ই একে অন্যকে জড়িয়ে ধরে টাল সামলাচ্ছে। কিন্তু এভাবে আর কতক্ষণ?

স্লেজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে প্রাণপণ চেষ্টা চালাচ্ছে ম্যাক্সওয়েল, কিন্তু পেরে উঠছে না। বার বারই পিছিয়ে পড়ছে সে। স্লেজে উঠে বসতে বলল তাকে রানা। কিন্তু কিছুতেই উঠল না ম্যাক্সওয়েল। এই বিপদের সময়ে ক্ষুদ্রতা ও স্বার্থপরতা উধাও হয়ে গেছে তার চরিত্র থেকে।

আচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলেছে রানা। কোনরকম বোধশক্তিই যেন নেই। চোখ দুটো আধবোজা, জোর করে টেনে খুলে রাখতে হচ্ছে চোখের পাতা। পায়ে কোনরকম সাড়া নেই। জমাট বরফ যেন। কিছুতেই তাড়াতে পারছে না ঘুম ঘুম ভাবটা…

কাঁধে জোর ঝাঁকুনি আর গালে চটাস চটাস চড় খেয়ে ঘুম ভাঙল রানার। নিজের অজান্তেই হাঁটু মুড়ে কখন বসে পড়েছিল। জোর করে তার আচ্ছন্ন ভাবটা তাড়ানোর চেষ্টা করছে ব্যারি। 'ওঠো রানা…উঠে পড়ো…দাঁড়াও…'

আর কয়েক সেকেন্ড এভাবে আচ্ছন্নের মত বসে থাকলে আর কোনদিনই উঠতে পারবে না। কোনমতে পায়ের ওপর দেহটাকে খাড়া করল রানা আবার। এগোল সামনে।

তুমুল হয়ে উঠেছে ঝড়। পাগল হয়ে গেছে যেন বরফ কণাগুলো। কোন একদিকে নির্দিষ্ট নেই বাতাসের গতি। এলোপাতাড়ি যেদিক থেকে খুশি ছুটে এসে

ঝাপটা মারছে পায়ে। ছিটকে ফেলছে একেকজনকে কঠিন বরফের ওপর।

রানার একেবারে গা ঘেঁষে হাঁটছে ব্যারি। কানের কাছে মুখ এনে বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এবার থামতে হবে! ঝড় না কমা পর্যন্ত আর চলা অসম্ভব!'

'কিন্তু এখানে···,' প্রতিবাদ করল রানা।

'···এখানে নয়, আমার সঙ্গে এসো,' বলে সামান্য বাঁয়ে মোড় নিয়ে চলল ব্যারি।

কয়েক গজ দূরেই তুষার জমে জমে একটা বরফ-স্তূপের সৃষ্টি হয়েছে। ওটার কাছে এসেই থামল ব্যারি। বলল, 'ঢালুর দিকে নামছি আমরা, বরফের এমনি ছোটখাট টিলা প্রায়ই দেখবে এখন থেকে।'

পুরোপুরি না হলেও একেবারে নিরাশ করল না বরফের স্তূপ। ঝড়ের আক্রমণ থেকে খানিকটা রেহাই পেল ওরা। স্লেজটাকে টিলার গা ঘেঁষে রেখে ওটার একধারে বসে পড়ল তিনজনে। এই সময়ই ব্যাপারটা খেয়াল করল রানা। আচমকা লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে টর্চের আলো ফেলে উত্তেজিতভাবে কি যেন খুঁজতে শুরু করল।

'কি হলো?' বসে থেকেই জানতে চাইল ব্যারি।

'সিনেটর!' উদ্বিগ্ন শোনাচ্ছে রানার কণ্ঠ। 'সিনেটর ম্যাক্সওয়েল কোথায়?'

'তাই তো!' লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল ডেরেক।

উঠে পড়ল ব্যারিও। তিনজনেই টর্চ জ্বেলে খুঁজল। কিন্তু সিনেটরের চিহ্নও নেই।

'আসছি,' ব্যারিকে বলল রানা। 'সিনেটর পথ হারিয়েছে বোধহয়। দেখি, খুঁজে নিয়ে আসি ওকে।'

'না!' চাবুকের মত শোনাল এস্কিমোর গলা। রানার কাঁধ চেপে ধরেছে। জোর করলে বল প্রয়োগ করবে সে। 'এক পা এগোবে না! তাহলে তোমাকেও হারাব! রোল্টা! রোল্টা!' কুকুরটাকে ডাকল ব্যারি।

স্লেজের একপাশ থেকে লাফিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল রোল্টা। এস্কিমো ভাষায় চেঁচিয়ে কিছু বলল ব্যারি। কি বুঝল কে জানে, কিন্তু চোখের পলকে বড় বড় লাফ মেরে অন্ধকারে হারিয়ে গেল প্রকাণ্ড সাইবেরীয় কুকুরটা। ফিরে এল দুই মিনিট পরেই।

ব্যারির পায়ের কাছে এসে অদ্ভুত স্বরে একটা ডাক ছাড়ল রোল্টা।

'পেয়েছে?' জানতে চাইল রানা।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল এস্কিমো।

'চলো, যাই তাহলে। নিয়ে আসি। দেরি করলে মারা যাবে লোকটা।'

সিনেটরের কাছে রানা আর ব্যারিকে পৌঁছে দিল রোল্টা। কিন্তু আর আনতে পারা গেল না। যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানেই ফেলে আসতে হলো ম্যাক্সওয়েলকে। ইতোমধ্যেই তুষারের প্রলেপ জমে গেছে হাত-পা ছড়িয়ে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটার গায়ে। আর বড়জোর আধঘণ্টা, তারপরই একেবারে

কবর হয়ে যাবে তার। চিরদিনের জন্যে ঢেকে দেবে তাকে তুষার। চিরকালের জন্যেই হারিয়ে গেল মানুষটা বরফের দেশে।

তুষার-টিলার ধারে স্লেজের গা ঘেঁষে যেন সেই অনাদিকাল থেকে বসে রয়েছে ওরা তিনজন। স্লেজের পাটাতনে শোয়া দু'জন মুমূর্ষু অজ্ঞান মানুষ, তাদের পাশে দুই হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে একটি আহত মেয়ে।

রানার গা ঘেঁষে এসেছে রোল্টা। মানুষের গায়ের উত্তাপ পাবার আশায়।

রানা আর ডেরেকের মাঝখানে বসেছে ব্যারি। হুঁশিয়ার, সতর্ক। রানা, ডেরেক আর মার্থাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।

বারবার ঢুলে পড়ছে রানা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এস্কিমোর কনুইয়ের তীব্র খোঁচা খেয়ে ধড়মড়িয়ে সোজা হচ্ছে। এমনি করে কত কাল যেন কেটে গেল। এই বসে থাকার যেন শেষ নেই।

ঠিক কতক্ষণ পর বলতে পারবে না রানা, ব্যারির আরেক খোঁচা খেয়ে সোজা হয়ে বসল সে। কানের কাছে শুনতে পেল এস্কিমোর কণ্ঠ, 'ঝড় কমে গেছে, রানা।'

ঝড় কমে গেছে!—চমকে চোখ মেলল রানা। চাইল। অন্ধকারে দেখা গেল না কিছুই। টের পেল, আগের মত কানের পর্দায় আর বাড়ি মারছে না ঝড়ো বাতাসের ভোঁতা গর্জন। ধীরে ধীরে পারকার পকেটে হাত ঢোকাল। আছে। অভ্যাসমত নিজের অজান্তেই টর্চটা ঢুকিয়ে রেখেছে পকেটে। বের করে এনে জ্বেলে ঘড়ি দেখল। ভোর চারটে।

টর্চের আলো অন্যদের ওপর একবার বুলিয়ে আনল রানা।

স্থির বসে রয়েছে ব্যারি। নীল চোখ দুটো পুরোপুরি মেলা। একমুহূর্তের জন্যেও ঘুমোয়নি সে। রানা, ডেরেক কিংবা মার্থাকেও ঘুমোতে দেয়নি। থরথর করে কাঁপছে বিশালদেহী মুষ্টিযোদ্ধা। কিন্তু রানার টর্চের আলো চোখে পড়তেই হাসল। বেঁচে আছে ওরা, এই আনন্দেই হয়তো।

উঠল রানা। শরাফী আর সুসান বেঁচে আছে কিনা পরীক্ষা করে দেখবে। স্লেজে উঠে এল সে।

স্লেজের একপ্রান্তে সরে বসে রানাকে জায়গা করে দিল মার্থা। বয়েস কম, দেহে প্রাণপ্রাচুর্যের অভাব নেই। শুধু এই জন্যেই টিকে আছে সে এখনও। কিন্তু মিসেস ডুলানীর মৃত্যুর পর আশ্চর্য রকম নির্বাক আর স্থির হয়ে পড়েছে সে। চেহারায় কোনরকম ভাবান্তর নেই। বিরূপ প্রকৃতির কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ করেছে। যা হয় হোক, এই রকম ভাব।

ব্রিমনের গায়ে হাত রাখল রানা। বরফের মত ঠাণ্ডা।

'কি ব্যাপার?' জানতে চাইল ডেরেক। 'বেঁচে আছেন তো?'

'জানি না,' ক্লান্ত কণ্ঠে বলল রানা।

'মন খারাপ করবেন না,' প্রবোধ দেবার মত করে বলল ডেরেক। 'এর বেশি আর কি করতে পারতেন আপনি?'

'হুঁ,' ব্রিমনের নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল রানা। পনেরো সেকেন্ড একভাবে নাকের কাছে ধরে রাখল হাত। তারপর সরিয়ে আনতে আনতে বলল, 'এখনও আছেন। তবে যে-কোন মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। খুব বেশি হলে আর বারো ঘণ্টা।'

'আমার জন্যে ক'ঘণ্টা বরাদ্দ করেছ, ডার্লিং?' মৃদু ফিসফিসে কণ্ঠস্বর।

চমকে উঠে সুসানের দিকে তাকাল রানা। আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেছে অভিনেত্রীর। রানার টর্চের আলোর দিকে তাকিয়ে হাসলেন। হাসি মানে বন্ধ দুই ঠোঁটের সামান্য একটু বিস্তার। কিন্তু আশ্চর্য! এতেই চমৎকার প্রকাশ পেল হাসিটা।

'দারুণ, ডার্লিং, দারুণ!' দ্রুত গিয়ে সুসানের পাশে বসে পড়ল রানা। অভিনেত্রীর এক হাতের দস্তানা খুলে নিয়ে হাত ডলতে শুরু করল। 'মরা সৈনিকের অভিনয় করছিলেন নাকি? লোকের কাঁধে ওঠার জন্যে?' অনেকক্ষণ পর এই হাসল রানা।

'অন্যের ওপর দিয়ে চালিয়ে দিতে পারলে নিজে কষ্ট করব কোন্ দুঃখে?' কণ্ঠস্বরে হালকা আমেজের ঝিলিক, পরক্ষণেই মুখের ভাব বদলে গেল তাঁর। 'আমাকে ধাপ্পা দিয়ো না, রানা। ঠিক করে বলো আর কতক্ষণ আছি।'

'অ্যাডেলফির মঞ্চে এখনও আরও হাজার বার উঠতে পারবেন,' সুসানের অন্য হাতের দস্তানাও খুলতে শুরু করল রানা। 'আচ্ছন্ন ভাবটা যে আপনাআপনি কেটে গেছে আপনার, এটাই আশ্চর্য। খুবই ভাল লক্ষণ!'

'একবার এক রানীর ভূমিকায় অভিনয় করেছিলাম, মনে পড়ছে··· সে-ও মৃত্যুর আগে কয়েকটা নাটকীয় কথা বলার জন্যেই শুধু জ্ঞান ফিরে পেয়েছিল। আমার কিন্তু সেরকম নাটকীয় কিছু মনে আসছে না,' আবার হাসলেন অভিনেত্রী। মুখের ওপর আলো নেই, হাসিটা দেখতে পেল না রানা, কিন্তু কণ্ঠস্বরেই বুঝতে পারল। 'দারুণ মিথ্যেবাদী তুমি, রানা। সত্যি কথা বলতে এত আপত্তি কেন?···আমি জিজ্ঞেস করছি, কোন আশা আছে কিনা।'

'বললাম তো, আছে,' বলল বটে, কিন্তু কেন যেন ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না রানা নিজেই। এইসব কথাবার্তা আর ভাল লাগছে না, তাই প্রসঙ্গ পাল্টাল। 'আমরা উপকূলে ঠিকমত পৌঁছুতে পারব কিনা সন্দেহ আছে। তবে···' কেউ কোন কথা বলল না। আবার বলল রানা, 'তবে আশা একেবারে ছাড়তে পারছি না। উপকূলের আরেকটু কাছাকাছি পৌঁছুতে পারলেই কোন প্লেন দেখে ফেলতে পারে আমাদের। উপকূল এখান থেকে মাত্র বিশ মাইলের মত হবে। সিত্রোঁটাকে যদি পাই···'

'মাত্র!' বলে উঠল ডেরেক। 'বিশ মাইলকে মাত্র বলছেন আপনি! একটা স্লেজকে টেনে নিয়ে এই খালি পেটে ঝড়ের মাঝে···।'

'আর বেশিক্ষণ থাকবে না ঝড়,' বাধা দিয়ে বলল ব্যারি। 'এখনই তো অনেক কমে গেছে। এই ঝড় বেশিক্ষণ থাকে না। আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যেই একেবারে পরিষ্কার হয়ে যেতে পারে আবহাওয়া।'

ব্যারির শেষ কথাগুলো ডেরেকের কানে ঢুকল কিনা বোঝা গেল না। রানা আর সুসানের দিকে তাকিয়ে আছে সে। বলল, 'দিদিমণি বোধহয় আবার জ্ঞান হারালেন, না রানা?'

'হ্যাঁ,' মালিশ বন্ধ করে সুসানের হাতে আবার দস্তানা পরাচ্ছে রানা।

স্লেজ থেকে নেমে এল রানা। ডেরেকের সামনে বসে পড়তে পড়তে বলল, 'দেখি, আপনার হাত দুটো দেখি।'

'দেখে আর কি করবেন?' বলতে বলতে দু'হাত সামনে ছড়িয়ে দিল ডেরেক।

টর্চের আলোয় ডেরেকের ছড়ানো হাতের দিকে তাকাল রানা। দেখল।

ডেরেকও দেখল নিজের হাত। হাসল। 'চমৎকার, না!'

'চমৎকারই!' গম্ভীর হয়ে উঠেছে রানা। ফ্রস্টবাইটের আক্রমণে এর চেয়ে খারাপ অবস্থা আগে দেখেনি রানা। আঙুল আর হাতের দুই পিঠের চামড়া বলতে কিছু নেই, সবই খেয়ে ফেলেছে তুষার। বেশির ভাগ কোষই নষ্ট হয়ে গেছে চিরকালের জন্যে। সাদাটে হলুদ রঙ।

'দস্তানার ব্যাপারে একটু অবহেলা করে ফেলেছি,' হাত দুটোর কাছে ক্ষমা চাইছে যেন ডেরেক। 'আসলে মাইল পাঁচেক আগেই হারিয়ে ফেলেছি ও দুটো। তখন অবশ্য খেয়াল করিনি, ঠাণ্ডায় জমে গেছে তো হাত।'

'এখন সাড়া আছে হাতে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একটু একটু আছে। ব্যথা করছে।' ক্ষতবিক্ষত হাতের দিকে আরেকবার তাকাল ডেরেক, তারপর মুখ তুলল, 'রানা, হাত দুটো কেটে বাদ দিতে হবে নাকি?'

'আমি ডাক্তার নই। কি করে বলি...' ডেরেকের হাতের অবস্থা খুবই শোচনীয় বুঝতে ডাক্তার হবার দরকার নেই, জানে রানা। 'তবে মনে হয়, অতটা খারাপ হয়নি।'

'কি মনে হয়? লড়াই করতে পারব আর?'

'আমি ডাক্তার নই, বলেইছি তো।'

'আরে বাবা, একটা ধারণা আছে না?'

'তোমারও তো ধারণা আছে, তুমিই বলো না। কিন্তু এত চাপাচাপি করছ কেন? ধরো লড়াই আর করতে পারলে না, তাহলে?'

একটু নীরবতা। ভাবছে ডেরেক। তারপর শান্তকণ্ঠে বলল, 'নিঃসন্দেহ হতে পারলে ভাল হত।'

'কেন?'

'নিউ জার্সির ক্লেটন প্লাস্টিক কোম্পানি নতুন মনিব পেয়ে যেত তাহলে, এই আর কি। তাছাড়া ওই লড়াইয়ের ব্যাপারটা আজকাল বড় বেশি নোংরা হয়ে পড়েছে,' নিজেকেই যেন প্রবোধ দিচ্ছে ডেরেক। তবে কণ্ঠস্বরে অনুশোচনা বা হতাশার চিহ্নমাত্র নেই। হঠাৎই কি মনে পড়ে যাওয়াতে প্রসঙ্গ পাল্টাল। ব্যারির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কুকুরটাকে কোথায় পাঠালেন যেন একটু আগে? ফিরছে না কেন?'

'দেখা দরকার,' বলল ব্যারি। রানার দিকে ফিরে বলল, 'বেশিক্ষণ লাগবে না, আসছি আমি,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল সে। টর্চের আলোয় পথ দেখে দেখে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

কয়েক মিনিট পরেই রোল্টাকে নিয়ে ফিরে এল ব্যারি। উত্তেজিতভাবে রানাকে বলল, 'এসো আমার সঙ্গে।'

রোল্টা আর ব্যারির সঙ্গে চলে একশো গজ দূরে এসে দাঁড়াল রানা।

নেমে যাওয়া ঢালের এক জায়গায় আলো ফেলে রানার দৃষ্টি আকর্ষণ করল ব্যারি। আঙুল তুলে দেখাল।

এগিয়ে গিয়ে বসে পড়ল রানা। টর্চের আলোয় ভাল করে দেখল। খানিকটা জায়গায় বরফের রঙ কালচে, ছোপ ছোপ হালকা দাগ।

'ইঞ্জিনের তেলের মতই মনে হচ্ছে, না?' নিজেকেই যেন প্রশ্ন করল রানা।

'এবং রেডিয়েটর থেকে চুইয়ে পড়া কেমিক্যাল মেশানো পানি,' সায় দিয়ে বলল ব্যারি। হাতের টর্চটা ঘুরিয়ে অল্প দূরে আরেকটা জায়গা দেখাল, 'চাকা ঘষটানোর হালকা দাগ, দেখতে পাচ্ছ?'

'অল্প আগে হয়েছে এই দাগ,' বলল রানা। 'ঝড়ের শেষ দিকে সম্ভবত। এখনও দাগটাকে ঢেকে ফেলতে পারেনি তুষার।'

'আমারও তাই ধারণা। তেল জমেছে···তার মানে এখানে বেশ কিছুক্ষণ থেমেছিল ওরা।'

'ইঞ্জিনে গোলমাল হয়েছে কিনা, কে জানে।' অনিশ্চিত শোনাল রানার গলা।

'বরফ সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই ওদের। অন্ধের মত ট্রাক্টর চালাচ্ছে নিখারেভ। যদি কোনমতে ইঞ্জিনটা এখন বিগড়ে যায়···' ইঙ্গিতে বাকিটুকু শেষ করল ব্যারি।

'আবার চালু করা একেবারে অসম্ভব, এই বলতে চাইছ তো?'

'হ্যাঁ, ওদের জন্যে।'

ঠিকই বলেছে ব্যারি। ইঞ্জিন কিংবা ট্রাক্টর সম্পর্কে একেবারেই আনাড়ি নিখারেভ। ইস্, কি ভুল করেছে রানা! এখন মনে পড়ছে তার, ট্রাক্টর চালানোর ব্যাপারে কেন এত আগ্রহ দেখিয়েছিল খুনীটা। আসলে ট্রাক্টর ড্রাইভিং জানতই না সে আগে, শিখে নিয়েছে রানার পাশে থেকে।

'ঝড়ের তাড়া খেয়ে টিলার পাশে আশ্রয় নিয়ে ভুলই করেছি,' বলল রানা। 'নইলে ওদের ওপর এসে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়তাম।'

'মনে হয় না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল ব্যারি। 'না থামলে আমরা ওদের পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে চলে যেতাম।'

'কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ তো শুনতে পেতাম?'

'তা-ও মনে হয় না। কি জোর শব্দ তুলেছিল বাতাস, খেয়াল নেই?'

'না, তেমন মনে পড়ছে না···আচ্ছন্নের···' হঠাৎই কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় থেমে গেল রানা। ব্যারির দিকে তাকাল, 'তুমি তো একমুহূর্তও ঘুমোওনি ঝড়ের সময়, তাই না, রিক?'

'না,' মাথা নাড়াল ব্যারি। 'ঘুমোইনি। কেন?'
'কতক্ষণ বসেছিলাম আমরা টিলাটার পাশে, অনুমান করতে পারবে?'
'আধ ঘণ্টা।'
'কিংবা তার কিছু বেশি?'
'হ্যাঁ, কিছু বেশি হতে পারে।'
'ঝড়ের সময় ওরা থেমেছিল এখানে। বাতাসের বেগ কমলে পরে রওনা দিয়েছে। তার মানে এক মাইলও যেতে পারেনি ওরা।··· রিক, এখানে তো প্রায়ই টিলাটক্কর দেখছি···খাদ থাকতে পারে?'
'পারে,' একটু অবাক হয়েই রানার দিকে তাকাল এস্কিমো।
'তাহলে আটকেও তো যেতে পারে ওরা···' বলেই আর দাঁড়াল না রানা। ঘুরেই হাঁটতে শুরু করল। চলতে চলতেই বলল, 'জলদি, আমাদের রওনা হতে হবে, রিক।'
স্লেজের পাশে অপেক্ষা করছে ডেরেক। তার পাশেই দাঁড়িয়ে মার্থা। স্লেজ থেকে নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করার চেষ্টা করছে। শরীর গরম করতে চাইছে।
মার্থার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল রানা, 'কেমন লাগছে এখন, মার্থা?'
'একটু ভাল,' কিন্তু কণ্ঠস্বরে ভাল ভাব প্রকাশ পেল না মেয়েটার।
'হাঁটতে পারবে?'
'পারব মনে হয়,' অনিশ্চিত শোনাল মার্থার গলা।
'বেশ,' বলেই স্লেজের একটা দড়ি তুলে নিল রানা।
এগিয়ে গিয়ে ডেরেক আর ব্যারিও স্লেজের দড়ি তুলে নিল। আবার চলল ওরা।
বলল বটে পারবে, কিন্তু কয়েক গজ যাওয়ার পরই বুঝল রানা, পারবে না মার্থা। বারবার হোঁচট খাচ্ছে, টলে পড়ে যাচ্ছে। ওকে এভাবে হাঁটিয়ে নিলে বিপদ তো হবেই, দেরিও হয়ে যাবে। তাই আবার মেয়েটাকে স্লেজে উঠে বসার নির্দেশ দিল সে।
ইচ্ছে থাকলেও গতিবেগ বাড়ানো যাচ্ছে না। ক্ষুধার্ত ওরা, ভয়ানক ক্লান্ত। কিন্তু তবু ছুটতে চাইছে জোর করে। শরীর তো বাধা দিচ্ছেই, প্রকৃতিও যেন বাধা দেয়ার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। যত এগোচ্ছে, উঁচুনিচু টিলাটক্কর বাড়ছেই। বার বার বাধা পেয়ে থেমে যেতে হচ্ছে।
একটা টিলার ধার ঘেঁষে যাবার সময় আচমকা স্লেজের একপাশ ধাক্কা খেল টিলার গায়ে। কাত হয়ে গেল স্লেজ। গড়িয়ে বরফের ওপর পড়ে গেলেন ব্রিমন আর সুসান। হুমড়ি খেয়ে ওদের ওপরই পড়ল মার্থা। ভাঙা হাড়ে চোট লাগায় ককিয়ে উঠল।
তাড়াতাড়ি আবার সোজা করা হলো স্লেজ। সুসান আর ব্রিমনকে আবার শুইয়ে দেয়া হলো। মার্থাকে তুলে ধরে বসিয়ে দেয়া হলো স্লেজে।
'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা।' লজ্জিতভাবে মাথা নিচু করে রেখেছে মেয়েটা।
'বরং আমরাই দুঃখিত,' বলল রানা। 'স্লেজ উল্টে গেছে, তুমি কি করবে?

জায়গাটাই বড্ড উঁচুনিচু।'

আর তাড়াহুড়ো করল না রানা। আরেকবার এমন হলেই স্লেজে করে লাশ টেনে নিয়ে যেতে হবে।

সহজে টর্চ জ্বালছে না ওরা এখন। ব্যাটারি কমে গেছে। সবার সামনে রয়েছে ডেরেক। দড়ি ধরে টানতে টানতে মাঝে মাঝে সামনের পথের ওপর টর্চের আলো ফেলছে সে। ম্লান আলোয় চাকার দাগ দেখার চেষ্টা করছে।

আস্তে আস্তে অস্পষ্ট হয়ে আসছে দাগ। ঝড়ের গতি কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতও কমে গেছে। আলগা তুষারের পরিমাণ কমে যাওয়ায় চাকার দাগ আর তেমন দেখা যাচ্ছে না, আরও কয়েকশো গজ এগিয়ে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে এল দাগ। বুঝল রানা, আর এভাবে ছোটার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই। নিশ্চয় এতক্ষণে ওদের কাছ থেকে তিন-চার মাইল দূরে চলে গেছে ট্রাক্টর।

রানার যুক্তির সঙ্গে একমত হলো ব্যারি। এভাবে ট্রাক্টরের পিছু ছুটে মৃত্যুকে আরও কাছে টেনে আনার কোন অর্থই হয় না।

তবে চলা বন্ধ করল না ওরা। গতি কমিয়ে দিয়েছে, নৌকার গুণ টানার মত করে পিঠ বাঁকিয়ে আস্তে আস্তে স্লেজটাকে টেনে নিয়ে এগিয়ে চলল। কারও মুখে কথা নেই। মাথা নিচু করে ভাবতে ভাবতে পা ফেলছে শুধু। যন্ত্র যেন ওরা, রোবট।

আট

হিমবাহে পৌঁছে গেছে ওরা।

ব্যারির কথাই ঠিক। ঝড় একেবারে থেমে গেছে। বাতাসের নামগন্ধও নেই। তুষারপাত একেবারে বন্ধ। ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গেই অদৃশ্য হয়েছে আকাশ বোঝাই কালো মেঘের রাশি। কালো আকাশে উঁকিঝুঁকি দিতে শুরু করেছে চকমকে উজ্জ্বল তারা। কিন্তু ভীষণ ঠাণ্ডা। বাতাস থেমে যাওয়ায় বাড়ছে শীত। ব্যারি অনুমান করল শূন্যের বেশ কয়েক ডিগ্রী নিচে রয়েছে এখন তাপমাত্রা। নামছে, আরও নামবে।

সকাল আটটা বাজে। টিলার কাছ থেকে চলার পর এখন তিন ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে মাইল ছয়েক পথ পাড়ি দিয়েছে ওরা। আকাশের অবস্থাও ভাল। পায়ের তলায় বরফের অবস্থা ভাল হলে এটাকে শুভ লক্ষণই বলা যেত।

কাঙ্গালাক হিমবাহের ভেতরে ঢুকে পড়েছে ওরা। পায়ের তলায় আরও এবড়োখেবড়ো অসমতল হয়ে উঠেছে বরফ। তবে টিলাটক্করের পরিমাণ কমেছে। কিন্তু তাতে তেমন সুবিধে হচ্ছে না। এবড়োখেবড়ো বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ টেনে নেয়া ভীষণ কঠিন।

হিমবাহের ওপরটা সাধারণত মসৃণ থাকে না। আসলে থাকতে পারে না।

ধীরে ধীরে নেমে যাওয়া ঢালের বুকে জমাট লাভার মতই গড়িয়ে পড়া আলগা তুষার জমতে জমতে এই এবড়োখেবড়ো অবস্থার সৃষ্টি করে। কাঙ্গালাকও তার ব্যতিক্রম নয়। আরও এগিয়ে বরফের বন্ধুর অবস্থা আরও বাড়ল। স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়া শেষে একেবারেই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। উপায় বাতলাল ব্যারি।

হিমবাহের প্রান্তগুলো মাঝখানের চেয়ে অপেক্ষাকৃত মসৃণ। যে-কোন প্রান্তে সরে গেলে স্লেজ টানা সহজ হবে। বাঁয়ে সরে এল ওরা। খুব একটা মসৃণ নয় এখানে বরফ, তবে স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়া যায়।

গ্লেসিয়ারে বরফের এই অমসৃণতা অসুবিধের সৃষ্টি করলেও মনে মনে কিন্তু খুশিই হলো রানা। এই পথে ট্রাক্টর চালাতে খুবই অসুবিধে হবে আনাড়ি নিখারেভের। দ্রুত এগোতে পারবে না।

ভাবতে ভাবতে পথ চলেছে রানা, ব্রিউস্টার আর তার স্নো-ফ্যালকন এখন কতদূরে? যদি ভিভেভি পেরিয়েই পশ্চিম মুখো রওনা হয় সে, এতক্ষণে উপকূলে পৌঁছে যাবার কথা। গতরাতের ভয়ঙ্কর তুষার ঝড় সামান্যতম গতি রোধ করতে পারবে না বরফে চলার উপযোগী আধুনিক ট্রাক্টরের। স্নো-ফ্যালকনের ইঞ্জিন তো বটেই, টায়ারগুলোও বিশেষভাবে তৈরি। বরফের ঢালে সদ্য ছড়িয়ে পড়া তুষার-ঢাকা পিচ্ছিল মারাত্মক পথেও বিন্দুমাত্র পিছলে যায় না ওই চাকা, অনায়াসে বরফ কামড়ে ধরে এগিয়ে যেতে পারে।

ট্রাইটন যেখানে আছে, জায়গাটা এখান থেকে কতদূরে হবে জানে না এখন রানা, তার কাছে কোন ম্যাপ নেই। ওদিকে যদি চলে যায় ব্রিউস্টার, তাহলে আর কোন আশা নেই। কিন্তু গোলমাল টের পেয়ে বুদ্ধি করে যদি কাঙ্গালাকের কাছাকাছি উপকূলে পৌঁছে উপকূল ঘেঁষে এগিয়ে যায় ট্রাইটনের দিকে, তাহলে নিশ্চয় সিত্রোঁটা নজরে পড়বে তার। আশাটা একেবারে নিরর্থক নয়। কারণ, নিশ্চয় সারাক্ষণ ট্রাইটন আর অন্যান্য জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে ব্রিউস্টার। রাশান সাবমেরিন কোথায় রয়েছে, অন্য জাহাজগুলোর এটা অনুমান করতে কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু অসম্ভব হবে না। প্রচুর আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকে ওই প্লেন ক্যারিয়ার আর ডেস্ট্রয়ারে।

জাহাজগুলোর কাছ থেকে খবর পেলে কাঙ্গালাকের দিকেই রওনা হবে ব্রিউস্টার, এতে কোন সন্দেহ নেই। কাঙ্গালাকের ওপারে পৌঁছে উপকূল ঘেঁষে চলবে। যদি তাই হয়, তাহলে এখন কোথায় আছে সে? অনুমান করল রানা, হয় ব্রিউস্টার তাদের উত্তরে কিংবা দক্ষিণে বিশ মাইল দূরে রয়েছে এখন, নয়তো সামনে পনেরো মাইলের মধ্যে রয়েছে। ইস্, যদি একটা রেডিও থাকত এখন। ব্রিউস্টার তাদের কাছ থেকে দু'তিন ঘণ্টার দূরত্বের মধ্যেই রয়েছে, এই চিন্তাটা অস্থির করে তুলল রানাকে। কিন্তু অস্থির হয়েও কোন লাভ নেই। সঙ্কেত কিংবা খবর পাঠানোর মত কিচ্ছু নেই তার কাছে।

আটটার একটু পরে থামল রানা। প্রথমেই অসুস্থ ব্রিমন আর সুসানকে দেখার জন্যে স্লেজে এসে উঠল। বাতাস নেই, প্রচণ্ড শ্বাসকষ্টের ফলে ব্রিমনের গলার ঘড়ঘড়ানি বেশ জোরেই শোনা যাচ্ছে। থেকে থেকেই গাছের পাতায় আচমকা

শিহরণ ওঠার মত করে কেঁপে উঠছে তাঁর দেহটা। আর বড়জোর তিন ঘণ্টা, দুপুর নাগাদ শেষ হয়ে যাবেন বিজ্ঞানী। শেষ পর্যন্ত বুঝি বরফের কবরেই ঠাঁই হবে হতভাগ্য মানুষটির। চোখের সামনে তিল তিল করে শেষ হয়ে যাচ্ছে একজন লোক, অথচ কিছুই করতে পারছে না রানা, রাগে-ক্ষোভে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো তার। নিজেকে বড় বেশি ছোট মনে হচ্ছে এখন।

সুসান গিলবার্টের অবস্থাও শোচনীয়—তাঁর 'রানী'র কাহিনীই যেন সত্যি হতে চলেছে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু কোনরকম ভাবান্তর নেই অভিনেত্রীর চেহারায়। শান্ত, স্থির। গভীর প্রশান্তিতে যেন বুজে রেখেছেন দুই চোখ। প্রচণ্ড ক্লান্তির পর ঘুমকে যেমন বরণ করে নেয় মানুষ, তেমনি যেন মৃত্যুকে বরণ করছেন তিনি। ব্রিমনের মত তাঁরও জীবন প্রদীপ নিভে যাবে আজ।

লাফিয়ে স্লেজ থেকে নেমে এল রানা। না, এভাবে মরতে দেয়া যায় না। শেষ চেষ্টা করে দেখবে সে। দরকার হলে নিজের প্রাণ দেবে, কিন্তু ওদের দু'জনকে এভাবে কিছুতেই মরতে দেবে না। যে করেই হোক, উপকূলে পৌঁছতে হবে তাকে।

ব্যারি আর ডেরেককে প্রায় ছুটিয়েই নিয়ে চলল রানা। ঢাল বেয়ে তীব্র গতিতে ছুটছে স্লেজ। লাফাচ্ছে ঝাঁপাচ্ছে, নাচছে, দোল খাচ্ছে, কিন্তু চলছে। একটানা জ্বালিয়ে রেখে রেখে কয়েক মিনিটেই ডেরেকের টর্চের অবশিষ্ট ব্যাটারি ফুরিয়ে গেল। অন্ধকার। ব্যারির টর্চ জ্বালা হলো এবারে। কিন্তু ওটার ব্যাটারিতেও শক্তি বেশি নেই। ম্লান আলোর শিখা ছড়িয়ে পড়ল বরফের ওপর। অন্ধকার তেমন কাটল না। কিন্তু থামল না ওরা।

রোল্টাকে কোলে তুলে চুমু খেতে ইচ্ছে করছে রানার। প্রায় প্রতি মুহূর্তেই প্রাণ বাঁচাচ্ছে ওদের প্রকাণ্ড কুকুরটা। তুষার-ফাটল আর বরফের এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে থাকা হাজারো বিপদ টের পেয়ে যাচ্ছে সে সহজাত প্রবৃত্তির বশে, সাবধান করছে ওদের আর এরই জন্যে এখনও টিকে রয়েছে ওরা। কম্পাসের কাজও ও-ই করছে। মনে মনে প্রার্থনা করছে রানা: খোদা, আর অল্প কিছুদূর। আর কয়েকটা মাইল ছুটে যাবার শক্তি দাও। কিন্তু ক্ষুধার্ত শরীরে আর কতক্ষণ? শেষ পর্যন্ত আর পারল না সে। তিনজনের মধ্যে সে-ই প্রথম হুমড়ি খেয়ে পড়ল বরফের ওপর। হাত থেকে ছুটে গেল স্লেজের ফিতে। ঢাল বেয়ে কয়েক গড়ান দিয়ে এসে একটা বিশাল কিছুতে ধাক্কা খেয়ে থামল তার দেহ।

কয়েক সেকেন্ড মড়ার মত উপুড় হয়ে পড়ে রইল রানা। ফিতে ছেড়ে দিয়ে ছুটে আসছে তার দিকে ব্যারি। ডেরেক স্লেজটাকে থামাতে ব্যস্ত। হঠাৎই মনে হলো রানার, বরফের গায়ে ধাক্কা খায়নি সে, অন্য কঠিন কিছুর গায়ে ধাক্কা খেয়েছে।

উপুড় হয়ে থেকেই মাথা তুলল রানা। ঘাড় কাত করে একপাশে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠে বসল। বরফের স্তূপ নয়, স্লেজের গায়ে ধাক্কা খেয়েছে সে। সিত্রোঁর সঙ্গে বাঁধা ছিল যে স্লেজটা।

পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ব্যারি। টর্চের ম্লান আলো ফেলেছে স্লেজের ওপর।

প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তিকে একত্রিত করে কোনমতে উঠে দাঁড়াল রানা।

বিশাল একটা তুষার স্তূপের গা ঘেঁষে কাত হয়ে পড়ে আছে স্লেজটা। বোঝা গেল, চলতে চলতে একপাশ থেকে আচমকা ওই বরফের টিলার সঙ্গে ধাক্কা খেয়েছে স্লেজ। সিত্রোঁর সঙ্গে বাঁধন ছিঁড়ে গেছে প্রচণ্ড টান লেগে। ভারী জিনিসটাকে আবার বাঁধার মত ক্ষমতা, সময় বা ইচ্ছা কোনটাই ছিল না গার্নেভের, কাজেই এটাকে এখানেই ফেলে রেখে গেছে।

নিজের টর্চও বের করল রানা। আলো ফেলে ফেলে দেখল। খাবার আর রেডিওটা ছাড়া স্লেজের সমস্ত মালপত্রই ফেলে গেছে গার্নেভ। সব জিনিস নেবার দরকার মনে করেনি।

আচমকা ব্যারিকে চমকে দিয়ে হো হো করে হেসে উঠল রানা।

টর্চের ম্লান আলো রানার মুখে ফেলল ব্যারি। পরক্ষণেই চটাস করে চড় কষাল। শঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'মে-জ-র!'

আচমকা থমকে গেল রানা। নিজের গালে হাত বুলাতে বুলাতে ভুরু কুঁচকে তাকাল ব্যারির দিকে। এস্কিমোর নীল দুই চোখের দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট উদ্বেগ দেখল, হাসল আবার। 'না, রিক, ভয়ের কিছু নেই। আমি পাগল হইনি।'

কিন্তু আশঙ্কা দূর হলো না ব্যারির চেহারা থেকে।

'খাবার আর রেডিও নেই,' ইঙ্গিতে স্লেজটা দেখাল রানা। 'কিন্তু অন্যান্য জিনিস সবই রয়েছে।'

হঠাৎই বুঝতে পারল ব্যারি ব্যাপারটা। অনেকক্ষণ পর এই প্রথম হাসির ঝিলিক দেখা গেল এস্কিমোর নীল চোখে। 'দুঃখিত, রানা! সত্যিই দুঃখিত আমি!'

স্লেজে ম্যাগনেশিয়াম আছে, আছে রেডিও সনডে বেলুন। আছে তাঁবু, দড়ি, কুড়ুল, কোদাল। গ্যাস ভরে ছেড়ে দিলে পাঁচ হাজার গজ শূন্যে উঠে যাবে বেতার-বেলুন, সঙ্কেত পাঠাতে শুরু করবে দিকে দিকে।

দেরি করল না রানা। টর্চ নিভে আসছে। এই আলো শেষ হয়ে যাবার আগেই কাজ সারতে হবে।

ডেরেকও কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর ক্ষতবিক্ষত হাতে দুটো টর্চই ধরিয়ে দিয়ে ব্যারিকে নিয়ে কাজে লাগল রানা। দ্রুত সিলিন্ডার থেকে গ্যাস ভরে নিল তিনটে বেলুনে। তিনটে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার নিয়ে তিনটে বেলুনের সঙ্গে বেঁধে ফেলল সরু তার দিয়ে। এমনিতে ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার ছুঁড়ে দিলে বেশি ওপরে উঠবে না। তাই বেলুনের সাহায্যে ওড়ানো স্থির করেছে রানা।

কাজটা সারতে মিনিট তিনেক ব্যয় হলো দু'জনের। ফ্লেয়ারের ফিউজে আগুন লাগিয়ে প্রথম বেলুনটা শূন্যে ওড়াল রানা। ওটা পাঁচশো ফুট ওঠার পরপরই দ্বিতীয়টাতে আগুন লাগিয়ে ছেড়ে দিল।

তীব্র নীলচে সাদা আলো ছড়াতে ছড়াতে আকাশে উঠে যাচ্ছে বেলুন দুটো। একটা আরেকটার চেয়ে কয়েকশো ফুট নিচে থেকে উঠছে। দেখতে দেখতে চার হাজার ফুট উঠে গেল প্রথম বেলুনটা। আরও উঠছে। দ্বিতীয়টা তার শ'ছয়েক ফুট নিচে রয়েছে।

ডেরেকের বিশাল একটা হাত এসে পড়ল রানার কাঁধে। 'ধন্যবাদ, রানা।' আর কিছুই বলতে পারল না মুক্তিযোদ্ধা। আবেগে বুজে এসেছে তার গলা।

'আমাকে না, ডেরেক,' তীব্র আলোর উৎসের দিকে চেয়ে আছে রানা। 'ওই ওগুলোকে ধন্যবাদ দাও। আশপাশে তিরিশ মাইলের মধ্যে থাকলে ওই আলো ব্রিউস্টারের চোখে পড়বেই।'

প্রথমটা থেমে গেল চার হাজার ফুটের কিছু বেশি ওপরে উঠে। দ্বিতীয়টা ওটাকে ছাড়িয়ে গেল, গ্যাস বোধহয় একটু বেশি ভরা হয়ে গেছে এটাতে। প্রায় একসঙ্গেই পুড়ে শেষ হলো দুটো ফ্লেয়ার। লাল আলো ছড়িয়ে দপ্ করে নিভে গেল। অন্ধকারকে আরও গাঢ় করে দিয়ে গেল। তবে যেভাবে জ্বলেছে, তিরিশ মাইলের মধ্যে ব্রিউস্টার তো বটেই, সাগর থেকে জাহাজগুলোর চোখেও পড়বে এ আলো।

'কিন্তু, মেজর···' হঠাৎই বলে উঠল ডেরেক। গম্ভীর। খুশি খুশি ভাবটা চলে গেছে তার গলা থেকে। 'গার্নেভও নিশ্চয় দেখেছে এই আলো···'

ডেরেকের মত রানারও মনে পড়ে গেল এখন কথাটা। উত্তেজনায় মনে হয়নি এতক্ষণ। হ্যাঁ, গার্নেভ আর নিখারেভও দেখেছে ওই আলো। ওদের বুঝতে অসুবিধে হবে না, এখান পর্যন্ত এসে হাজির হয়ে গেছে রানা আর অন্যান্যরা। তার মানে বরফ-ঝড়ে পড়ে মৃত্যু হয়নি প্রতিপক্ষের। শ্যারিন কিংবা টমকে জামিন রেখেও তেমন লাভ হবে না এখন। কাজেই···

ভেবে আর লাভ নেই এখন, যা হবার হয়ে গেছে। তৃতীয় বেলুনটাও আকাশে উড়িয়ে দিল রানা। ফ্লেয়ার এটাই শেষ। কিন্তু কোন কারণে গোলমাল করল ফ্লেয়ারটা। পাঁচশো ফুট উঠেই বিস্ফোরিত হয়ে গেল। আগুন ধরে গেল বেলুনে। জ্বলতে জ্বলতে দ্রুত নিচে নেমে এল ওটা।

ব্যারির কিন্তু সেদিকে খেয়াল নেই। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অন্যদিকে তাকিয়ে রয়েছে। বেলুনটা মাটিতে নেমে নিভে যেতেই অন্ধকারে রানার হাতে হাত রাখল সে। দক্ষিণ-পশ্চিমে নজর ফেরাল রানার।

বড়জোর পাঁচ মাইল দূরে, জ্বলতে জ্বলতে মাটিতে নামছে একটা লালচে আগুন। সিগন্যাল রকেট।

জীবনে এমন আনন্দের দৃশ্য কমই দেখেছে রানা। ধপাস করে বসে পড়ল সে।

ঠিক বিশ মিনিট পরেই দেখা গেল তীব্র সার্চ লাইটের আলো। ইঞ্জিনের গম্ভীর গর্জন শোনা যাচ্ছে। হিমবাহের ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটে আসছে আলোটা এদিকেই।

আরও দশ মিনিট পরে স্নো-ফ্যালকনের গরম কেবিনে ওদেরকে তুলে নিল কয়েকটা শক্তিশালী হাত।

হাস্যকর চেহারা ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টারের। লালচে ভরাট গাল আর ভোঁতা চিবুক খামচে ধরে ঝুলছে কয়েক গোছা ধূসর দাড়ি। হাসিখুশি আমুদে চেহারা, আত্মবিশ্বাসে ভরা। চোখের বাদামী মণিতে বুদ্ধির ঝিলিক। চেহারা খারাপ, কিন্তু প্রথম দর্শনেই ভাল লেগে যায় মানুষটাকে।

ব্র্যান্ডির গ্লাসে ধীরে ধীরে চুমুক দিচ্ছে রানা। অবাক হয়েই ওর দিকে তাকিয়ে আছে ব্রিউস্টার। রানার পরিচয় জেনে গেছে সে ইতোমধ্যেই—যদিও ভেবে পাচ্ছে না বিদেশী এক যুবক কেন এভাবে সাবমেরিন থেকে নেমে এসে নিজের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চেষ্টা করল এতগুলো প্রাণ রক্ষার? বিনিময়ে কিছুই চায় না, এ কেমন মানুষ! কেবিনে উজ্জ্বল আলো। রানার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, প্রায় সমস্ত মুখটাই ফ্রস্টবাইটের আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত, হলদে দগদগে ঘায়ের মত হয়ে আছে। রক্তাক্ত কালো কালো নখ, পেকে উঠছে। দেখে নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল ক্যাপ্টেন। কিন্তু কিছু বলল না। আশ্চর্য এক মানুষ! যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র আর খাবারের ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল ক্যাপ্টেন।

রানার মতই ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে ব্যারি আর ডেরেক। ওদের অবস্থাও রানার চেয়ে ভাল নয়, ডেরেকের অবস্থা বরং অনেক বেশি খারাপ।

ব্রিমন আর সুসানকে গরম প্যাডে ঢাকা দুটো স্লিপিং-বাংকে শুইয়ে দেয়া হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার জন্যে রান্নার ব্যবস্থাও হচ্ছে। কয়েক মিনিটেই হয়ে যাবে। সবকিছুর তদারকি সেরে ফিরে এল ক্যাপ্টেন।

'তা, মিস্টার রানা,' গলা খাঁকারি দিয়ে কথা শুরু করল ব্রিউস্টার। 'যার জন্যে এত কিছু, সেই জিনিসটা কোথায়? মানে ফরমুলাটার কথা জিজ্ঞেস করছি আমি। আর সিত্রোঁটা? নিশ্চয় নিয়ে পালিয়েছে গার্নেভ আর তার সঙ্গী?'

'ফরমুলাটা···আমার যা মনে হয়, আমাদের কারও সঙ্গেই নেই,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'ওটা না নিয়ে নিশ্চয়ই চলে যায়নি গার্নেভ।'

'ওটা তো প্রফেসর ব্রিমনের কাছেই থাকার কথা।'

'এখন নিশ্চয়ই নেই। বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছেন। জিজ্ঞেস করার সুযোগ পাইনি।'

'ও!' চিন্তিত দেখাল ব্রিউস্টারকে। 'যার জন্যে এত কিছু···সেই রাশানদের হাতেই পড়ল শেষ পর্যন্ত সেটা। আসলে কি বলব! লন্ডনের ওই হাঁদারামের দল···ওই হিংসুটে অহঙ্কারী প্রফেসরগুলোর জন্যেই এতকিছু গণ্ডগোল হলো।··· ঠেকে শিখল ব্রিটিশ সরকার, ফরমুলাটা যে সত্যিই কাজের···'

'ওসব কথা জানি আমি, ক্যাপ্টেন,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'ব্রিমন সবই বলেছেন, কাঁচা হাতে ছদ্মবেশ নিয়ে ছেলেমানুষের মত প্রকাশ করে ফেলেছেন সব। বন্ধুর নাম দিয়ে গল্প শোনাতে গিয়ে আসলে নিজের কথাই বলে ফেলেছেন আমার কাছে। আচ্ছা, একটা কথা জানেন নাকি, এম আই সিক্স কেন?'

'রেডিওতে তো, খুব একটা বেশি কিছু জানতে পারিনি। তবে ট্রাইটন থেকে যেটুকু জেনেছি তা হলো: কে. জি. বি. যখন বেশি তোড়জোর শুরু করল, তখন টনক নড়ল এম. আই. সিক্সের। ব্রিমনের ওপর নজর রাখার জন্যে ওরা ক্যাপ্টেন বামার্সকে পাঠাল। শুধু চোখ রাখার জন্যে লোক না পাঠিয়ে যদি তখুনি আরেকটু সাবধান হত এম. আই. সিক্স. তাহলে এতসব ঘটত না। সেই তো পানি খেলি বাছারা, ঘোলা করে খেলি!' স্পষ্ট ক্ষোভ ব্রিউস্টারের গলায়।

'যাক, যা হবার হয়েছে। আগে এখন ব্রিমনকে বাঁচানো দরকার। গলার শব্দ

শুনছেন? মারা যাচ্ছেন বিজ্ঞানী!'

রিমনের গলার ঘড়ঘড়ানি জোর শব্দ তুলছে কেবিনের ভেতর।

'কয়েক মিনিটের মধ্যেই ইনসুলিন পাওয়া গেলে?' রিমনের গলার আওয়াজ শুনতে শুনতে রানার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল ক্যাপ্টেন।

'হয়তো বাঁচানো সম্ভব!' অনিশ্চিত শোনাল রানার কণ্ঠ। 'কিন্তু কোথায় ইনসুলিন?'

'আসছে,' গম্ভীর কণ্ঠ ব্রিউস্টারের। 'কয়েক মিনিটের ভেতরেই।' কেবিনের অন্য প্রান্তের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেভিন, কি খবর?'

ঘুরে কেবিনের অন্যপ্রান্তের দিকে তাকাল রানা। পর্দার আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে কেভিন পোর্টার। হাসিমুখে তাকাল রানার দিকে। তারপর ক্যাপ্টেনের দিকে চেয়ে বলল, 'খবর পাঠিয়েছি।'

'গত চব্বিশ ঘণ্টায় রেডিওর কাছ থেকে নড়েনি কেভিন,' রানাকে বলল ব্রিউস্টার। 'আপনার মে-ডে শোনার পর থেকেই···ঝুঁকিটা একটু বেশিই নিয়েছিলেন, যদি সত্যিই গুলি করে বসত গার্নেভ?'

'করেনি যখন, ওসব ভেবে আর লাভ নেই···। কিন্তু ইনসুলিন পাচ্ছি কি করে?'

'ট্রাইটন আর সী-লেপার্ডের সঙ্গে···'

'সী-লেপার্ড?'

'ডেস্ট্রয়ার। দুটো জাহাজের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখেছি আমরা। ওরা এখন দক্ষিণে আশি মাইল দূরে রয়েছে।'

'এত দূরে!'

'অন্যদিকে চলে এসেছি তো আমরা। ট্রাইটনই জানিয়েছে, কাঙ্গালাক ফিয়র্ডের এদিকে রাশানদের সাবমেরিন ঘোরাঘুরি করছে। টের পেয়ে গেছে সী-লেপার্ড। আপনারা রহস্যজনক ভাবে নির্বাক হয়ে গেলেন, ওদিকে রাশান সাবমেরিনের খবরও পেলাম, ব্যস দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম এদিকে।'

'কিন্তু আশি মাইল! এত দূরে ইনসুলিন পাঠাতে তো অনেক দেরি হয়ে যাবে!' হতাশা প্রকাশ পেল রানার কণ্ঠে।

হাসল ব্রিউস্টার। 'আমরা স্পেস এইজে বাস করছি, ভুলে গেলেন? ট্রাইটন একটা প্লেন পাঠাতে পারে না?' কেভিনের দিকে ফিরল ব্রিউস্টার। পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেডিওম্যান। 'কখন?'

'এই একটু আগেই ট্রাইটন থেকে একটা স্কিমিটার জেট ফাইটার আকাশে উড়েছে,' বলল পোর্টার। 'ন'টা তেত্রিশ বাজে এখন। এখন থেকে ঠিক তেরো মিনিট পর রকেট ছুঁড়তে হবে আমাদের। এরপর তিরিশ সেকেন্ড পর পর আরও দুটো। আরও দুই মিনিট পরে স্নো-ফ্যালকনের দুশো গজ দূরে একটা ম্যাগনেশিয়াম ফ্লেয়ার ওড়াতে হবে। এরকমই নির্দেশ দিয়েছে ট্রাইটন।'

'কিন্তু আরও আগেই কেন ট্রাইটন থেকে ইনসুলিন নিলেন না?' জিজ্ঞেস করল

রানা।

'দিতে বলেছি, কিন্তু ট্রাইটনই দেয়নি। আবহাওয়া খারাপ ছিল। একটা দামী বিমানকে দামী ডাক্তারসহ পাঠানোর ঝুঁকি নিতে চাননি ক্যারিয়ারের ক্যাপ্টেন। তাছাড়া ট্রাইটনে একজন ডাক্তারই আছে। ক্যাপ্টেন বলেছেন, ব্রিমন বেঁচে আছেন কি নেই, না জানা পর্যন্ত প্লেন পাঠাবেন না। আপনাদের খুঁজে পাওয়ার পর আবার খবর পাঠিয়েছি ট্রাইটনকে।'

'আচ্ছা,' চিন্তিত দেখাল রানাকে। 'ফাইটার প্লেন। যুদ্ধের সময় নয় এখন, গোলাবারুদ তো থাকবে না, না?'

'থাকবে। বিশেষ আদেশ আছে এখন জাহাজ দুটোর ওপর। গতকাল থেকেই তৈরি হয়ে আছে ওরা। প্রতিটি প্লেন যুদ্ধসাজে রেডি। রাশান সাবমেরিন ঘাপটি মেরে রয়েছে। কখন কি ঘটে কে জানে। ডেস্ট্রয়ারটাও তৈরি।'

'সুখবর।'

খাবার এসে গেল। ট্রে থেকে গরম সুপের একটা বাটি তুলে নিয়ে রানার দিকে বাড়িয়ে ধরল ব্রিউস্টার। 'নিন। জলদি শেষ করে ফেলুন। অনেক আগে থেকেই নাড়িভুঁড়ি হজম করতে শুরু করেছেন। নিন।'

হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিল রানা। দ্রুত শেষ করে ফেলল। বাটিটা আবার ফিরিয়ে দিয়ে পারকার হাতায় মুখ মুছল। কফি আসতেই একটা কাপ তুলে নিয়ে চুমুক দিল পরম তৃপ্তির সাথে।

'এবার আপনার কাহিনী শোনান তো,' বলল ব্রিউস্টার। 'আমি যতটা জানি, তারপর থেকে।'

গার্নেভ ট্রাক্টর দখল করে নেবার পরের সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বলে গেল রানা।

চুপচাপ শুনল ব্রিউস্টার। হাত দুটো মুঠো হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। উত্তেজিতভাবে বলল, 'পাঁচ মাইল দূরে আছে ওরা, বলছেন? তাহলে তো আমরাই ধাওয়া করতে পারি ওদের। প্লেনের দরকার পড়ে না।'

'আমাদেরই যেতে হবে। সিত্রোঁটায় শ্যারিন আর টম ক্লেটন রয়েছে। তাছাড়া প্লেন থেকে বোমা ফেলে ট্রাক্টরটাকে ধ্বংস করে দিলে ফরমুলাটাও পাচ্ছেন না।' থামল রানা। লম্বা করে চুমুক দিল কাপে। তিন-চার চুমুকেই কফিটুকু শেষ করে কাপটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল, 'কিন্তু তাড়াতাড়ি করতে হবে আমাদের।'

'ইনসুলিনটা পেয়ে গেলেই রওনা হয়ে পড়ব আমরা। সিত্রোঁর তিনগুণ জোরে ছুটতে পারব আমরা এই পথেও।'

'হুঁ!' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে। খেয়েদেয়ে শরীর একটু চাঙ্গা হতেই আবার ঠিকমত কাজ করতে শুরু করেছে ব্রেন। 'কিছু ইনফরমেশন দিন তো।'

'বলুন?' রানার দিকে ঝুঁকে এল ব্রিউস্টার।

'আপনাদের সঙ্গে রাইফেল আছে?'

'আছে। কেন?'

'সিত্রোঁর চেয়ে জোরে ছুটতে পারবে স্নো-ফ্যালকন, বুঝলাম, কিন্তু ছোটানো যাচ্ছে না।'

'কেন?'

'পথ এবড়োখেবড়ো। টিলাটক্কর আছে। জোরে ছুটলে সাংঘাতিক লাফাবে এই কেবিন। ধকলটা সইতে পারবেন না ব্রিমন আর সুসান। তাছাড়া, আমরা পিছু তাড়া করলে, আর স্নো-ফ্যালকনকে দেখে ফেললে মরিয়া হয়ে উঠবে গার্নেভ। যা খুশি করে বসতে পারে। শ্যারিন আর টমের জন্যে পরিণতিটা খুবই খারাপ হবে।'

'তাহলে কি করতে বলেন?'

'কাঙ্গালাক ফিয়র্ড আর আশপাশটা পরিষ্কার ভাবে দেখানো হয়েছে, এমন কোন ম্যাপ আছে আপনাদের কাছে?'

'আছে,' চোখ তুলে পোর্টারের দিকে তাকাল ব্রিউস্টার।

চলে গেল পোর্টার। আধ মিনিট পরেই ফিরে এল।

রানার সামনে একটা ছোট টেবিল পেতে তাতে ম্যাপটা বিছাল ক্যাপ্টেন।

আঁকাবাঁকা কাঙ্গালাক ফিয়র্ড দেখানো আছে ম্যাপে। কোন্ পথ বেয়ে হিমবাহ নামে, তা-ও দেখানো আছে। ফিয়র্ডের দক্ষিণে গভীর উপসাগর, উত্তরে বরফে ঢাকা স্থলভাগ। কয়েক মাইল এগিয়েই শেষ হয়ে গেছে, তারপরে সাগর।

'ডেস্ট্রয়ারটা কোথায় আছে?' জানতে চাইল রানা।

'ঠিক করে বলা সম্ভব না। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ জমে জমে ক্রমেই এগিয়ে যাচ্ছে সাগরের দিকে। কোথাও কোথাও বেশি জমে গিয়ে চাপ খেয়ে ভেঙে যাচ্ছে, বেরিয়ে পড়ছে পরিষ্কার পানি। তাই এক জায়গায় স্থির থাকতে পারছে না ডেস্ট্রয়ারটা। তীরের একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে তো।'

'এখানটায় হতে পারে?' কাঙ্গালাকের উল্টোদিকের একটা জায়গায় আঙুল রাখল রানা।

'না,' এদিক ওদিক মাথা নাড়াল ব্রিউস্টার। 'কয়েক ঘণ্টা আগে অবশ্য ছিল, পুরু বরফ জমে যাওয়াতে সরে গেছে। আসলে সাবমেরিনটার কাছাকাছিই থাকতে চাইছে ওটা।'

'ও,' মুখের একটা ক্ষতে আঙুল রাখল রানা। চুলকাতে গিয়ে ব্যথা পেয়ে সরিয়ে আনল হাতটা। 'কারও কাছ থেকে তেমন কোন সাহায্য আমরা পাচ্ছি না তাহলে। নিজেদেরকেই করতে হবে সব। যা মনে হয়, হিমবাহের ওপারে রয়েছে সিট্রোঁ। এপাশ থেকে আমরা এগিয়ে যাব ঢালের দিকে। ঢালের মাথায় নেমে মোড় নিয়ে এগিয়ে যাব ওটার কাছে, ওদের অলক্ষ্যে।'

'কিন্তু ইঞ্জিনের শব্দ তো শুনতে পাবে।'

'পাবে না। যা বিকট শব্দ করে সিট্রোঁটার ইঞ্জিন, শুনবে না ওরা।'

'যদি কোন কারণে ইঞ্জিন বন্ধ রাখে?'

'রাখবে না। দু'জনেই ইঞ্জিন সম্পর্কে একেবারে আনাড়ি। বন্ধ করে দিলে যদি আবার স্টার্ট না নেয়, এই ভয়ে বন্ধ করবে না ইঞ্জিন,' ম্যাপে আবার আঙুল রাখল রানা। 'এই দেখুন। আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা। হিমবাহকে বাঁয়ে রেখে পশ্চিমে এগোচ্ছে সিট্রোঁ। আমরা ডানে রেখে এগিয়ে উত্তরে মোড় নেব। ওদের চেয়ে দ্রুত এগোতে হবে আমাদের। ওদের আগেই পৌঁছে গিয়ে অ্যামবুশ পেতে

বসে থাকব সিত্রোঁর আসার অপেক্ষায়। তারপর সুযোগ বুঝে আচমকা আক্রমণ করব।'

'আচমকা?' চোখ কুঁচকে রানার দিকে তাকাল ব্রিউস্টার। 'কিন্তু তাতে কি কোন লাভ হবে? বন্দীরা তো গার্নেভের হাতে রয়েছেই। ওদের কপালে পিস্তল ধরে আপনাদের ঠেকাতে পারবে না সে?'

'পারবে না,' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'কারণ, আচমকা আক্রমণ বলতে লাঠি-সড়কি রাম-দা নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলিনি। ওরা হিমবাহ ঘেঁষে চলছে, কিন্তু এতটা ঘেঁষে নয় যে বরফের চলন্ত দেয়ালের গায়ে ঠেকে যায় সিত্রোঁ। অন্তত চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ দূর দিয়ে চলবে ওরা। তার মানে ওরা যখন ওপাশ থেকে বেরিয়ে আসবে, আমরা কমপক্ষে পঞ্চাশ গজ দূরে থাকব।' ইঙ্গিতে ট্রাক্টরের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা একটা রাইফেল দেখাল রানা। 'দুপুর নাগাদ ওদের দেখা পাব আমরা। তখন আলো থাকবে। আমি জানি, টেলিস্কোপিক সাইট রয়েছে রিকের ব্যাগে। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে টেলিস্কোপের ভেতর দিয়ে অন্তত ছয়গুণ বড় দেখায় মানুষের মাথা। মিস করবে না রিক। আমিও থাকব ব্যারির সঙ্গে। আমাকে একটা রাইফেল ধার দেবেন। টেলিস্কোপ থাক আর না থাক, পঞ্চাশ গজ দূর থেকে মানুষের মাথা মিস করব না আমিও। ওয়ান…টু…থ্রী…বলে একই সঙ্গে ট্রিগার টিপব দু'জন। আশা করি, একই সঙ্গে মারা যাবে গার্নেভ আর নিখারেভ। একজন ড্রাইভিং সীটে বসেছে, অন্যজন কেবিনের পেছনে। পঞ্চাশ গজ দূর থেকে দু'জনকেই দেখে গুলি করা সম্ভব। যদিও জানি, আত্মসমর্পণের সুযোগ দেয়া উচিত শত্রুপক্ষকে, কিন্তু এই মুহূর্তে এর চেয়ে ভাল কোন প্ল্যান মাথায় আসছে না।'

কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল ব্রিউস্টার, পোর্টারের কথায় থেমে গেল।

'ন'টা তেতাল্লিশ বাজে। আর মাত্র তিন মিনিট, ক্যাপ্টেন।'

চট্ করে ঘড়ি দেখল ক্যাপ্টেন।

'ও, হ্যাঁ,' গার্নেভ কিংবা নিখারেভের ব্যাপারে আর কথা বলতে না হওয়ায় খুশিই হলো ব্রিউস্টার। 'তিনটা ওয়েসেস্ক রকেট আনো। ফ্লেয়ারও আনো।'

দরকারী জিনিসগুলো নিয়ে কেবিন থেকে নামল ব্রিউস্টার। রানাও নামল। সঙ্গে যাবে।

টর্চের আলোয় পথ দেখে ট্রাক্টর থেকে দুশো গজ দূরে এসে থামল ব্রিউস্টার। একেবারে ঘড়ির কাঁটা ধরে নিক্ষেপ করল রকেট।

তীব্র নীলচে সাদা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল কিছুটা জায়গার আকাশ আর নিচের বরফ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কানে এল জেট ইঞ্জিনের গর্জন। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ থেকে আসছে আওয়াজটা।

কয়েক মুহূর্ত পরেই মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একটা প্লেন। তারপরই আরেকটা। একটা আসার কথা ছিল, কিন্তু দুটো এল কেন?—বুঝতে পারছে না রানা। তাকিয়ে আছে প্লেন দুটোর দিকে।

কান ফাটানো গর্জন করে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল দুটো প্লেন। খানিকটা গিয়েই আবার ফিরে এল। গতি অনেক কমে গেছে। নিচেও নেমেছে অনেক,

কয়েকশো গজ ওপরে আছে এখন।

ছুটে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে চলে গেল প্লেন দুটো। আবার ফিরে এল। আরও নিচে নেমেছে, গতি আরও কমেছে। সামনের প্লেনটার পেটের পাশে একটা বিশেষ জায়গায় গর্ত দেখা দিল। সেই পথে প্যারাস্যুট নিয়ে ঝাঁপ দিল একজন লোক। তারপরেই আরেকজন। তারপর আরও। একজন নামার কথা ছিল, কিন্তু এত লোক কেন! দুটো প্লেন আসার কারণ এখন বুঝতে পারছে রানা।

দুটো প্লেন থেকে মোট বারোজন লোক টপাটপ লাফিয়ে বেরিয়ে এল। প্যারাস্যুট খুলে গেছে। ধীরে ধীরে নেমে আসছে ওরা বরফের ওপর।

ফ্লেয়ার নিক্ষেপ করল ব্রিউস্টার। উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল বরফ-আকাশ। আলো দেখে দেখে নিরাপদেই এসে জমায়েত হলো বারোজন লোক। নিজেদের পরিচয় দিল।

একজন ডাক্তার, ইনসুলিন আর সিরিঞ্জ নিয়ে এসেছে। আরও কিছু জীবন রক্ষাকারী প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও এনেছে। অন্য এগারোজন ছত্রীসেনা। সশস্ত্র। ব্রিউস্টারকে সাহায্য করার জন্যে পাঠিয়েছেন ট্রাইটনের ক্যাপ্টেন।

ব্রিমন আর সুসানের যাতে কোন ক্ষতি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ছুটছে স্নো-ফ্যালকন। বেশ জোরেই ছুটছে। দুর্গম পথ। বরফে পথ দেখে চলার আধুনিক যন্ত্রপাতি রয়েছে ট্রাক্টরে। কিন্তু ওগুলোর চেয়ে বেশি কাজে লাগছে ব্যারির রোল্টা। চারদিকে ছড়ানো অজস্র মারাত্মক ফাটল আর বরফে ঘাপটি মেরে থাকা হাজারো বিপদকে পাশ কাটিয়ে আগে আগে ছুটে যাচ্ছে প্রকাণ্ড কুকুরটা, তাকে অনুসরণ করছে স্নো-ফ্যালকন।

কেবিনে ব্রিমনকে নিয়ে ব্যস্ত ট্রাইটনের ডাক্তার। ছত্রীসেনারা বসে আছে চুপচাপ। আর সবার মতই ঝাঁকুনি খেয়ে দুলছে, কিন্তু মুখে কোন ভাবান্তর নেই। ডাক্তার নেভির লোক, কাঁধে লেফটেন্যান্টের ব্যাজ। এগারোজন লোকের পরিচালনার ভার স্বভাবতই তার কাঁধে ন্যস্ত হয়েছে।

ব্রিমনকে এখনকার মত শেষ ইঞ্জেকশনটা পুশ করে পাশে রাখা গরম পানির পাত্রে সিরিঞ্জটা ফেলে দিল ডাক্তার। তারপর ব্রিউস্টারের মতই ক্ষোভ প্রকাশ করল, 'ওই হতচ্ছাড়া ময়ূরের মত পেখম মেলা পি.এইচ.ডি প্রফেসরগুলোর জন্যেই আজ এত ঝামেলা! ব্যাটারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মানুষই মনে করে না!'

'মিস্টার ব্রিমনের মুখে কিছুটা শুনেছি,' বলল রানা। তার সঙ্গে ডাক্তারের পরিচয়ের পালা সাঙ্গ হয়েছে আগেই। 'পুরো ব্যাপারটা কি জানা আছে আপনার, ক্যাপ্টেন?'

'হ্যাঁ। জানানো হয়েছে আমাদের। তখন হাসাহাসি করেছে, এখন প্রধানমন্ত্রী সুদ্ধ টান পড়েছে। এম. আই. সিক্সের টু আই সি স্পেশাল প্লেনে করে এসে নেমেছে ট্রাইটনে। তার মুখেই শুনেছি সব। এই ফরমুলা রাশানদের হাতে পড়লে মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে মুক্ত-বিশ্বের।'

ঘড়ি দেখল রানা। পৌনে এগারোটা বাজে। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে ছুটছে স্নো-

ফ্যালকন। ব্রিউস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আর কতক্ষণ, পৌঁছতে?'

'আরও প্রায় এক ঘণ্টা,' জানাল ব্রিউস্টার।

'তাহলে ঘটনাটা আমরা শুনতে পারি, কি বলেন, লেফটেন্যান্ট?' ডাক্তারের দিকে তাকাল রানা।

'কিন্তু আপনার হাত মুখের কিছুটা চিকিৎসা দরকার,' রানার মুখের ক্ষতগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তার। 'আর সবার তো হয়ে গেছে।'

'আপাতত কয়েকটা ব্যথার ট্যাবলেট দিন, পরে দেখা যাবে,' বলল রানা।

রানার মুখের দিকে তাকিয়ে কি ভাবল ডাক্তার। শ্রাগ করল। বুঝতে পেরেছে হয়তো, এই লোকের ওপর চাপাচাপি করে কোন ফল হবে না। কিট থেকে নিয়ে গোটা চারেক ট্যাবলেট বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে।

খানিকটা ব্র্যান্ডি দিয়ে বড়িগুলো গিলে নিয়ে বলল রানা, 'হ্যাঁ, এবার আরম্ভ করুন, প্লীজ।'

'কতটা জানেন আপনি?' রানাকে জিজ্ঞেস করল ডাক্তার।

'গোড়া থেকেই বলুন না আবার, সবাই শুনুক। নাকি অসুবিধে আছে?'

'না না,' মাথা নাড়ল ডাক্তার। 'অসুবিধে আর কি? আমরাই তো।'

'ঠিক আছে, তাহলে বলুন।'

'এক কাপ কফি,' ব্রিউস্টারের দিকে তাকিয়ে বলল ডাক্তার।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' ডেকে কফির নির্দেশ দিল ব্রিউস্টার।

কফির কাপে গোটা কয়েক চুমুক দিয়ে শুরু করল ডাক্তার, 'ফরমুলাটা নিয়ে প্রথম অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে যান ব্রিমন। তারপর কেমব্রিজে। ডাকসেটে কোন লোক নন, কোন ডক্টরেট নেই ব্রিমনের, তাই তাঁকে কোনরকম পাত্তাই দিল না দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টের দুই হোমরাচোমরা প্রধান···ডক্টরেট পাওয়া দুই মহা-অহঙ্কারী ব্যক্তি। লেখাটা পড়ে দেখারও দরকার মনে করেনি তারা, দিন সাতেক টেবিলের একপাশে ফেলে রেখে ফেরত দিয়েছে।'

'এরপর কে. জি. বি. যোগাযোগ করল ব্রিমনের সঙ্গে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ,' বলল ডাক্তার। 'যে কোন বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নামজাদা বিজ্ঞানীদের আশপাশেই ঘুরঘুর করে ভিনদেশের গুপ্তচর। ব্রিমনের আবিষ্কারের বিষয়টা জানল ওরা এবং জানাল যথাস্থানে। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই হর্তাকর্তা জানে না, কিন্তু ব্রিমন সম্পর্কে কিছুটা আইডিয়া আছে রাশানদের। কারণ, এর আগে কয়েকটা ছোটখাট চমকপ্রদ আবিষ্কার করেছেন ব্রিমন। যা বোঝার বুঝে নিল কে. জি. বি। ঠিকই বুঝল ওরা ব্রিমনের ফরমুলার ভেতরে মাল আছে, ফালতু লোক তিনি নন। লোক লেগে গেল ব্রিমনের পেছনে। ফরমুলা কেনার প্রস্তাব রাখল। কিন্তু কিছুতেই বেচতে রাজি হলেন না ব্রিমন। দেশপ্রেমিক লোক তিনি, চিনে ফেলেছেন রাশানদের। টাকা কেন, নিজের প্রাণের বিনিময়েও দেশের বিরুদ্ধে ব্যবহার হতে পারে এমন একটা জিনিস বিদেশীর হাতে তুলে দিতে রাজি হলেন না।'

'এবার কয়েক দফতর ঘুরে পৌঁছলেন গিয়ে এম. আই. সিক্সের কাছে,' বলল রানা।

'হ্যাঁ, নানা জায়গায় ধরনা দিয়ে শেষে এম. আই. সিক্সের ওখানে গিয়ে পৌঁছুলেন। ব্রিমনের বক্তব্য মন দিয়েই শুনল এম. আই. সিক্স। তাঁর জীবনের আশঙ্কার কথাও বললেন ওদের ব্রিমন। তাঁকে প্রোটেকশন দেবার কথাটা ভাবলেন এম. আই. সিক্সের ইনভেস্টিগেশন বিভাগের প্রধান। দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই মহারথীর কাছে টেলিফোনও করলেন। এরপরই মত ঘুরে গেল তাঁর। মুচকি হেসে ব্রিমনের দিকে নতুন চোখে তাকালেন। পাগলের দিকে যে চোখে তাকাই আমরা, তেমনিভাবে। ব্রিমনকে পরামর্শ দিলেন, রাশানরা যদি তাঁর ফরমুলা কিনে নিতে চায় তাঁর উচিত হবে চট্ করে ওটা বিক্রি করে দেয়া। কিছু বিদেশী পয়সা আসবে ব্রিটেনে। খুব ভাল কথা, ক্ষতি নয়, এতে দেশের কাজ হবে।···হতাশ হয়েই ফিরে এলেন ব্রিমন। ঠিক করলেন আমেরিকায় চলে যাবেন। তাঁর ধারণা, আমেরিকান বিজ্ঞানীরা অন্তত ব্রিটিশদের মত এমন অহঙ্কারী হবে না।···স্ত্রীকে নিয়ে ছদ্ম পরিচয়ে চলে যাবেন ব্রিমন, কাগজপত্র রেডি করলেন তাড়াতাড়ি। আঘাত এল ঠিক সেই সময়ই। আক্রমণ এল অতর্কিতে। বাড়ি থেকে চোরাপথে পালানোর পথ আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন ব্রিমন। কে. জি. বি-র অ্যাসল্ট গ্রুপ বাড়ি ঘিরে ফেলতেই স্ত্রীকে ডাক দিয়ে ছুটলেন তিনি সেই পথে। কি জানি কেন, কোন কারণে দেরি করে ফেলেছিলেন হয়তো মিসেস, আটকে গেলেন বাড়িতে। তাড়াহুড়োয় খেয়াল করলেন না ব্রিমন যে মিসেস তাঁর সঙ্গে আসছেন না। ···যা হবার হয়ে গেল। এলোপাতাড়ি গোলাগুলির শিকার হলেন মিসেস। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল বাড়িটা।···আধঘণ্টা পর সব থেমে গেলে বাইরে অন্ধকার আড়ালে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর লাশ অ্যাম্বুলেন্সে তুলতে দেখলেন ব্রিমন···'

'···এরপর পালিয়ে গ্যান্ডারে চলে গেলেন নিশ্চয়?' বলল রানা। 'ওখান থেকে বি ও এ সি ধরে আমেরিকা চলে যেতেন?'

'হ্যাঁ,' শেষ হয়ে যাওয়া কফির কাপটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল ডাক্তার। 'ব্রিমনের বাড়ি সত্যিই আক্রান্ত হলো, তাঁর স্ত্রী মারা গেলেন, কে জি বি-র গন্ধ পাওয়া গেল—এবারে টনক নড়ল এম আই সিক্সের। কিন্তু ততক্ষণে মুস্তাফা শরাফীর ছদ্মবেশে দেশ থেকে সবার অলক্ষ্যে বেরিয়ে গেছেন ব্রিমন। খোঁজ··· খোঁজ···সাড়া পড়ে গেল। কে জি বি-ও কিন্তু ব্রিমনকে হারিয়ে ফেলেছে। তবে অপটু কাঁচা হাতে ছদ্মবেশ নিয়েছেন ব্রিমন, আত্মগোপন করার টেকনিক জানা নেই, সহজেই তাঁকে খুঁজে বের করল দুই দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী। গ্যান্ডারে তাঁর সঙ্গে একই প্লেনে চড়ল কে জি বি-র দুই এজেন্ট আর এম আই সিক্সের ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্স। গার্নেভ আর নিখারেভের অস্তিত্ব টেরই পায়নি ব্রায়ার্স, ফলে খুন হয়ে গেল···'

'বুঝলাম,' আস্তে করে বলল রানা। ডাক্তারের দিকে তাকাল। 'আচ্ছা ডক্টর,' এগারোজন ছত্রীসেনার দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'এরা এতজন কেন? খুনী তো মাত্র দু'জন!'

'ওরা?' চিন্তিত দেখাচ্ছে ডাক্তারকে। 'শুনেছেন বোধহয়, একটা রাশান সাবমেরিন ঘাপটি মেরে রয়েছে এদিকেই কোথাও?'

'শুনেছি,' মাথা দোলাল রানা।

'উত্তর সাগরে মাছ ধরছিল কয়েকটা ট্রলার,' বলল ডাক্তার। 'রাশান ট্রলার। আমরা খবর পেয়েছি, একটা ডেস্ট্রয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছে ওগুলোর। তারপরই মাছধরা ছেড়ে পড়িমরি করে ছুট লাগিয়েছে তিনটে ট্রলার। এদিকেই এসেছে কোথাও।'

'রাশান সৈন্য নামবে ওগুলো থেকে, আশঙ্কা করছেন?'

'ফরমুলাটা মূল্যবান। নামলে অবাক হব না। কে জানে, আমাদের বম্বারগুলোকেও হয়তো কাজে লাগাতে হবে। বলা যায় না, ছোটখাট একটা যুদ্ধও বেধে যেতে পারে।'

নয়

ধূসর আলো ফুটেছে চারদিকে। বাতাস নেই, বরফ-কুচির মাতামাতি নেই, অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দৃষ্টি চলে।

বিশাল হিমবাহ পেরিয়ে এসেছে স্নো-ফ্যালকন। থেমে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভিং সীট থেকে নেমে এল ড্রাইভার। ব্রিউস্টারের নির্দেশ নেবে, এরপর কোন্‌দিকে কতটা যেতে হবে জানা দরকার।

কেবিনের বাইরে বেরিয়ে এল রানা। দক্ষিণে ফিয়র্ডের মাইলখানেক লম্বা বরফের দেয়াল দিগন্তবিস্তৃত উপসাগরে নেমে গেছে। বরফে ঢাকা সৈকত, ধূসর আলোতে কেমন ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে।

ব্যাফিন উপসাগর। মালার মত অসংখ্য ছোট ছোট দ্বীপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে এর বুকে, সবই এখন বরফে ঢাকা, নির্জন। বসন্ত এলে ধীরে ধীরে গলে যাবে বরফ, বিকট দাঁত বের করে বেরিয়ে আসবে দ্বীপের কালো পাথুরে-ভূমি। তখনও কিন্তু নির্জনই থাকবে ওই সব দ্বীপ, কিন্তু নির্জীব থাকবে না। দূরদূরান্ত থেকে উড়ে আসবে লক্ষকোটি মাছখেকো পাখি। ওদের কলরব শোনা যাবে মাইল মাইল দূর থেকেও। হামাগুড়ি দিয়ে ওই পাখিদের মাঝে উঠে আসবে সীল মাছ: ধাড়ি, বুড়ি, বাচ্চা। বরফের ঘরে আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসবে শ্বেতভালুক আর তার ছানাপোনারা। বেরিয়ে আসবে বাইরে। শুরু হবে শিকার শিকার খেলা। উপসাগরের পানির ওপরে জমা বরফের আস্তরণে চিড় ধরবে। ভাঙবে। ছোটবড় বরফের চাঁইগুলো সমুদ্রস্রোতে ভেসে ভেসে চলে যাবে ফেয়ার অন্তরীপের দিকে।

এসবই জানে রানা, কিন্তু এখন প্রকৃতিদর্শনে মন নেই তার। অন্য অনেক জরুরী কাজ পড়ে আছে। দিগন্তরেখার দিকে তাকিয়ে আছে সে। কালো একটা আবছা জিনিসের দিকে মনোযোগ। অতি ধীরে বড় হচ্ছে আবছা বস্তুটা। জাহাজ। নিশ্চয় ডেস্ট্রয়ারটা, স্নো-লেপার্ড, অনুমান করল রানা।

দৃষ্টিটা কয়েক মাইল উত্তরে সরে আসতেই থমকে গেল রানা। আরেকটা

জাহাজ। পুরোটা দেখা যাচ্ছে না সাগরের বুকে জমে ওঠা তুষার স্তূপের জন্যে। আসলে ইচ্ছে করেই ওই বরফের আড়ালে লুকিয়েছে গিয়ে ওটা। মাস্তুল চোখে পড়ছে, কিন্তু কোন পতাকা নেই। ট্রলার। রাশান, তাতে কোন সন্দেহ রইল না রানার। যুদ্ধ হবে নাকি?

'রাশান ট্রলার, না?' পাশ থেকে ব্রিউস্টারের গলা শোনা গেল।

ফিরে চাইল রানা। ব্রিউস্টারের হাতে টেলিস্কোপ, হাত বাড়িয়ে নিল সে। চোখে লাগাল। আরেকটু পরিষ্কার দেখা গেল মাস্তুল আর নিচের অংশটা। কিন্তু বরফের স্তূপের জন্যে জাহাজটাকে দেখা যাচ্ছে না। এই সময়ই সিত্রোঁর ইঞ্জিনের শব্দ কানে এল ওদের।

টেলিস্কোপটা ব্রিউস্টারের হাতে গুঁজে দিয়ে ছুটে এসে কেবিনে ঢুকল রানা। রেডিওর কাছে বসে থাকা পোর্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। 'ট্রাইটনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে এখনও, পোর্টার?'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল পোর্টার।

'জলদি জানাও ওদের, কাঙ্গালাক ফিয়র্ডের মুখে একটা রাশান ট্রলার দাঁড়িয়ে আছে। ওটা থেকে লোক নামবে, সন্দেহ নেই।'

'আমাদের সঙ্গেও তো সৈন্য রয়েছে?'

'তা হোক। তবু খবরটা জানিয়ে দাও ট্রাইটনকে। ডেস্ট্রয়ারটাকে খবর জানাতে বলো।'

'এখন...'

'নিশ্চয়! জলদি করো!'

'আমি বলতে চাইছিলাম, এখন ট্রলারের সৈন্যেরা কোথায়? জাহাজেই আছে, না নেমে পড়েছে?'

'সম্ভবত নেমে পড়েছে। ফিয়র্ডের খাড়া দেয়াল বেয়ে উঠতে পনেরো-বিশ মিনিট লাগবে ওদের,' বলেই ঘুরে দাঁড়াল রানা। একটা চেয়ারে বসে কান খাড়া করে শুনছে ডাক্তার। রানা চাইতেই বলল, 'আপনি একজন আর্মি মেজর, আগে বলেননি কেন? ব্যারি বলল...'

'দেরি করবেন না, লেফটেন্যান্ট,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'সৈন্যদের নিয়ে নেমে যান। ওদের বাধা দিতে হবে।'

'যাচ্ছি,' বলেই উঠে দাঁড়াল ডাক্তার। সৈন্যদের নিয়ে বেরিয়ে গেল।

'পনেরো-বিশ মিনিটে উঠে আসতে পারবে ওরা, রানা?' রানার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে ডেরেক। 'ট্রলার থেকে নৌকা নামিয়ে ফিয়র্ডের কাছে আসতে হবে, তারপর খাড়া দেয়াল বেয়ে ওঠা...'

'নাহয় আরও কয়েক মিনিট বেশি লাগবে। কিন্তু আসবে ওরা।'

মাইক্রোফোনে মুখ ঠেকিয়ে ইতোমধ্যে কথা বলতে শুরু করেছে পোর্টার। 'ট্রাইটন...ট্রাইটন...'

আর অপেক্ষা করল না রানা। বেরিয়ে এল।

কেবিনের দিকেই ফিরে আসছে ব্রিউস্টার। উত্তেজিত। 'মিস্টার রানা, এসে

গেছে সিত্রোঁটা! জলদি আসুন!'

কেবিনের দরজায় উঁকি দিল ব্যারি। রানার দিকে তাকাল। ইশারা করল রানা। আবার ভেতরে ঢুকে গেল সে। বেরিয়ে এল কয়েক সেকেন্ড পরেই। হাতে দুটো রাইফেল। নিজের জন্যে লী-এনফিল্ড রেখে ৩০৩ রাইফেলটা রানার দিকে ছুঁড়ে দিল। লুফে নিল রানা।

'আমার জন্যেও একটা,' বলল ব্রিউস্টার।

আবার ভেতরে ঢুকে গেল ব্যারি। আরেকটা রাইফেল এনে তুলে দিল ব্রিউস্টারের হাতে।

সিত্রোঁটার বেরিয়ে আসার পথের কাছ থেকে একশো গজ দূরে রাখা হয়েছে স্নো-ফ্যালকনকে। ছুটে পঞ্চাশ গজের মত পেরিয়ে গেল তিনজনে। বরফের একটা টিলার ওপর উঠে গেল। রাইফেল হাতে যতটা সম্ভব নিচু হয়ে বসে পড়ল। এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে হিমবাহের উত্তর-পশ্চিম কোণটা। ওখান দিয়েই বেরোবে সিত্রোঁ।

তাড়াহুড়োর দরকার নেই। চুপচাপ বসে আসে তিনজনে। আওয়াজ শুনেই বোঝা যাচ্ছে, এখনও কিছুটা দূরে আছে সিত্রোঁ। বেশ ধীরে চলছে।

টিলার ওপরে বসে সাগরের দিকে ঢালু হয়ে থাকা হিমবাহের পিঠের অনেকখানি জায়গা দেখতে পাচ্ছে রানা। জ্যৈষ্ঠ মাসে বাংলাদেশের মাঠ যেমন ফেটে চৌচির হয়ে যায়, তেমনি অসংখ্য ফাটল দেখা যাচ্ছে হিমবাহের পিঠের মাঝখানটায়। কোনটা চওড়ায় মাত্র কয়েক ইঞ্চি, কোনটা বা আবার বিশ ফুটেরও বেশি। বিচিত্র সব ফাটল, কোনটা সোজাসুজি এগিয়ে গিয়ে মিশেছে আড়াআড়ি কোন একটা ফাটলের সঙ্গে, কোনটা বা আবার সাপের মত এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে অনেক দূর।

আড়চোখে একবার ব্যারির দিকে তাকাল রানা। হিমবাহের বরফ কেটেই যেন তৈরি হয়েছে তার মুখ, তেমনি নিথর, নিস্পন্দ, ভাবলেশশূন্য।

ব্রিউস্টার অস্থির। কিছুটা নার্ভাস। বারবার জায়গা বদলে বসছে। আসলে গোটা ব্যাপারটা মোটেও ভাল লাগছে না তার।

'বেরোবে ওটা এবার,' শান্ত কণ্ঠে ঘোষণা করল ব্যারি।

আধ সেকেন্ড পরেই হিমবাহের কোণে দেখা গেল সিত্রোঁটাকে। মার্কসম্যানের কায়দায় হাঁটু গেড়ে বসে রাইফেল তুলেছিল ব্যারি, নামিয়ে নিল।

সাগরের দিকে নাক করে সিত্রোঁটা বেরোবে, ভেবেছিল রানা, কিন্তু ভুল। উত্তর-পশ্চিমে কোণ করে বেরিয়েছে ওটা। তাছাড়া পঞ্চাশ গজ নয়, অন্তত দেড়শো গজ দূর দিয়ে। এগিয়ে যাচ্ছে। ওদিকেই কোথাও আছে নিশ্চয় সাবমেরিনটা।

অনিশ্চিত ভাবে এগিয়ে চলেছে সিত্রোঁ। দূর থেকেই বুঝতে পারছে রানা, কারবুরেটরে গোলমাল হয়েছে ওটার। চলতে চলতে মাঝে মাঝেই থমকে যাচ্ছে, আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মিসফায়ারের, পরক্ষণেই ঝাঁকুনি খেয়ে চলতে শুরু করছে আবার। বিশ তিরিশ গজ এগিয়ে আবার মিসফায়ার করছে ইঞ্জিন। কিন্তু বন্ধ হচ্ছে

না।

চলতে চলতে আবার ডাইনে সরে গেল সিট্রোঁ। দেখা যাচ্ছে না এখন ওটাকে। তুমুল চিন্তা চলছে রানার মাথায়। কি করা যায় এখন? হিমবাহের ওপর দিয়ে যাওয়া যাবে না। সিট্রোঁর কেবিন থেকে দেখে ফেলবে গার্নেভ। তাহলে?

'শেষ পর্যন্ত ওদেরই জয় হলো!' রানার কানের পাশে বিড় বিড় করল ব্রিউস্টার। জোরে কথা বলতে ভয় পাচ্ছে, যেন এতদূর থেকেও শুনে ফেলবে গার্নেভ। 'কিন্তু মিসাইলের ফরমুলা…'

'চুলোয় যাক আপনার মিসাইলের ফরমুলা! ওটার কানাকড়ি দাম নেই এখন। দুটো জীবন বাঁচানোই বড় কথা!'

না তাকিয়েও টের পেল রানা, তার দিকেই অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ব্রিউস্টার। কিন্তু আর কিছু বলল না।

'ঠিকই বলেছেন আপনি, রানা,' পেছনে শোনা গেল ডেরেকের কণ্ঠ। সে-ও এসে দাঁড়িয়েছে। সিট্রোঁটা যেদিকে যাচ্ছে সেদিকে তাকিয়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা আঙুলে নাক চুলকাচ্ছে। 'চুলোয় যাক মিসাইলের ফরমুলা। ওসব জিনিস আর আবিষ্কার না হওয়াই ভাল। শুধু শুধু মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা…'

'আমি দুঃখিত, মিস্টার রানা,' লজ্জিত কণ্ঠে বলল ব্রিউস্টার।

কেউ কোন কথা বলল না।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর টিলার নিচ থেকে উত্তেজিত চিৎকার শোনা গেল। ঘুরে চাইল রানা। পোর্টার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে।

'কি হলো, পোর্টার?' জানতে চাইল রানা।

'স্নো-লেপার্ড নোঙর করেছে…' বলল পোর্টার।

'তারপর?'

'মোটর বোট রওনা হয়ে গেছে তীরের দিকে। ট্রাইটন থেকে চারটে স্কিমিটার জেট উড়বে শিগ্গিরই। এর কয়েক মিনিট পরে আরও চার-পাঁচটা বম্বার উড়বে। ফরমুলাটা অগত্যা হাতে পাওয়া না গেলে ধ্বংস করে দেবার নির্দেশ এসেছে ব্রিটেন থেকে।'

'কি বললে? ধ্বংস?' চিন্তিত দেখাচ্ছে রানাকে।

'হ্যাঁ। ফরমুলা নিয়ে রাশানদের পালাতে দেয়া হবে না।'

'আশ্চর্য! মানুষের জীবনের কোন দামই নেই…' কাঁধের ওপর হাতের স্পর্শে থেমে গেল রানা।

'মেজর,' ট্রলারটার দিকে আঙুল তুলে দেখাল এস্কিমো। 'সিগন্যাল! আলোর সঙ্কেত। দেখতে পাচ্ছ?'

দেখল রানা। মোর্স। রাশান সঙ্কেত। কিন্তু ঠিকই পড়তে পারল রানা। গার্নেভ আর নিখারেভকে ওদিকে আসতে বলছে ট্রলার। কিন্তু ওরা দু'জন কি দেখতে পেয়েছে?

পেয়েছে। কয়েক মিনিট পরেই দেখা গেল। ঘুরে আবার হিমবাহের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল সিট্রোঁ। ঢালু, সাংঘাতিক এবড়োখেবড়ো পথ ধরে এগোচ্ছে

সৈকতের দিকে।

'সর্বনাশ, মেজর!' উত্তেজিত হয়ে উঠেছে এস্কিমো। 'নিখারেভ নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছে না, ভয়ঙ্কর ফাটল রয়েছে সামনে। এখান থেকেই দেখা যাচ্ছে…ওই, ওই যে…'

ব্যারির নির্দেশিত দিকে তাকাল রানা, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। এস্কিমোর মত তার দৃষ্টিশক্তি অত জোরাল নয়। ব্রিউস্টারের কাছ থেকে টেলিস্কোপটা নিয়ে চোখে ঠেকাল।

লাফ দিয়ে চোখের সামনে এসে গেল উত্তর-পশ্চিম উপকূলের অনেকখানি। হ্যাঁ, সিত্রোঁর দুশো গজ সামনে এক বিশাল ফাটল। ঢালু হতে হতে হঠাৎ খাড়া হয়ে গেছে বরফের স্তূপ, ড্রাইভিং সীটে বসে নজর পড়ছে না নিখারেভের। যে গতিতে এগোচ্ছে, আর কয়েক মিনিট পরেই খাদে গিয়ে পড়বে ট্রাক্টর।

অনেক দূরে রয়েছে নিখারেভ আর গার্নেভ, রাইফেলের রেঞ্জের ভেতরে হলেও নিশানা ঠিক করা যাবে না। একবারই গুলি করার সুযোগ পাবে রানা। ফসকালে সর্বনাশ। হুঁশিয়ার হয়ে যাবে গার্নেভ গুলির আওয়াজ শুনে। এখানে অ্যামবুশ গেড়ে বসে থাকার আর কোন অর্থ থাকবে না।

ধীরে ধীরে এদিকে ঘুরে যাচ্ছে সিত্রোঁর নাক। ঘুরছে।

ব্যারির দিকে তাকাল রানা। 'এলোপাতাড়ি গুলি চালাও, ব্যারি। ওদের দু'জনের নজর তোমার দিকে ফেরানোর বন্দোবস্ত করো। আমি যাচ্ছি।'

অবাক হয়েই রানার মুখের দিকে তাকাল এস্কিমো। যা বোঝার বুঝল। মাথা নাড়ল নীরবে।

'বেশ,' বলে পোর্টারের দিকে তাকাল রানা। 'তুমি যাও, পোর্টার। রেডিওর সামনে বসোগে।' ডেরেককে বলল, 'আমি যাচ্ছি। ছুটে গিয়ে কিছু দড়ি নিয়ে এসো ট্রাক্টর থেকে।'

'আপনি…মানে আপনি যাচ্ছেন, মেজর…' শঙ্কিত গলায় বলল ব্রিউস্টার। 'দেখতে পেলেই গুলি করবে ওরা!'

'উপায় নেই,' বলেই টিলা থেকে নামতে শুরু করল রানা।

'পাগল! একেবারে…' সিত্রোঁর ইঞ্জিনের গর্জনে বাকি কথা পরিষ্কার শুনতে পেল না রানা।

রানা টিলার ওপর থেকে নামতে না নামতে ব্যারির রাইফেল গর্জে উঠল। পরপর দু'বার। প্রথম গুলিটা একটু নিচ দিয়ে গিয়ে লাগল ইঞ্জিনের একপাশের ধাতব বডিতে। কোনরকম ক্ষতি করতে পারল না কঠিন ধাতুর। ছিটকে একপাশে সরে গিয়ে বিঁধল বরফের দেয়ালে। দ্বিতীয় গুলিটা লাগল রেডিয়েটরে। এবারেও তেমন কোন ক্ষতি হলো না ইঞ্জিনের।

আবার গুলি করল ব্যারি। কেবিনের ছাদের কাঠের টুকরো ভেঙে ছিটকে পড়ল।

স্টিয়ারিঙ পুরো ঘুরিয়ে ফেলল নিখারেভ। সোজা সাগরের দিকে ঘুরে গেছে আবার ট্রাক্টরের নাক।

উবু হয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করতে করতে দৌড়াচ্ছে রানা। ওর ইচ্ছে, অলক্ষ্যে ট্রাক্টরের কাছাকাছি পৌঁছে গুলি করে মারবে গার্নেভকে। শ্যারিন আর টমকে নিরাপদ করে নিতে পারলে নিখারেভকে সামলানো কঠিন কিছুই হবে না। কিন্তু এবারেও তার পরিকল্পনা কাজে লাগানো গেল না। ভাগ্য বিরূপ। গোল বাধাল টম।

বিপদ টের পেয়ে আবার উত্তর দিকে ট্রাক্টর ঘুরিয়ে ফেলেছে নিখারেভ। সোজা সামনে ছুটে বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরে পড়তে চাইছে। এদিকে ফিরে গেছে ট্রাক্টরের কেবিন। দুলছে। এখনও অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে আছে ওটা রানার কাছ থেকে। গার্নেভকে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু নিশানা ঠিক রাখতে পারছে না রানা। একটা আশঙ্কাও রয়েছে। যদি কোনভাবে ফসকে গিয়ে আঘাত করে শ্যারিন কিংবা টমকে?

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে রানা। আর এগোচ্ছে না। রাইফেল তুলে নিশানা স্থির করছে। ঝুঁকিটা নেবে। এদিকে তাকাল গার্নেভ। ট্রিগার টিপতে যাবে রানা, এমনি সময় কেবিন থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল টম। তার হাত-পায়ে বাঁধন নেই। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল গার্নেভের ওপর। ওকে নিয়ে পড়ল বরফের ওপর।

মাটিতে গার্নেভকে নিয়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে টম। গার্নেভের হাতের পিস্তল ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে।

ছুটল রানা আবার। কিন্তু তার আগেই পাশ কাটিয়ে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে গেল কেউ। ডেরেক ক্লেটন। কাঁধে দড়ির বোঝা।

আচমকা শব্দ করে গুলি বেরিয়ে গেল গার্নেভের পিস্তল থেকে। ইঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে সে-শব্দ ঠিকই কানে পৌঁছল নিখারেভের। কয়েক গজ এগিয়ে গেছে ট্রাক্টর। থামিয়ে দিয়ে কি হয়েছে দেখার জন্যে নিচে নেমে এল সে। গার্নেভ আর টম গড়াগড়ি করছে, দেখতে পেয়েই পকেট থেকে পিস্তল বের করে ছুটে এল।

কাছে এসেই সুযোগ বুঝে গুলি করল নিখারেভ। আচমকা স্থির হয়ে গেল টম। মাথাটা গড়িয়ে পড়ল বরফের ওপর। লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল গার্নেভ।

ছুটতে ছুটতেই বাপকে গুলি খেতে দেখল ডেরেক। তাড়াহুড়ো আর উত্তেজনায় অতটা খেয়াল রাখতে পারেনি নিখারেভ। দড়ির বান্ডিলের বাড়ি খেয়ে তার হাত থেকে উড়ে চলে গেল পিস্তলটা। চমকে ফিরে তাকাল সে। কিন্তু কিছু করার আগেই তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ডেরেক।

কেবিন থেকে বেরিয়ে এল এই সময় শ্যারিন। লাফিয়ে নামল নিচে।

টম আর শ্যারিনের কাছ থেকে কোনরকম বিপদের সম্ভাবনা নেই ভেবে ওদের বাঁধন খুলে দিয়েছিল গার্নেভ আগেই। ভুলটা করেছে সে এখানেই। কিন্তু এবারে আর ভুল করল না মোটেই।

নিখারেভ আর ডেরেকের দিকেই রানার খেয়াল। এই সময়ই শুনল গার্নেভের কর্কশ কণ্ঠস্বর, 'রাইফেলটা ফেলে দাও, রানা!'

ফিরে চেয়ে দেখল রানা, শ্যারিনের পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে তার কানে পিস্তল ঠেসে ধরে রেখেছে গার্নেভ।

তিরিশটা সেকেন্ডও পেরোয়নি, এর মাঝেই ঘটে গেল এতগুলো ঘটনা। আবার হেরে গেল রানা। ভাগ্যের কাছে চরম মার খাচ্ছে সে এবারে।

'ফেলো, ফেলে দাও!' আবার আদেশ দিল গার্নেভ। শ্যারিনের কানে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখে ওকে টেনে নিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে এক পা এক পা করে।

ইতস্তত করছে রানা। এই সময় তার পাশে এসে দাঁড়াল ব্রিউস্টার আর ব্যারি। ক্যাপ্টেনের দিকে তাকাল রানা। পরিস্থিতিটা ঘোরাল হয়ে উঠেছে।

'তুমি…তুমি হেরে গেছ, গার্নেভ…' পিস্তলের আওয়াজে থেমে গেল রানা। সেই সঙ্গে শোনা গেল মেয়েলী কণ্ঠের আর্তনাদ।

চকিতে কানের ওপর থেকে পিস্তল সরিয়ে নিয়ে শ্যারিনের ডান বাহুতে গুলি করেছে গার্নেভ। ভাঁওতা দিচ্ছে না, বোঝাল। পিস্তলটা ধরেছে এবার মেরুদণ্ডের ওপর।

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। কিন্তু অসহায় সে। শেয়ালের মত ধূর্ত ওই বেঁটে খুনীটা। সামান্যতম সুযোগ দিচ্ছে না সে রানাকে।

আস্তে করে হাত থেকে রাইফেলটা ছেড়ে দিল রানা। কঠিন বরফে রাইফেল পতনের ধাতব শব্দ উঠল।

ব্রিউস্টার আর ব্যারিও ফেলে দিল রাইফেল।

'দাড়িওয়ালা ভূতটাই বুঝি ক্যাপ্টেন ব্রিউস্টার?' এই উত্তেজনার মুহূর্তেও রসিকতা করল গার্নেভ। 'ক্যাপ্টেন, পা দিয়ে ঠেলে তোমার কয়েক গজ দূরে ওই যে ফাটলটা, ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসো রাইফেলগুলো।'

আদেশ পালন করল ব্রিউস্টার।

ব্যান্ডেজ বাঁধা হাতেই নিখারেভকে প্রচণ্ড মার মারল ডেরেক। একেবারে থেঁতলে দিয়েছে নিখারেভের মুখ। কয়েকটা দাঁত ভেঙে খসে গেছে মাড়ি থেকে। নাকটা আর আগের মত খাড়া নেই, বিচ্ছিরি ভাবে বসে গেছে। ডেরেককে বাধা দেয়া দূরে থাক, জান বাঁচাতে ব্যস্ত এখন নিখারেভ। শেষ চেষ্টা করল সে। গায়ের ওপর থেকে প্রাণপণে ডেরেককে ঠেলে সরিয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়াল হাঁচড়ে পাঁচড়ে। কোনদিকে তাকাল না। সোজা ছুট লাগাল সামনের দিকে। যে করেই হোক, পালিয়ে বাঁচতে চায়। কিন্তু সে বুঝতে পারছে না, এভাবে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না সে মুষ্টিযোদ্ধার হাত থেকে। বাপকে খুন করার প্রতিশোধ নেবেই ডেরেক।

ডেরেককে হুঁশিয়ার করার চেষ্টা করল না গার্নেভ। বুঝতে পেরেছে, এই মুহূর্তে কোনরকম ভয় দেখিয়েই নিরস্ত করতে পারবে না মুষ্টিযোদ্ধাকে। নিখারেভকেও ডেকে ফেরানোর চেষ্টা করল না সে। লাভ নেই।

ছুটতে ছুটতে সামনের কয়েক গজ দূরের একটা বরফের টিলার ওপাশে হারিয়ে গেল নিখারেভ। পেছনে তাড়া করে ছুটে গেল ডেরেক।

পাশ থেকে আচমকা রানার হাত চেপে ধরল ব্যারি। ফিরে চাইল রানা। আঙুল তুলে দেখাল এস্কিমো। 'ও মরেনি, রানা! বেঁচে আছে!'

একটু একটু নড়ছে টম ক্লেটন। এগিয়ে গিয়ে তার পাশে বসে পড়ল রানা।

কপালের ক্ষতটা পরীক্ষা করে দেখল। ঠিকমত লাগেনি গুলি। খুলি ভেদ করেনি। শুধু কপালের একপাশ, গালের চামড়া আর এক কানের খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। প্রচুর রক্ত ঝরছে, কিন্তু মরেনি টম। পালস্ অবশ্য দুর্বল। তাড়াতাড়ি চিকিৎসা পেলে মরবে না ডেরেকের বাপ।

উঠে দাঁড়াল রানা। টিলাটার দিকে তাকিয়ে শ্রাগ করল। 'ডেরেক জানে তার বাপ মারা গেছে। নিখারেভের জন্যে কিছুই করার নেই আর।'

টিলার ওপাশ থেকে একটা অমানুষিক আর্তচিৎকার ভেসে এল হঠাৎ। মাঝ পথেই থেমে গেল চিৎকারটা। বীভৎস চিৎকারটা শুনে রোম খাড়া হয়ে গেল রানার।

কয়েক মুহূর্ত পরেই টিলার ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল ডেরেক। টলতে টলতে এসে দাঁড়াল বাপের সামনে। মুখে এমনিতেই অসংখ্য ক্ষত ছিল, এখন আরও বেড়েছে। দুই হাতের ব্যান্ডেজ রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'ঘাড় ভেঙে দিয়েছি হারামজাদার…'

আবার নড়ে উঠল টম। কথা থামিয়ে দিয়ে অবাক হয়ে সেদিকে তাকাল ডেরেক।

'আপনার বাবা মরেননি,' বলল রানা। 'সামান্য আঘাত।'

চরম অবিশ্বাসের চিহ্ন ফুটে উঠল ডেরেকের মুখে। পরক্ষণেই একটা অদ্ভুত আনন্দের অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়ল তার ক্ষতবিক্ষত মুখে। ধপ করে বসে পড়ল সে বরফে পড়ে থাকা অজ্ঞান লোকটার পাশে।

এই সময় চেঁচিয়ে আদেশ করল গার্নেভ, 'ব্যারি, আমার রেডিওটা নিয়ে এসো! জলদি!'

গার্নেভের দিকে ফিরে চাইল ডেরেক। ধক করে জ্বলে উঠল মুষ্টিযোদ্ধার দুই চোখ। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'এবারে তোর পালা, হারামজাদা!'

'না, ডেরেক, না!' শঙ্কিত গলায় চেঁচিয়ে উঠল রানা। জানে সে, ডেরেক গার্নেভকে আক্রমণ করলে, যার যে দশাই হোক, শ্যারিন মারা যাবে প্রথমে। 'যেখানে আছেন, চুপ করে বসে থাকুন!'

খিক খিক করে দাঁত বের করে হাসল গার্নেভ, 'তোমার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারছি না, রানা।' ব্যারির দিকে তাকিয়ে ধমকে উঠল, 'এখনও দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

নীরবে গিয়ে কেবিনে ঢুকল ব্যারি, রেডিওটা নিয়ে নেমে এল।

'যাও, ইঞ্জিনরূমে রেখে এসো রেডিওটা,' আবার আদেশ দিল গার্নেভ।

আবার নীরবে আদেশ পালন করল ব্যারি।

'কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারবে না তুমি, গার্নেভ,' বলল রানা। 'মরতে তোমাকে হবেই।'

'না, রানা,' হাসল গার্নেভ। 'নিখারেভের মত বোকা নই আমি। ট্রাক্টরটা নিয়ে সরে যাব তোমাদের কাছ থেকে। রেডিওতে খবর পাঠাব ট্রলারে। লোক এসে উদ্ধার করবে আমাকে।'

'না না, দোহাই আপনাদের!' হাতের ব্যথাকে অগ্রাহ্য করে এতক্ষণ চুপচাপ

দাঁড়িয়ে ছিল শ্যারিন, চেঁচিয়ে উঠল এখন। 'আমাকে মেরে ফেলুক। ওকে যেতে দেবেন না…' পিঠের ক্ষতস্থানে পিস্তলের গুঁতো খেয়ে আচমকা থেমে গেল সে। তীব্র ব্যথায় ককিয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় শোনা গেল প্লেনের গর্জন। দক্ষিণ দিক থেকে উড়ে এল চারটে জেট। মাথার চারশো ফুট ওপর দিয়ে উড়ে গেল কান ফাটানো আওয়াজ তুলে।

জেটগুলোর দিকে একবারও তাকাল না গার্নেভ। রানা আর অন্যান্যদের দিক থেকে চোখ সরাল না মুহূর্তের জন্যে।

'হেরে গেছ তুমি, গার্নেভ,' হাসল রানা। 'ওগুলো জেট ফাইটার। ব্রিটিশ। সুতরাং তোমার বন্ধুরা তোমাকে উদ্ধার করতে আসছে না। আর এলেও পারবে না, মরবে।'

'তাহলে মেয়েটাও মরবে,' আস্তে করে বলল গার্নেভ।

'বোকার মত কথা বোলো না। ওই ফরমুলাটা দরকার ব্রিটিশ সরকারের, তার জন্যে একটা মেয়ের জীবনকে থোড়াই কেয়ার করবে ওরা।'

'ফরমুলাটা পাচ্ছে কি করে? ধ্বংস করে ফেলব না গোলমাল দেখলে?'

'তাতেও কিছু যায় আসে না। রবার্ট ব্রিমন বেঁচে আছেন। আগামী ছয় মাসের ভেতরেই আরেক কপি ফরমুলা তৈরি করে ফেলবেন তিনি। তোমার ধ্বংস করতে হবে না, গার্নেভ। বেশি গোলমাল করলে ওরাই তোমাকে সুদ্ধ ফরমুলাটা ধ্বংস করে ফেলবে। ওটা রাশিয়ায় কিছুতেই যেতে দেবে না ব্রিটেন।'

'সে দেখা যাবে,' আশ্চর্য শান্ত গার্নেভের কণ্ঠ। 'যতক্ষণ খুশি প্লেন চালাক ওরা, চক্কর মারুক। ওরা যতক্ষণ আছে, আমি তোমাদের কাছ থেকে নড়ছি না। আমাকে মারতে চাইলে তোমরাও মরবে, কাজেই বোমা ফেলবে না ওরা এখন।'

'আত্মসমর্পণ করছ না কেন, গার্নেভ?' শান্ত কণ্ঠে বলল রানা। 'খামোকা এভাবে মরবে কেন? ধরা দিলে তোমার বিচার হবে…'

'না না, মরব কেন? ওই দেখো,' রানার পেছন দিকে ইঙ্গিত করল গার্নেভ।

ফিরে চাইল রানা। ফিয়র্ডের ওপরে দেখা যাচ্ছে ওদের। দশ-বারো জনের একটা দল। সশস্ত্র। ফিয়র্ডের ওপর দিয়ে উপকূলের দিকে এগোচ্ছে।

'কি বুঝলে, রানা? রেডিওতে খবর দেবার আর দরকার নেই, ওরা এমনিতেই এসে গেছে।'

রাশান ট্রলার থেকে নেমে আসা সৈন্য ওরা, বুঝল রানা। কিন্তু ডাক্তার দেরি করছে কেন? দেখতে পায়নি ওদের?

রানার নীরব প্রশ্নের জবাব দিতেই যেন এই সময় ফিয়র্ডের ওপাশ থেকে গর্জে উঠল মেশিনগান। ফিয়র্ডের ওপর দিয়ে এগিয়ে আসা লোকগুলোর কয়েকজন সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল বেকায়দা ভঙ্গিতে। অন্যেরা টপাটপ শুয়ে পড়ল উবু হয়ে।

'কারা!' এতক্ষণে ভয় দেখা দিল গার্নেভের কণ্ঠে। 'কারা গুলি করল!'

হাসল রানা। 'দেখলে তো, গার্নেভ, বাঁচতে তুমি পারবে না। এখনও সময় আছে, আত্মসমর্পণ করো।…ওরা ট্রাইটন থেকে এসেছে। প্লেনে করে প্যারাস্যুট নিয়ে নেমেছে অনেক আগেই। এতক্ষণ ঘাপটি মেরে লুকিয়ে বসে ছিল ফিয়র্ডের

ওপাশে···তোমার বন্ধুদের অপেক্ষাতেই···'

আর কোন কথা শোনার অপেক্ষা করল না গার্নেভ। শ্যারিনকে টেনে নিয়ে পিছিয়ে যেতে লাগল। রানা এগোতে যাচ্ছিল, কিন্তু ধমক মেরে তাকে নিরস্ত করল সে। ইঞ্জিনের পাশে দাঁড়িয়ে শ্যারিনকে উঠবার আদেশ দিল। ইতস্তত করছে শ্যারিন। ধমক লাগাল গার্নেভ, 'জলদি! নইলে রানাকে গুলি করব আমি!'

একবার রানার দিকে তাকিয়েই ট্রাক্টরে উঠে গেল শ্যারিন।

'কেবিনে ওঠার চেষ্টা করবে না, রানা, খবরদার!' পিস্তলটা নামাল গার্নেভ। 'আমি জানি, বাঁচার সম্ভাবনা আমার খুবই কম। কিন্তু একা মরব না। ওকে নিয়ে মরব।' বলেই আর দেরি না করে উঠে পড়ল সে-ও।

গার্নেভ কি ট্রাক্টর চালাতে জানে?—ভাবছে রানা। ইঞ্জিন স্টার্ট দেয়াই আছে। গিয়ার আর স্টিয়ারিং সাধারণ জীপের মতই। বরফে শুধু ভারী যানটার ব্যালান্স রাখতে পারলেই হলো, এমন কিছু কঠিন কাজ নয়।

গিয়ার বদলের শব্দ উঠল। ইঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেল। পরক্ষণেই চলতে শুরু করল সিত্রোঁ। ঢালের দিকে এগোচ্ছে। আপনাআপনি বেড়ে গেল গতি। ব্যালান্স ঠিক রাখতে পারছে না গার্নেভ। এঁকেবেঁকে বিপজ্জনক গতিতে ছুটে যাচ্ছে পাঁচ টনি ট্রাক্টরটা।

সিত্রোঁর পেছনে ছুটল রানা। ব্যারিও চলেছে তার সঙ্গে। কিন্তু ট্রাক্টরের গতির সঙ্গে পেরে উঠছে না। ওদের কাছ থেকে দুশো গজ দূরে চলে গেল ওটা।

সিত্রোঁর সামনে কয়েক গজ দূরেই বাঁক। একপাশে হিমবাহের খাড়া দেয়াল। প্রাণপণে মোড় ঘুরে দেয়ালকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল গার্নেভ, কিন্তু পারল না। ভয়ঙ্কর গতিতে কোনাকুনি গিয়ে ধাক্কা খেল দেয়ালের গায়ে। দেখতে পাচ্ছে রানা, কাত হয়ে যাচ্ছে কেবিনটা, স্লো-মোশন ছায়াছবির মত ধীরে। দড়াম করে প্রচণ্ড আওয়াজ তুলে কাত হয়ে পড়ল ভারী কেবিনটা। বরফের অসংখ্য ছোট ছোট টুকরো ছিটকে গেল চারদিকে। ইঞ্জিনটা কাত হয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, কেবিনটার মত পড়ে যায়নি।

ধাক্কা মেরে শ্যারিনকে নামিয়ে দিল গার্নেভ। নেমেই পেছনে ছুটতে যাচ্ছিল মেয়েটা, কিন্তু বুলেট এসে বিঁধল তার পায়ের কাছে। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল আবার। পিস্তল নাচিয়ে তাকে শাসাল গার্নেভ। তারপর এক হাতে পিস্তল অন্য হাতে রেডিওটা নিয়ে লাফিয়ে নেমে এল ড্রাইভিং সীট থেকে।

শ্যারিনকে নিয়ে ছুটল গার্নেভ। দেখতে দেখতে মোড় ঘুরে হারিয়ে গেল ওরা হিমবাহের ওপাশে।

তখনও পঞ্চাশ গজ দূরে রয়েছে রানা। প্রাণপণে ছুটছে। এই সময়ই মাথার ওপরে ঝাঁক বাঁধা বম্বারের কান ফাটানো বিকট আওয়াজ শুনল। ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল ছ'টা বম্বার, নাক নিচু করে ছুটে যাচ্ছে উত্তরে। কিছুটা গিয়েই আবার ঘুরল ওগুলো। ডাইভ দিয়ে ছুটে এল। চোখের পলকে উড়ে গেল আবার মাথার ওপর দিয়ে।

শেল ফাটার বিকট শব্দ কানে এল আরও আধসেকেন্ড পরে। একবার পেছনে

তাকিয়ে দেখল রানা, ফিয়র্ডের আশপাশে ধোঁয়ার মত শূন্যে উড়ছে বরফ-কুচি। বোমার ঘায়ে ধস নামানোর চেষ্টা করছে বম্বারগুলো। সরাসরি বোম ফেলতে চাইছে না ট্রলারের ওপর, বরফের ধস নামিয়ে ডুবিয়ে দেবে। চমৎকার বুদ্ধি! বিশ্বযুদ্ধ আর আন্তর্জাতিক হৈ-চৈ এড়াতে চাইছে।

বম্বারগুলো দিগন্তে হারিয়ে যেতেই স্কিমিটারগুলোকে দেখা গেল। ফিয়র্ডের ওপরে উড়ছে। আরও রাশান সৈন্য নেমে এসেছে ফিয়র্ডে, স্ট্র্যাফিং শুরু করল জেটগুলো। নিচে, ওপাশ থেকেও কানে আসছে মেশিনগানের একটানা নেশা ধরানো ঠা-ঠা-ঠা-ঠা-ঠা আওয়াজ।

মোড়ের কাছে এসে প্রাণপণে ব্রেক করল রানা। পিছলেই যাচ্ছিল, অনেক কষ্টে সামলে নিল। সামনে গভীর ফাটল। মোড়ের এপাশ থেকে দেখা যায় না ফাটলটা। মোড় ঘোরার সময় হুঁশিয়ার না হলেই গিয়ে পড়তে হবে ফাটলে। এবং তাই পড়েছে গার্নেভ আর শ্যারিন।

ফাটলের ধারে গিয়ে দাঁড়াল রানা। বেশি চওড়া নয়, বড়জোর ফুট চারেক। নিচে উঁকি দিয়ে দেখল, গভীরতাও ততটা নয়। বিশ ফুটের বেশি হবে না। আসলে, চলন্ত হিমবাহের একটা চিড় এটা। লম্বালম্বি পুব-পশ্চিমে চলে গেছে। যে হিমবাহটা পেরিয়ে এসেছে রানা, ফাটলটা তারই অংশ। গভীর নয়, কিন্তু, চলন্ত হিমবাহের চিড়, ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক ব্যাপার। চাপ খেয়ে যে-কোন সময় বুজে যেতে পারে।

ফাটলের তলায় দাঁড়িয়ে আছে গার্নেভ আর শ্যারিন। উপরের দিকে তাকিয়ে আছে। রানাকে দেখেই শ্যারিনের গায়ে পিস্তল ঠেসে ধরল গার্নেভ, 'রানা, জলদি একটা দড়ি! জলদি! দেয়ালটা দুদিক থেকে সরে আসছে, টের পাচ্ছি।'

সমস্ত হিমবাহের বেলাতে একই নিয়ম। ঢাল বেয়ে নামে, যত নিচের দিকে পৌঁছায় গতি বেড়ে যায় ততই। গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের হিমবাহগুলো অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি খারাপ। কারণ, ঢাল এখানে বেশি, আর হিমবাহের গায়ে বরফ জমেও অনেক বেশি। প্রতি ঘণ্টায় প্রায় চার ফুটের মত এগোয় এখানে হিমবাহ। আর এটা প্রমাণ করার জন্যেই যেন কেঁপে উঠল রানার পায়ের তলার বরফ, কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেল ফাটলের এদিককার দেয়াল।

'জলদি!' আবার হুঁশিয়ারি জানাল গার্নেভ! 'জলদি করো, রানা!'

রানার প্রায় কাঁধের ওপর এসে দাঁড়িয়েছে ব্যারি। ডেরেকের আনা দড়ির বোঝাটা এখন ওর কাঁধে। রানা ফিরে চাইতেই একটা দড়ি খুলে ধরিয়ে দিল।

নিচের দিকে তাকাল রানা। শ্যারিনকে বাঁচানোর এ-ই শেষ সুযোগ। যা করার করতে হবে এখনই, নইলে আর হবে না। ব্যারির দিকে চেয়ে বলল, 'আরেকটা বান্ডিল দাও। খুলো না। নিয়ে নিচে নামব।'

আরেকটা বান্ডিল এগিয়ে দিল ব্যারি। কি যেন বলতে যাচ্ছিল গার্নেভ, কিন্তু তার আগেই বান্ডিল ছুঁড়ল রানা। নিশানা ঠিকই হয়েছে। গার্নেভের পিস্তল ধরা হাতে এসে লাগল দড়ির বান্ডিল। সাবধান হবার সময় পেল না গার্নেভ। পিস্তলটা হাত থেকে পড়ে গেল। ঝুঁকে তুলতে গেল আবার। লাফ দিল রানা।

আশ্চর্য! রানার দেহের ভরটা হজম করে নিল গার্নেভ। তবে উবু হয়ে পড়ে

গেল বরফের ওপর। ডান হাতের তালু পিস্তলের ওপর।

গার্নেভের পিঠে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের জুতোর গোড়ালি দিয়ে প্রথমে তার হাতটা চেপে ধরল রানা। পরক্ষণে বিদ্যুৎ-গতিতে পা-টা উঠিয়ে গোড়ালি দিয়ে মারল কব্জির এক ইঞ্চি নিচে। সরু সরু হাড় ভাঙার তীক্ষ্ণ শব্দ উঠল। আর্তনাদ করে উঠল গার্নেভ। অবস্থা দেখার জন্যে ডান হাতের তালু চোখের সামনে নিয়ে এল।

গার্নেভের পিঠে বসেই নিচু হয়ে হাত বাড়িয়ে পিস্তলটা তুলে নিল রানা। তারপর নেমে গেল পিঠ থেকে। লোকটাকে তুলে রামধোলাই দেবার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল। সময় নেই। যে কোন সময় চেপে আসতে পারে বরফের দেয়াল।

উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল রানা, ব্রিউস্টার আর ডেরেকও এসে দাঁড়িয়েছে ফাটলের ওপরে। তিনজনে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে একটা দড়ির প্রান্ত নিজেদের পেটে-কোমরে পেঁচিয়ে বাঁধছে। বুদ্ধি ভালই। একসঙ্গে ওদের তিনজনের দেহের ওজন রানা কিংবা শ্যারিনের চাইতে অনেক বেশি।

দড়ির অন্য প্রান্তটা এসে পড়ল খাদের তলায়। ওটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল গার্নেভ। মারল ওকে আবার রানা। হাতের আঙুলগুলো খামচি মারার মত করে বাঁকিয়ে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে থাবা মারল ওর নাকমুখে। হাতটা সরিয়ে আনতেই দেখল, গার্নেভের নাকের বাঁশি ভেঙে থ্যাবড়া হয়ে গেছে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল নাকের দুই ফুটো দিয়ে।

কিন্তু থামল না গার্নেভ। ঝাঁপিয়ে পড়ল এসে রানার ওপর। দু'হাতে রানার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করল। বিদ্যুৎ গতিতে দু'বার হাত চালাল রানা। একবার ঘাড়ে, একবার কিডনিতে আঘাত খেল গার্নেভ। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বরফের ওপর।

'বা-বা, দারুণ!' ওপর থেকে চেঁচিয়ে প্রশংসা করল ডেরেক। 'চমৎকার! রিঙে এই রকম দু'ঘা খেলে চিৎ হয়ে যাব আমিও!...কিন্তু জলদি করুন, রানা! দেয়ালটা আরও সরছে!'

তাড়াতাড়ি শ্যারিনের কোমরে দড়ি বেঁধে দিল রানা। ওপর থেকে টেনে ওকে তুলতে লাগল ব্যারি। খুঁটির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে তিনজনে। একা ডেরেকের ভারই যথেষ্ট, তার ওপর আরও দুজন লোকের ওজন রয়েছে। শ্যারিনের হালকা দেহের ভারে টললও না ওরা।

গার্নেভের পায়ের কাছে পড়ে থাকা রেডিওটা তুলে নিয়েছে রানা। নিচে পড়ে থাকা দড়ির এক প্রান্তে রেডিওর হ্যান্ডেল বাঁধল। নিজের কোমরে বেঁধে নিল অপর প্রান্ত।

কেঁপে উঠে আরও কয়েক ইঞ্চি সরে এল দেয়াল। আড়াই ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে মাঝখানের ফাঁক। এখন যেকোন মুহূর্তে বুজে যাবে। আর থাকা যাবে না এখানে। ওপর দিকে তাকিয়ে দেখল রানা, ফাটলের ওপরে পৌছে গেছে শ্যারিন। আর মাত্র দু'-একটা টান, তারপরই শ্যারিনকে ওপরে তুলে নেবে ওরা।

আরও সরে এল দেয়াল। আরও। দ্রুত সরছে এবারে। 'জলদি দড়ি ফেলো, রিক!' চেঁচিয়ে বলল রানা।

দ্রুত হাতে শ্যারিনের কোমরের বাঁধন খুলেই দড়িটা নিচে ছুঁড়ে দিল ব্যারি।

কোমরে বাঁধার জন্যে সময় নষ্ট করল না রানা। চেঁচিয়ে বলল, 'শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকো! আমি উঠে আসছি!'

দড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা, কিন্তু কয়েক ফুট উঠেই পায়ে হ্যাঁচকা টান অনুভব করল। জ্ঞান ফিরে পেয়েছে গার্নেভ। তার পা ধরে টানছে। শঙ্কিত হয়ে উঠল রানা। এই টানাটানির ফল মারাত্মক হতে পারে। ওপরে কোমরে দড়ি বাঁধা অবস্থায় পিছলে যেতে পারে ওরা। তাহলে সবাই এসে পড়বে খাদে, পাঁচজন লোক মরবে একসঙ্গে।

দড়ি থেকে হাত ছেড়ে দিল রানা। আচমকা পড়ায় রানার দেহের ভার রাখতে পারল না গার্নেভ। তাকে ঘাড়ে নিয়ে একপাশে কাত হয়ে পড়ল। দুই দেয়ালের ফাঁক আর মাত্র দুই ফুট মত হবে। পাশ ফিরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এই অবস্থায় এখানে মারামারি করা অসম্ভব। পকেট থেকে পিস্তল বার করল রানা।

এই প্রথম গার্নেভের চোখে আতঙ্ক ফুটতে দেখল রানা। গুলি করতে গিয়েও দ্বিধা করল সে। পরক্ষণেই মনের পর্দায় ভেসে উঠল বিমানের ক্যাপ্টেন, তিনজন ক্রু, ক্যাপ্টেন ব্রায়ার্স, সিনেটর ম্যাক্সওয়েল, মিসেস ভারনন ডুলানী আর ডাক্তার ব্রাউনের চেহারা। আর দ্বিধা করল না রানা। গুলি করল, পরপর দুবার। আর্তনাদ করে উঠল গার্নেভ, ছিটকে পড়ত, কিন্তু বরফের দেয়ালের অল্প পরিসরে ঠেকে দাঁড়িয়ে রইল। অবাক হয়ে তাকাচ্ছে নিজের দুই বাহুর দিকে। দুটো হাতই অকেজো হয়ে গেছে। রক্ত বেরিয়ে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে ফারের পোশাকের হাতা।

'রানা, জলদি!' ওপর থেকে শঙ্কিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে ডাকল ব্যারি।

হাত অকেজো। আর বাধা দিতে পারল না গার্নেভ। সড়সড় করে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল রানা।

আরও কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেছে দেয়াল। নিচে থেকে আর্তচিৎকার শোনা গেল গার্নেভের, 'রানা···দোহাই তোমার···প্লীজ···একটা দড়ি···' ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে।

তিনজনের কোমরে বাঁধা দড়ির অন্যপ্রান্তটায় একটা ফাঁস বানাল রানা। ডেকে বলল, 'গার্নেভ, সোজা হয়ে দাঁড়াও। তোমার মাথা গলিয়ে কোমরে ফাঁস ফেলছি আমি।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল গার্নেভ। দুই হাত দুদিকে ঝুলছে বেকায়দা ভাবে। বাঁচলেও হাত দুটো কেটে বাদ দিতে হবে চিরদিনের জন্যে। দুচোখে অবিশ্বাস নিয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। রানা তাকে দড়ি ছুঁড়ে দিচ্ছে তুলে নেবার জন্যে, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না যেন।

গার্নেভের কোমরে ঠিকমতই আটকে গেল ফাঁস। দড়ি ধরে টেনে ওকে ওপরে তোলা হতে লাগল। কিন্তু কপাল আজ ওর সত্যিই খারাপ। দ্রুত আরও কয়েক ইঞ্চি সরে গেল দেয়াল। হ্যাঁচকা টানে ওকে আরও দুই ফুট ওপরে তুলে আনল রানা আর ব্যারি। কিন্তু আর পারল না। দুইদিক থেকে দেয়াল চেপে ধরেছে গার্নেভকে। বাইন মাছের মত এঁকেবেঁকে ওই শীতল কারাগার থেকে মুক্তির চেষ্টা

করছে গার্নেভ। কিন্তু পারছে না।

প্রচুর জোরাজুরি করল রানা আর ব্যারি। কিন্তু মুক্ত করতে পারল না গার্নেভকে।

আরও সরে এল বরফের দেয়াল। একটা অপার্থিব চিৎকার বেরিয়ে এল গার্নেভের গলা চিরে। পরক্ষণেই ফোয়ারার মত ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল তার নাক আর কান দিয়ে। আর কোন উপায় নেই।

ব্যারি, ডেরেক আর ব্রিউস্টারের কোমর থেকে দড়ি খুলে দিল রানা।

প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ চলছে ফিয়র্ডের মাথায়-তলায়-আকাশে। ফিরে চেয়ে দেখল রানা, দাউ দাউ আগুন জ্বলছে রাশান ট্রলারের সামনের অংশে। ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে পেছনটায়। ফায়ার-বম্ব পড়েছে ওটাতে।

পায়ের তলায় প্রচণ্ড কম্পন টের পেয়ে ফিরে ফাটলের দিকে চাইল রানা।

প্রায় বুজে গেছে দুদিকের দেয়াল, মাঝখানে কয়েক ইঞ্চি মাত্র ফাঁক।

কানের কাছে ব্রিউস্টারের হতাশ কণ্ঠ শুনতে পেল রানা, 'ফরমুলাটা গেল…'

'না, যায়নি,' বাধা দিয়ে বলল রানা। কোমরে বাঁধা নিখারেভের রেডিওটা দেখিয়ে বলল, 'এর ভেতরেই লুকানো আছে কোথাও। এজন্যেই এটা হাতছাড়া করতে চায়নি গার্নেভ…'

গায়ে গায়ে মিশে গেল এই সময় ফাটলের দুদিকের দেয়াল।

সব শেষ। রানা ভাবল, এ কোথায় কোন্ দেশে কার জন্যে কেন কি করছে সে!

চারদিকে বরফ আর বরফ।

* * * *